যুগমানব শ্রীঅরবিন্দ

যুগমানব শ্রীঅরবিন্দ

প্রথম প্রকাশ :
শ্রাবণ ১৩৭১

প্রকাশক :
শ্রী সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
গণেশ বসু

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ইম্প্রেসন্ হাউস
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
নিরঞ্জন বোস
নর্দার্ন প্রিণ্টার্স
৩৪/২ বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

যুগমানব শ্রীঅরবিন্দ

মণি বাগচি

দে'জ পাবলিশিং
কলিকাতা-৯
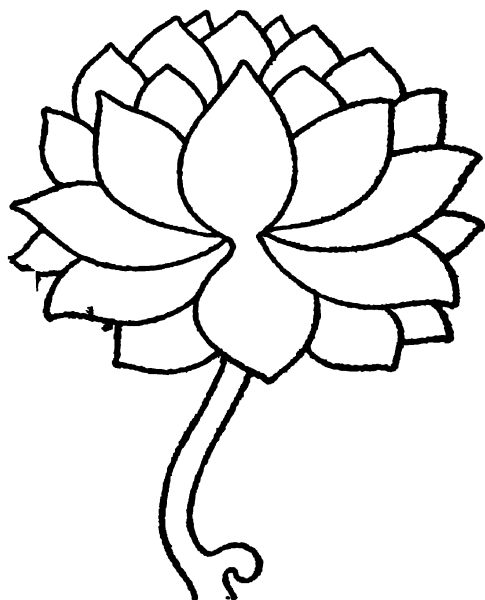
॥ এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ॥

গৌতম বুদ্ধ, রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, রমেশচন্দ্র, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র, আ। প্রফুল্লচন্দ্র, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, শিক্ষাগুরু আশুতোষ, নিবেদিতা, নিবেদিতা-নৈবেদ্য, দেশবন্ধু, শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার, বীর সাভারকর, জননায়ক জওহরলাল, দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র, সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন, সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক, সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী, লোকমাতা নিবেদিতা, সুধীরকুমার সেন, আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ, মহাচীনে নেহেরু, কেমন করে স্বাধীন হলাম, রবির আলো, অমর জীবন, আমাদের বিদ্যাসাগর, ছাত্রদের আশুতোষ, ছোটদের বঙ্কিমচন্দ্র, ছোটদের গৌতম বুদ্ধ, নানাসাহেব, কাজলরেখা, নীলা-কঙ্ক, ছোটদের ছত্রপতি, ছোটদের অরবিন্দ, ছোটদের বার্নার্ড 'শ, আমাদের বীর সৈনিক, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, সিপাহী বিদ্রোহ, আমাদের দেশবন্ধু, বাংলা সাহিত্যের পরিচয়।
OUR BUDDHA, SISTER NIVEDITA, SWAMI ABHEDANANDA.

॥ পরবর্তী গ্রন্থ ॥

জলছবি

(জীবনচরিত নয়, লেখকের আত্মচরিত)

জাতীয়তার প্রবক্তা, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি,

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পুণ্য স্মৃতিতে

"একটা জাতির পক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হলো তার জীবন-ধারণের অত্যাবশ্যক প্রাণবায়ু। এ জিনিস ছাড়া কোন জাতিই বাঁচতে পারে না; বাড়তেই পারে না। জাতির বন্ধনমুক্তি করা হলো অতি মহৎ ও পবিত্র কাজ।"

শ্রীঅরবিন্দ

॥ প্রাক্-কথন ॥

শ্রীঅরবিন্দের মহিমান্বিত জীবনের প্রতি তাকিয়ে সত্যিই আমাদের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নেই। একটি প্রাচীন বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তাঁর জীবনের তুলনা দেওয়া চলে। জটিল জটাভারে আকীর্ণ, নানা শাখা-প্রশাখায় পরিব্যাপ্ত সেই বিরাট পাদপের নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন তলদেশে কতকালের ইতিহাস যেন পুঞ্জিত হয়ে আছে। তেমনি আমরা শ্রীঅরবিন্দের তপস্যাপূত সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে শুধু যে ভারত-ইতিহাসের ত্রিকালকে প্রত্যক্ষ করি তা নয়—বিশ্বমানবের ক্রমোত্তরণের ইতিহাসও তাঁর জীবন-সাধনার মধ্যে বিধৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। মানবসভ্যতার ইতিহাসের রাজপথে আজ তাই তিনি সমুন্নত মহিমায় দীপ্যমান। পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ—পৃথিবীর চতুঃপ্রান্তের জিজ্ঞাসু মানুষের শ্রদ্ধাপ্লুত দৃষ্টি আজ তাই নিবদ্ধ হয়েছে ভারত মহাসাগর তীরে পণ্ডিচেরী মহাতীর্থের দিকে, যেথানে প্রতিনিয়ত নিঃশব্দে উদ্গীত হয়ে চলেছে সেই শাশ্বত আমন্ত্রণ: শৃণ্বন্তু বিশ্বে।

ছত্রিশ বছর আগে শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করতে একবার পণ্ডিচেরী গিয়েছিলাম। আশ্রমবাস করেছিলাম এক মাস। তাঁর সম্পর্কে শ্রদ্ধাঞ্জলির সংকল্প তখনই করেছিলাম, কিন্তু তা চরিতার্থ হলো আজ এই জীবন-সায়াহ্নে। এই গ্রন্থে তাঁর জীবনের বহিরঙ্গ কাহিনীটাই শুধু ব্যক্ত হলো, তত্ত্বের দিকটা এখানে অনুপস্থিত। পরবর্তী আর-একটি গ্রন্থে তাঁর অন্তর্জীবন ও দর্শন-চিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

৯০ বাগুইআটি রোড
দক্ষিণ দমদম
কলিকাতা ২৮

মণি বাগচি

নমস্কার

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা। ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন—

... ...

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—

... ...

ভারতের বীণাপাণি,
হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়েছেন বিপুল ঝংকার—
নাহি তাহে দুঃখতান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস। তাই শুনি আজ
কোথা হতে ঝঞ্ঝা-সাথে সিন্ধুর গর্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্তন
পাষাণপিঞ্জর টুটি, বজ্রগর্জরব
ভেরিমন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব।
এ উদাত্ত সংগীতের তরঙ্গ-মাঝার,
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার॥
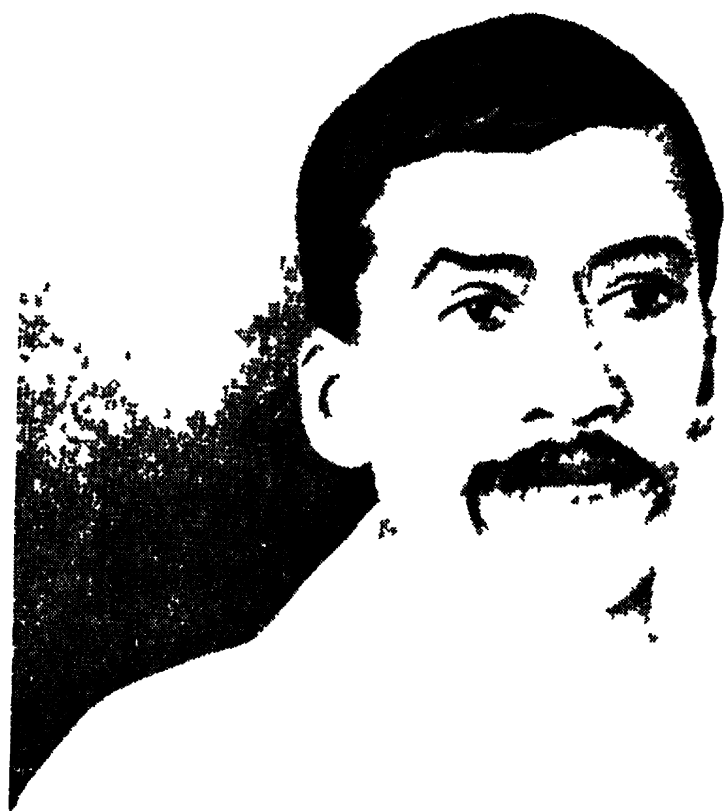
পূর্ণযোগের প্রবর্তক ও দিব্যজীবনদর্শনের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ

॥ এক ॥

"আপনার সামনে আমি এইটুকু নিবেদন করছি যে, এরপরে যখন সকল বাদানুবাদ থেমে যাবে, যখন স্তব্ধ হয়ে যাবে এইসব আন্দোলন ও কোলাহল, এই আসামীও যখন দেহত্যাগ করে পরলোকে চলে যাবেন, তারো পরে—বহুকাল পরে—ভারতের লোক বলবে যে, ইনি ছিলেন দেশপ্রেমের এক অমর কবি, জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত আর সমগ্র মানবজাতির নিঃস্বার্থ প্রেমিক। ইনি যখন এ জগতে থাকবেন না, তখনো পর্যন্ত এঁর বাণী কেবল ভারতের মধ্যেই নয়, এদেশ ছাড়িয়েও দূর-দূরান্তরের সাগরপারে সকল দেশ-বিদেশ ব্যাপ্ত হয়ে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হবে। তাই আমি বলছি, ঐ ব্যক্তি আজ কেবলমাত্র এই আদালতেরই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচার চাইছেন না—ইনি এসে এখন দাঁড়িয়েছেন ইতিহাসের মহা আদালতের কাঠগড়ার সামনে।"

এই আসামীর নাম অরবিন্দ ঘোষ।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে ইনিই ছিলেন পয়লা-নম্বরের আসামী। উত্তরকালে এঁকেই আমরা পেয়েছি দিব্যজীবনের দিশারী, পুরুষোত্তম শ্রীঅরবিন্দরূপে।

স্বনামধন্য দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন দাশ—পরবর্তীকালের দেশবরেণ্য নেতা, সর্বত্যাগী দেশবন্ধু—ছিলেন এই মামলায় আসামীপক্ষের কৌঁসুলি। সেদিন তিনি ছিলেন উদীয়মান ব্যারিস্টার, কিন্তু কী অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গেই না তিনি তাঁর বন্ধু অরবিন্দের পক্ষ নিয়ে লড়েছিলেন। তাইতো এই বিচার-বিবরণ স্থানকালের সীমা অতিক্রম করে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্মরণীয় হয়ে আছে। থাকবেও চিরকাল। কারণ কৌঁসুলির সেই আবেগ-উদ্দীপ্ত সওয়ালের মাধ্যমে সেদিন যেন ইতিহাস-বিধাতাই একটি পরম সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। সেই নিগূঢ় সত্যটিকে অবলম্বন করেই আমাদের প্রবেশ করতে হবে লোকোত্তরচরিত্র এই যুগমানবের জীবনের অন্তঃপুরে।

যুগ-যুগান্তরের মানব-সভ্যতার ক্রমোত্তরণের যে ইতিহাস, তার দিগন্ত আজ যেন

উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে চলেছে এই দীপ্যমান মহাজীবনের স্বর্ণ প্রভায়। তিনি শুধু ভারতাত্মার বাণীমূর্তি নন, তিনি যেন বিশ্বাত্মারই আলোকিত আত্মপ্রত্যয়। এমনি আত্মপ্রত্যয় আর আশ্চর্য আত্মশক্তির অভ্যুদয় সভ্যতার ইতিহাসে কল্প-কল্পান্তরে ঘটে থাকে। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ—সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের এই অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণীর চরম সার্থকতাকে আমরা আজ প্রত্যক্ষ করি শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের ইতিহাস এক কথায় সমগ্র মানবজাতির মহান্ অধ্যাত্ম অভ্যুত্থানের ইতিহাস। একদিকে তিনি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের সমস্ত জীবনটা নিঃশেষে উৎসর্গ করেছেন, অন্যদিকে তিনি বিশ্বমানবের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য যোগসাধনায়—পূর্ণযোগসাধনায়—আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর মধ্যে আমরা দেখি দুইটি সত্তা—বিপ্লবের রণগুরু অথবা রাষ্ট্রগুরু অরবিন্দ ও পূর্ণযোগের প্রবক্তা মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ। এই দুটির মধ্যে আছে ক্রমপরিণতির একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা। এই ধারাটিকে অনুসরণ করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে তাঁর সেই বিরাট জীবনের তপঃক্ষেত্রের দিকে। আমরা জানি, ভারতকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন আর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন দেশমাতৃকার চরণে। সেই ভালবাসা ও সেই বিলিয়ে দেওয়ার কথা পরে যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচনা করব। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন যে, ভারতের সমস্যা একসূত্রে গাঁথা রয়েছে সমগ্র বিশ্বের সমস্যার সঙ্গে তখনি আমরা দেখলাম রাজনীতির কল-কোলাহলপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়ে ভারতের একপ্রান্তে ভারত মহাসাগরতীরে সুদূর পণ্ডিচেরীতে গিয়ে অরবিন্দ পাতলেন তাঁর নতুন ত.গার আসন। দিব্যজীবন সন্ধানের অত্যাশ্চর্য তপস্যা।

যে যুগের বাণী চিন্তায় ও কর্মে মানুষের চিত্তকে মুক্তির নতুন পথে নিয়ে যায় তাকেই ইতিহাসে বলা হয় নবযুগ। নতুন যুগ বা নতুন সৃষ্টি সেই মানুষের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পায় যে মানুষের বাণী পূর্ণের বাণী—যে মানুষের বাণী যেন কালের শঙ্খকুহরে অসীমের নিঃশ্বাস। এমনি একজন যুগমানব শ্রীঅরবিন্দ। এমনি এক নতুন যুগের স্রষ্টা তিনি। পূর্ণতম মনুষ্যত্বের পথে চলবার অভ্রান্ত নির্দেশ আছে একমাত্র তাঁরই বাণীতে। একদা তিনি ছিলেন ভারতের নব জাতীয়তার উদ্বোধনের দূত। অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর নিখাদ দেশাত্মবোধের স্বাক্ষর রেখে গেছেন ইতিহাসের পাতায়। পরিপূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে ভারতবাসীকে তিনিই তো প্রথম উদ্বোধিত করেছিলেন।

তারপর যেদিন তিনি নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন যে, মহিমার জন্মভূমি এই ভারতের আধ্যাত্মিকতার অমর বাণী জগৎকে আবার শোনাতে হবে, দেবতাকে জাগ্রত করতে হবে মানুষের মধ্যে, ঊর্ধ্বলোক থেকে দিব্যচেতনাকে এখানে নামিয়ে

এনে তাকে বিধিমত ভাবে প্রয়োগ করতে হবে মর্ত্যজীবনের সকল ক্ষেত্রে, সেদিন দিব্যজীবনের পথে পদক্ষেপ করলেন তিনি। সত্য-সাধনার দুর্গম পথে একাকী যাত্রী হলেন তিনি। সুদীর্ঘ অজ্ঞাতবাস পরিব্যাপ্ত করে যেদিন শ্রীঅরবিন্দের সাধনা সম্পূর্ণতা লাভ করল, সেদিন তাঁরই তপস্যার সিদ্ধির মধ্যে ভারতের আত্মা স্বচ্ছ জীবনের আকাশে মুক্ত মহিমায় প্রকাশিত হলো। আত্মার বাণী তাঁর মধ্যে যেন মূর্তিমতী হলো। তাঁরই সাধনার মধ্যে আবার জেগে উঠল এই প্রাচীন ও বিপুল ভারত। তাঁরই কণ্ঠে আমরা শুনলাম ঋষি কণ্ঠের প্রতিধ্বনি : 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।' আধুনিক ভারতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পরে, অনেকের বিবেচনায়, শ্রীঅরবিন্দের মতো এমন বিরাট তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ আর জন্মান নি। কিন্তু তাঁর কাছে শুধু অতীতের ঐতিহ্যটাই খুব বড় জিনিস ছিল না, এমন কি, তিনি কেবল তার পুনরাবৃত্তি পছন্দ করতেন না। তাঁর বক্তব্য—"মহৎ অতীতের পরে আবাহন করতে হবে মহত্তর ভবিষ্যৎকে।"

শাস্ত্র বলেছেন : 'লোকো হি সর্বে তপসা ধ্রিয়ন্তে'—অর্থাৎ, যোগী-ঋষিদের তপস্যাই জগৎকে রক্ষা করে। গীতার মধ্যে যে সত্য—যে নিগূঢ় সত্য ছিল, তাকেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনার আলোকে আমাদের সামনে দীপ্যমান করে তুললেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, বর্তমানে পৃথিবী একটা পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে। মানবজাতির ঐক্যসাধন নিয়তি-নির্দিষ্ট, কিন্তু তার অন্তরায় হলো ভেদ-বৈষম্য, বিবাদ-সংঘর্ষ, প্রচলিত রাজনৈতিক মতবাদ সমূহের অপরিহার্য পরিণতি। মানুষকে এই কলুষ থেকে মুক্ত করতে না পারলে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা আকাশকুসুমই থেকে যাবে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনায় উপলব্ধি করেছিলেন যে সত্যিকার স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বলাভ তখনি সম্ভব হবে যখন মানুষ বর্তমান চেতনার কেন্দ্র অতিক্রম করে অধিষ্ঠিত হবে দিব্যচেতনায়। এটা সম্ভব একমাত্র যোগপ্রভাবে গীতায় যার কথা বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যয়ের সুরে : 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'—যোগই কর্মের প্রকৃত কৌশল। অর্থাৎ, মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে যোগসাধনার মধ্যে। তাইতো শেষবারের মতো শ্রীকৃষ্ণ বললেন তাঁর প্রিয় সখা ও শিষ্য অর্জুনকে : 'তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন'।

শ্রীঅরবিন্দও পৃথিবীর মানুষকে—যে মানুষ একদা স্পর্ধাভরে মনে করেছিল বিজ্ঞানের শক্তিকে করায়ত্ত করে সে তার সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবে—লক্ষ্য করে তেমনি প্রত্যয়ের সুরে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন : 'তোমরা যে সব সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছ, যাদের কোন সমাধানের পথই পাচ্ছ না সে-সবের সমাধান মিলবে যোগসাধনায়।' এই যোগ সাধনার কথা পরে যথাস্থানে আরো বিশদভাবে আমরা আলোচনা করব। কারণ শ্রীঅরবিন্দ ও পূর্ণযোগ এক এবং

অভিন্ন। বিগত দুই শতাব্দীর য়ুরোপের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা কী দেখতে পাই? দেখতে পাই যে, দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, মানবপ্রেম শূন্যগর্ভ বাক্য-বুদ্বুদে মাত্র পর্যবসিত হয়েছে—কেবল অহমিকার সম্প্রসারণ ও পরিতুষ্ট সাধন করেছে—বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেমে নবরূপান্তরে তা আজো ফুটে ওঠে নি। য়ুরোপের এই চরিত্র প্রথম অনুধাবন করেছিলেন বিবেকানন্দ এবং তারপরে শ্রীঅরবিন্দ। মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের জটিলতা এখন যে রকম ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, তেমন আর আগে কখনো দেখা যায় নি; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অকল্পিত সাফল্য লাভের ফলে যে শক্তি আজ তার করতলে পুঞ্জীভূত হয়েছে, তাই যুগপৎ তার কল্যাণ ও ধ্বংসের কারণ স্বরূপ হয়ে উঠেছে। য়ুরোপের মানুষ স্বাধীনতা চেয়েছিল এবং তার প্রথম বিস্ফোরণ দেখা গেল ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে। এই বিপ্লব নিয়ে এলো য়ুরোপের মধ্যে জাতীয়তাবোধের খণ্ড-চেতনা এবং কালক্রমে সেই চেতনা ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। সেই সঙ্গে দেখা দিলো বহুবিধ সমস্যা। মনুষ্যত্বের সংকটের শুরু এখান থেকেই। তাইতো দেখা গেলো যে আজকের মানুষ অন্যায়ের ক্রীতদাস, তার ভ্রান্ত অহমিকার বলি। অজ্ঞতার পাষাণ চাপে তার চেতনা আজ আচ্ছন্ন।

এর থেকেই আজকের নিপীড়িত ও উদ্‌ভ্রান্ত মানবাত্মা মুক্তি পেতে চাইছে এবং তাহলেই পৃথিবীর মানুষ আবার ফিরে পাবে জ্ঞান, ঐক্য ও স্বাধীনতা। পৃথিবীর মানুষ এতকাল প্রতীক্ষা করেছে এমন একটি অভ্যুদয়ের জন্য, এমন একজন মহামানবের আবির্ভাবের জন্য যিনি মানবজাতিকে দিতে পারেন পরিত্রাণ এই সঙ্কট থেকে এবং তাকে অভিষিক্ত করতে পারেন প্রকৃত জ্ঞানে ও ঐক্যে। স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষই এই পথ দেখিয়ে এসেছে, কারণ ভারতবর্ষেই সঞ্চিত আছে সেই প্রজ্ঞা, সেই দিব্যচেতনা যা পৃথিবীকে রক্ষা করতে সমর্থ। সুদূর অতীতে ভারতের ঋষিরা হিরন্ময় আধারের মধ্যে আবৃত যে আলোককে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ভারতের আত্মার মধ্যে সেই আলো আজো লুক্কায়িত রয়েছে। সেই আলো দিয়েই তো গড়ে উঠেছে ভারতের আধ্যাত্মিক চরিত্র, তার মহিমা। সেই আলোর ধারাকে পৃথিবীর বুকে নতুন করে নবীন করে বইয়ে দেওয়ার জন্যই তো শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব। ইতিহাসে এইটাই হলো বিধাতৃ-নির্দিষ্ট তাঁর ভূমিকা। চিত্তরঞ্জনের সওয়ালের মধ্যে ইতিহাসের এই সত্যটাই কী প্রকাশ পায় নি?

॥ দুই ॥

থিয়েটার রোডে ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের বাড়ি।

তখনকার দিনে কলকাতায় এই অঞ্চলে বাঙালির বসতি খুব বেশি ছিল না। যে কয়জন বাস করতেন তাঁদের মধ্যে মনোমোহন ঘোষেরই নাম-ডাক ছিল বেশি। কৃতবিদ্য ব্যবহারজীবী হিসেবে তো বটেই, তা'ছাড়া তিনি ছিলেন বন্ধুবৎসল ও উদার-প্রকৃতির মানুষ। মাইকেলের স্নেহাস্পদদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। কিন্তু সকলের উপর তিনি ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক বাঙালি। যে বছরে কংগ্রেসের জন্ম হয় সেই বছরে তিনি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিলাত গিয়েছিলেন প্রথম কংগ্রেস-সভাপতি উমেশ বাঁড়ুয্যের নির্দেশে।

মনোমোহন ঘোষের এই বাড়িতেই তখন সপরিবারে বাস করতেন আর একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালি-সন্তান। নাম তাঁর কৃষ্ণধন ঘোষ, বিলাতফেরৎ, আই. এম. এস ডাক্তার। 'ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ. এম. বি. ; এম. ডি.'—এই নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। মনোমোহন ও কৃষ্ণধনের মধ্যে ছিল নিবিড় বন্ধুত্ব। মধুর হয়ে উঠেছিল এই বন্ধুত্ব তাঁদের পরস্পরের সহধর্মিণীকে উপলক্ষ্য করে। ব্যারিস্টার-পত্নীর নাম ছিল স্বর্ণলতা ; চিকিৎসক-গৃহিণীরও নাম ছিল স্বর্ণলতা। উভয়েই রূপে-গুণে অনুপমা, তবে কৃষ্ণধনের স্ত্রীর সৌন্দর্যের গরিমাটা একটু যেন বেশি মাত্রায় ছিল। দুই ঘোষ-জায়ার মধ্যে ছিল একটা সম্প্রীতির ভাব—ঠিক যেন দুই বোন। দুই সখীতে তাই 'গোলাপ' পাতিয়ে ছিলেন।

এই কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠ জামাতা।

শিক্ষাব্রতী ও ধর্মোপদেষ্টা রাজনারায়ণ বসু বাংলার নব-জাগৃতির ইতিহাসে একটি দিক্‌পাল পুরুষ। আবার ইনিই ছিলেন মাইকেলের সহপাঠী ও অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর দেওঘরের বাড়িতে পরিব্রাজক-জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ একবার রাজনারায়ণের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। "রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' পাঠ করেই আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠেছিলাম"—এ কথা স্বামীজি স্বয়ং বলেছেন। অরবিন্দের জন্মের এক বছর আগে কলকাতায় এক প্রকাশ্য সভায় রাজনারায়ণ যখন

এই চাঞ্চল্যকর বক্তৃতাটি প্রদান করেন, তখন তিনি কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন যে, উত্তর কালে তাঁরই এক দৌহিত্র সন্তানের ধ্যান-ধারণা ও সাধনার মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা এক নবরূপে বিশ্বের সমক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে ?

হুগলী জেলার কোন্নগরে কৃষ্ণধন ঘোষের আদি নিবাস ছিল।

বাংলাদেশের নব-জাগৃতির ইতিহাসে হুগলীজেলার খ্যাতি অবিসম্বাদী। রামমোহন ও রামকৃষ্ণ এই জেলাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গঙ্গা অথবা হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই কোন্নগরের দূরত্ব কলকাতা থেকে উত্তরে প্রায় এগার মাইল। সেকালের কোন্নগর একটি বর্ধিষ্ণু শহর হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিল। বহু সঙ্গতিসম্পন্ন ও শিক্ষিত পরিবারের এখানে বসবাস ছিল তখন। এঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন মিত্র এবং ঘোষ পরিবার। বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কোন্নগরের এই দুই পরিবারের বহু সন্তান স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সেকালের ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম-আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, শিবচন্দ্র দেব এইখানকারই অধিবাসী ছিলেন। বলতে গেলে, আধুনিক কোন্নগরের স্রষ্টাপুরুষ তিনিই। ডাঃ ত্রৈলোক্য নাথ মিত্র, রাজা দিগম্বর মিত্র উভয়েই ছিলেন সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। খ্যাতনামা পুরাতত্ত্ববিদ্, ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সুবিদিত। তখন এই কোন্নগরেরই অন্যতম অধিবাসী ছিলেন মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন যাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সারা বাংলা দেশে সুপরিচিত ছিল।

ঐতিহ্যসম্পন্ন এই কোন্নগরের ঘোষ-পরিবারে ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন কৃষ্ণধন ঘোষ। তাঁর পিতা কালীপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন যেমন সম্ভ্রান্ত, তেমনি বিত্তবান্, আর মা কৈলাসবাসিনী দেবী ছিলেন এক অসাধারণ চরিত্রের মহিলা—রূপের সঙ্গে বহুবিধ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর মতো কোমল অন্তঃকরণ, দয়াবতী কোন্নগরের নারী সমাজে বিরল ছিল বললেই হয়। কৃষ্ণধন তাঁর পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পরের বছর যখন প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষা গৃহীত হয়, সেই বছর (১৮৫৮) পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কৃষ্ণধন এবং বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গেই তিনি ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপরেই তিনি কলকাতায় এসে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তিনি যখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র তখন রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণলতা দেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। রাজনারায়ণের মেদিনীপুরের বাসা-বাড়িতেই ব্রাহ্ম মতে এই বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। তখনো তিনি স্থানীয় জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকতার কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন নি। কেশবচন্দ্র সেন এই বিয়েতে আচার্যের কাজ করেছিলেন।

ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখলে মনে হবে ঋষি রাজনারায়ণের কন্যা স্বর্ণলতার সঙ্গে কালীপ্রসাদের পুত্র কৃষ্ণধনের বিয়ে যেন নব-জাগ্রত বাংলার অন্তর্জীবনের মধ্যে প্রবাহিত দুটি খরস্রোতা ধারার সম্মিলন। অরবিন্দের জীবন-চরিত আলোচনায় এই তথ্য ও এর তাৎপর্য দুই-ই আমাদের মনে রাখা দরকার। যথাসময়ে মেডিকেল কলেজের সর্বশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কৃষ্ণধন উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য বিলাত গমন করেন। কথিত আছে, তাঁর বিলাত যাওয়ার প্রাক্কালে রাজনারায়ণ বসু জামাতাকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, কৃষ্ণধন যেন ওদেশের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে দেশীয় ভাব হারিয়ে না ফেলেন। কিন্তু তাঁর জামাতার জীবনে এই সাবধানবাণী নিষ্ফল হয়েছিল। এ্যাবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষ্ণধন কৃতিত্বের সঙ্গে এম. ডি. পাশ করে যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি পুরো দস্তুর সাহেব—বাঙালি কৃষ্ণধন ঘোষ নন, ডাঃ কে.ডি. ঘোষ এম.ডি। এজন্য রাজনারাযণ মর্মাহত হয়েছিলেন।

সাহেব, কিন্তু অত্যন্ত মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন কৃষ্ণধন।

তাঁর যখন বারো বছর বয়স কৃষ্ণধন তখন পিতৃহীন হন। কাজেই মা কৈলাস-বাসিনীকেই পিতার স্থান পূরণ করতে হয়েছিল। অতএব মায়ের প্রতি পুত্রের ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকা স্বাভাবিক। শেষ বয়সে তিনি কাশীতে বাস করতেন। কৃষ্ণধন মাকে নিয়মিত মাসোহারা পাঠাতেন এবং প্রতিমাসে নিজে হাতে একখানা করে চিঠি লিখে মায়ের কুশল সংবাদ নিতেন। পুত্রের কর্তব্য কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। বছরে দুবার তিনি কাশী গিয়ে মাকে দেখে আসতেন এবং কথিত আছে যে, মায়ের ইচ্ছানুসারে এক হাজার টাকা খরচ করে কাশী বিশ্বনাথের মন্দিবগাত্রে একটি সোনার পাত এঁটে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণধন সম্পর্কে আরো একটি কথা এখানে উল্লেখ্য। বিলাত থেকে তিনি সাহেব হয়ে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর চরিত্রে যেসব সদ্‌গুণ ছিল এবং যার বেশির ভাগ তাঁর মায়েব শিক্ষায় গড়ে উঠেছিল, তার একটিও তিনি হারান নি। কৃষ্ণধনের মুখশ্রী ছিল অনিন্দ্যনীয়—কেমন একটা মাধুর্য প্রতিফলিত হতো সেই মুখশ্রীতে। মনও ছিল সুন্দর, ব্যবহারও অমায়িক—সাহেব কে. ডি. ঘোষ, বিলাতি আদব-কায়দা ও খানা-পিনায় অভ্যস্ত কে. ডি. ঘোষের অন্তঃকরণে বাঙালিয়ানার ভাবটা যেন ষোল আনা বজায় ছিল। শ্বশুর রাজনারায়ণ বসুর সাক্ষ্যেই আমরা এসব তথ্য অবগত হই। এক্ষেত্রে কৃষ্ণধন যেন মাইকেলের সগোত্র ছিলেন। দুজনেই আপাদমস্তক সাহেব, আবার দুজনেই খাঁটি বাঙালি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উনিশ শতকের বাংলায় নবজাগরণের সঙ্গে অরবিন্দের পিতৃকুল ও মাতৃকুলের—বিশেষতঃ মাতৃকুলের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। তাঁর মাতামহ শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে সবল প্রগতিসূচক আন্দোলনের যেমন উৎসাহী কর্মী ও নেতা ছিলেন, তাঁর পিতাও তেমনি সিভিল সার্জনরূপে দেশের নানা স্থানে

শারীরিক স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কাজ করে গেছেন, আবার অন্য দিকে দেশবাসীর মানসিক স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যও নানাবিধ সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টায় যোগ দিয়েছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন বলেই না কৃষ্ণধন তাঁর তিন পুত্রকে সুশিক্ষার জন্য দীর্ঘকাল বিলাতে রেখেছিলেন। তাঁর কথা আরো একটু বলা দরকার, কারণ পুত্র অরবিন্দের মানসগঠনকে বুঝতে হলে তাঁর পিতার মানসগঠনকে জানতে হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতায় তাঁর ছিল অগাধ আস্থা, ধ্রুব বিশ্বাস বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পর থেকেই তিনি মুখ ফেরালেন পশ্চিমের দিকে, বিরূপ হয়ে উঠলেন ভারতীয় জীবনধারার প্রতি। ভারত দেশটা বিলাতের মতো হয়ে উঠুক—এই তিনি চাইতেন মনে-প্রাণে। এখানকার ছেলেমেয়ে সবাই হয়ে উঠুক ইংলণ্ডের ছেলেমেয়েদের মতো কর্মঠ, উদ্যোগী আর প্রাণবন্ত। অবশ্য বিলাত যাবার আগেই তিনি সংশয়বাদী হয়ে উঠেছিলেন এবং ঘোরতর ভাবেই ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ছিলেন। পুরুষকারের সাধক ছিলেন তিনি।

কিন্তু সাহেব কে. ডি. ঘোষ ছিলেন মানবিকতার পূজারী। শৈশব থেকেই এই ভাবটা ছিল তাঁর মধ্যে প্রবল। ওদেশে গিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর চেতনার মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ ভাবেই লক্ষ্যণীয়। রুগ্ন ও বিকলাঙ্গ মানবতার ব্যাধি ভারতের সমাজদেহে যে কী ভয়াবহভাবে বাসা বেঁধেছে এবং তারই অপরিহার্য পরিণতি হিসাবে সামাজিক কাঠামো কী রকম দুর্বলই না হয়ে পড়েছে—য়ুরোপ-প্রত্যাগত যুবক কৃষ্ণধন তা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। সম্ভবত এই কারণেই চিকিৎসক কৃষ্ণধন জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন একান্ত-ভাবে, সম্পূর্ণভাবে। সেই যে জনৈক খ্রীস্টান পাদ্রী বৃদ্ধ রাজনারায়ণকে বলেছিলেন: "আপনার জামাতার মতো এমন সুন্দর মুখশ্রী আমি খুব কমই দেখেছি"—তার আসল রহস্যটা তো এইখানেই। যে মানুষের মন মানুষের দুঃখ বা মানুষের অবনতি দেখে ব্যথিত হয়, তার মুখশ্রী সুন্দর না হয়েই পারে না।

ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরবার পর তখনকার প্রথামত কোন্নগরের সংরক্ষণশীল সমাজ দাবী করল যে, সমাজে বাস করতে হলে কৃষ্ণধনকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বিলাত গমন তখনো সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য হতো। "বরং আমি দেশত্যাগী হব, কিন্তু কিছুতেই এ বিধান মেনে নিতে পারব না—প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে উঠব না।" দৃপ্তকণ্ঠে এই কথা বলেছিলেন সেদিন কৃষ্ণধন। মা তো অনেক আগেই কাশীবাসিনী হয়েছেন, কাজেই পৈতৃক ভিটার উপর তাঁর বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না। কৃষ্ণধন বাড়ি বিক্রী করবেন শুনে এগিয়ে এলেন একজন বিত্তশালী আত্মীয়। কালীপ্রসাদ ঘোষের বাড়ি যেমন-তেমন বাড়ি নয় এবং সেই আত্মীয়টি বেশ ভাল দাম দিয়েই সেটা কিনতে চাইলেন। কৃষ্ণধন স্পর্ধাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং নামমাত্র মূল্য

নিয়ে অনেক ব্রাহ্মণকে তাঁদের বাস্তুভিটা বিক্রি করে দিলেন। সেই থেকে সিভিল সার্জন হিসাবে তিনি জেলায় জেলায় ঘুরতে থাকেন—ভাগলপুর, রংপুর ও খুলনাতেই তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ বৎসর অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি খুব জনপ্রিয় সিভিল সার্জন ছিলেন। বাঙালির মধ্যে তিনিই প্রথম আই. এম. এস. এবং এ্যাবার্ডিনের এম. ডি. ছিলেন। আর্ত ও পীড়িতের বন্ধু হিসাবে সেদিন 'ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ' এই নামটি লোকের মুখে মুখে ফিরত। খুলনায় তাঁর নামে একটি রাস্তা আজো তাঁর জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করছে।

তাঁর পিতৃদেবের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উত্তরকালে পুত্র অরবিন্দ লিখেছিলেন: "তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কোমল অন্তঃকরণ, আবেগপ্রবণ, বেপরোয়াভাবে বদান্য, নিজের অভাব সম্পর্কে উদাসীন, কিন্তু অন্যের দুঃখকষ্টে বিচলিত—এই ছিল ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।"* তিনি যে একজন সুদক্ষ চিকিৎসক ছিলেন অথবা জনসাধারণের বন্ধু ছিলেন শুধু তা নয়, সমকালীন সাহিত্য ও সামাজিক জীবন-ধারার সঙ্গেও তাঁর ছিল নিবিড় পরিচয়। পুত্র অরবিন্দের অভিমতে যদিও কৃষ্ণধন ছিলেন ইংরেজি শিক্ষা ও য়ুরোপীয় সংস্কৃতির একটি সুপক্ব ফল, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাপাঠে তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। ইঙ্গ-বঙ্গ উভয় সমাজেই কৃষ্ণধন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন এবং সম্ভবত সেই কারণেই দুই সমাজের মধ্যে তিনি ছিলেন যোগসূত্র। লোকমুখে তাই তাঁর সম্পর্কে একটি কথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল—'সুয়েজ খাল'। কারণ তাঁর বাড়িতে দিনের পর দিন কি ইংরেজ, কি বাঙালি, সকলের মিলন ঘটত।

কৃষ্ণধনের পরিবারে সুখ-শান্তি রচনার ভার ছিল যাঁর ওপর তিনি হলেন তাঁরই জীবনসঙ্গিনী স্বর্ণলতা দেবী। রূপ ও গুণের আধার এমন পত্নীর সাহচর্য লাভ করে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন। রাজনারায়ণ বসুর মেয়ে তিনি; তাই যেমন শিক্ষিতা, তেমনি ধর্মপ্রবণা ও ভক্তিমতী ছিলেন তিনি। পিতার বহু সদ্‌গুণের অধিকারিণী তিনি হতে পেরেছিলেন। স্বামী যাঁর পুরোদস্তুর সাহেব, তাঁর পত্নীর পক্ষেও পোষাকে-পরিচ্ছদে বিবি সাজা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মানসিকতা যেন একই ছাঁচে ঢালা ছিল, উভয়ের জীবনের তন্ত্রীতে যেন একই সুর ঝঙ্কৃত হতো। কোমলতা ও মাধুর্যের প্রতিমা ছিলেন স্বর্ণলতা। পরের দুঃখকষ্টে তাঁরো হৃদয় বিচলিত হতো, নয়নে অশ্রু ঝরতো। এমন পিতার ঔরসে আর এমন মায়ের গর্ভে শ্রীঅরবিন্দের মতো বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন পুত্রের জন্ম স্বাভাবিক। পৃথিবীতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব এইরকম ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

---

* কর্মযোগিন্ পত্রিকা: সংখ্যা ৭।

॥ তিন ॥

১৮৭২, ১৫ই আগস্ট। ভোর পাঁচটা।

শ্রাবণ মাস। কলকাতার আকাশে তখন বর্ষণক্লান্ত মেঘভার জমে আছে।

থিয়েটার রোডের রাস্তাটি নির্জন। গ্যাস লাইটের স্বল্পালোকিত রাস্তায় কচিৎ দুই-একটি পথচারীকে দেখা যাচ্ছে। মনোমোহন ঘোষের বাড়ির সুসজ্জিত ড্রইংরুমে মুখোমুখী বসে আছেন দুই বন্ধু—কৃষ্ণধন ও মনোমোহন। বসে আছেন তাঁরা নিস্তব্ধ-ভাবে এবং কতকটা নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে। দুজনের মুখেই উদ্বেগের চিহ্ন। কী যেন একটা সংবাদের প্রত্যাশায় তাঁরা অধীর। দেয়ালে বিলম্বিত একটি সুদৃশ্য জর্মন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মৃদু শব্দ ভিন্ন আর কিছু শোনা যায় না। উর্দিপরা একটি মুসলমান বাবুর্চি নিঃশব্দে ঘরের ভিতর এসে চায়ের ট্রে-টি তাঁদের সামনে রেখে দিয়ে তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল। মুখ থেকে জলন্ত সিগারটি নামিয়ে মনোমোহন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বন্ধুকে বলেন—এসো, চা খাওয়া যাক।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন মনোমোহন-জায়া স্বর্ণলতা দেবী।

—শুভ সংবাদ। গোলাপ একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে।

—আপনার সই এখন কেমন আছেন? জিজ্ঞাসা করেন কৃষ্ণধন।

—গত তিনদিন ধরে যেরকম হিস্টিরিয়ার ভাব ছিল, এখন তার কিছু নেই। নবজাতক ও প্রসূতি দুজনেই ভাল আছে।

এই বলে স্বর্ণলতা দেবী চলে গেলেন।

সেই স্মরণীয় উষায় ভূমিষ্ঠ হলেন কৃষ্ণধন-স্বর্ণলতার তৃতীয় পুত্র—অরবিন্দ ঘোষ। তাঁর মায়ের বয়স তখন কুড়ি বছর। বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র বারো বছর। এর আগে পর পর দুইটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়—বিনয়ভূষণ (১৮৬৭) ও মনোমোহন (১৮৬৯, ১৯শে জানুয়ারি) এবং তারপর থেকেই স্বর্ণলতার মধ্যে দুরারোগ্য হিস্টিরিয়া রোগের চিহ্ন দেখা দেয়। তৃতীয় পুত্র যখন তাঁর গর্ভে আসে তখন থেকেই তিনি উন্মাদ-রোগে আক্রান্ত হন। এই প্রসঙ্গে পুত্র বারীন্দ্রকুমার তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন: "কয়েকটি সন্তানের পর পর জন্মের সঙ্গে মা-র মধ্যে হিস্টিরিয়া ও কিছু কিছু উন্মাদ-

রোগের চিহ্ন দেখা যায়। এই রোগ তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল।... প্রতিভাবান রাজনারায়ণের বংশে উন্মাদরোগের বীজ ছিল।" অরবিন্দের জন্মের পর, কৃষ্ণধনের আর একটি কন্যা সন্তান (সরোজিনী) ও একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্রই বারীন্দ্রকুমার। এঁর জন্ম হয় বিলাতে। তাঁর 'পাগ্‌লি মায়ের' সম্পর্কে আত্মকথায় অনেক কাহিনীর উল্লেখ আছে। কিন্তু একটি কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যে হিস্টিরিয়া বা উন্মাদরোগের কথা বারীন্দ্রকুমার বলেছেন, তা আদৌ অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ শ্রীঅরবিন্দের মতো লোকোত্তর মহাপুরুষকে গর্ভে ধারণ করা যেমন-তেমন নারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যাঁর গর্ভে বিরাটের আবির্ভাব, তাঁর দেহের প্রতিটি অনু-পরমাণুতে যে এক অভাবনীয় স্পন্দন জাগবে, এ আমাদের শাস্ত্রবিদিত সত্য। বিরাটের শক্তিকে নিজের গর্ভে ধারণ করেছিলেন স্বর্ণলতা, তাই আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে আমরা অরবিন্দের জন্মের সূচনাকাল থেকেই হিস্টিরিয়া বা উন্মাদরোগে আক্রান্ত হতে দেখি। এতে আশ্চর্য হবার বা অবিশ্বাস করবার কিছু নেই।

নির্বাক পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ।

শৈশবাবধি তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছে একটা আশ্চর্য মৌনতার ভাব এবং তাঁর সমসাময়িক ও সহকর্মিদের সঙ্গে এইখানেই ছিল তাঁর স্বাতন্ত্র্য। কথা বলার যুগে তিনিই ছিলেন একমাত্র নেতা যিনি কথা বলেছেন সবচেয়ে কম, অথচ কাজ করেছেন সকলের চেয়ে বেশি। বাক্যের তুবড়ি তিনি কোনদিনই ফোটান নি—এ জিনিসটা তাঁর প্রকৃতির মধ্যে আদৌ ছিল না। এহেন ব্যক্তির জীবনচরিত রচনা করা অত্যন্ত সুকঠিন। কিন্তু তাঁকে যদি তাঁর বিচিত্র ও বিপুল পরিমাণ রচনার মাধ্যমে বুঝবার চেষ্টা করি, তাহলে হয়ত সেই অতলান্ত ও অপূর্ব আলোকচ্ছটা-মণ্ডিত সেই মনের কিছুটা নাগাল পেতে পারি। কারণ দিব্যচেতনায় বিভূষিত তাঁর অন্তর্জীবনই তাঁর প্রকৃত জীবন। সেই জীবনের ইতিহাস রচনা করা একমাত্র অরবিন্দ-ভাবের ভাবুকের পক্ষেই সম্ভব, অন্যের পক্ষে তা একেবারেই দুঃসাধ্য। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই না তিনি তাঁর জীবনচরিতকারদের উদ্দেশে একটি সাবধানবাণী রেখে গেছেন।

তিনি বলেছেন: "আমার অতীত জীবনের যথার্থ পরিচয় ও তার সত্যস্বরূপ একমাত্র আমি উদ্ঘাটন করতে পারি, আর কেউ নয়। আমার জীবন সম্পর্কে তোমরা বা আর কেউ কিছুই জানো না—বাস্তবতঃ আমার জীবনের পরিচয় সামান্যই।" ১৯৫৩ সালে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে একটি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত হয়। বিপুলায়তন এই বইটির নাম: 'শ্রীঅরবিন্দ অন হিমসেলফ্ য়্যাণ্ড অন দি মাদার'। উদ্ধৃত কথাটি

এই বইটির গোড়াতেই শ্রীঅরবিন্দের স্বাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে। দিব্যজীবনের দিশারী ও বিশ্বমানবের পরিত্রাতা এই যুগমানবের জীবনেতিহাস সম্পর্কে যাঁরাই আলোচনা করবেন তাঁদের পক্ষে এটি একটি অপরিহার্য গ্রন্থ। শ্রীঅরবিন্দের জীবিতকালেই তাঁর বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলায় একাধিক জীবনী রচিত হয়। সম্ভবত সেগুলি পাঠ করার পর তাঁর মনে হয়েছিল যে, তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত কোন কোন বিষয়ে লেখকদের ভ্রান্তি নিরসন করা কর্তব্য। স্বল্পকালস্থায়ী তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সমকালীন বহু ব্যক্তির জীবন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল, বিশেষ করে একজনের। তিনি ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতার ফরাসী জীবনীকার শ্রীমতী লিজেল রেমঁ নিবেদিতা-অরবিন্দ সম্পর্কে তাঁর বইতে যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সেগুলির অধিকাংশই যে কাল্পনিক, তা শ্রীঅরবিন্দের আত্মচরিতমূলক এই বইখানি থেকে জানা যায়।

এমনি কল্পনার আশ্রয় আরো অনেকে নিয়েছেন। ফলে, শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে প্রচলিত জীবনচরিতগুলির মধ্যে দুই-একখানি ভিন্ন অন্যগুলি আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। যে জীবন একান্তভাবেই অন্তর্মুখীন, প্রশান্ত সাগরতুল্য যে জীবনের কল্লোলিত বীচিভঙ্গ বাহ্যতঃ কদাচিৎ পরিদৃশ্যমান, সেই জীবনের গতি-প্রকৃতি ও পরিণতির ধারা যথার্থভাবে অনুসরণ করা বা সঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সাধারণ লেখকের পক্ষে সহজ কথা নয়। আবার নিছক ভক্তির অঞ্জন মেশানো অনুরাগীর দৃষ্টিতেও অতিরঞ্জন থাকা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে একটিমাত্র নিরাপদ উপায় আছে। সেটি হলো ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা ও যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করা। শ্রীঅরবিন্দের সমকালীনদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তি, যেমন বিপিনচন্দ্র পাল বা রবীন্দ্রনাথ, তাঁদের বিবরণ সর্বতোভাবেই গৃহীতব্য। এই লেখকের একবার সৌভাগ্য হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করবার ও তাঁর সঙ্গে দুই-তিনখানি পত্র বিনিময় করবার। সে হলো ১৯৩৪ সালের ঘটনা। সে-বছরে আমি ও আমার সাংবাদিক-বন্ধু প্রমোদকুমার সেন পণ্ডিচেরীর তীর্থে গিয়েছিলাম শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা-কে দর্শন করতে। বন্দে-মাতরম্-পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কাছ থেকে আমি শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের কিছু বিবরণ সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। তেমনি শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম সতীর্থ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবীর কাছ থেকেও কয়েকটি মূল্যবান বিবরণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। এগুলির প্রামাণ্যতা সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। তবে আমি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করেছি শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব রচনার উপর। তাঁর রচনার মধ্যেই তাঁকে অনেকখানি পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ' গ্রন্থখানি সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। মনীষী লেখক প্রায় হাজার

পৃষ্ঠাব্যাপী এই গ্রন্থে বহু অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করেছেন ; তথ্যগত ভুল-ত্রুটি অজস্র, তথ্য-বিকৃতিও কিছু দেখা যায় এবং আরো দেখা যায় যে, বহুক্ষেত্রেই তিনি ভুল সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন যার ফলে খণ্ড-জীবনী হিসাবেও বইটি সার্থকতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। যদিও বইখানি অরবিন্দকে নিয়ে, তথাপি আদ্যন্ত পাঠ করলে পাঠকের মনে এই ধারণাই জন্মাবে যে, তাঁর 'হিরো' অরবিন্দ নন, চিত্তরঞ্জন। জীবনচরিতকারের পক্ষে যে নিরপেক্ষতা প্রয়োজন, তথ্য সংগ্রহে ও তথ্যবিশ্লেষণে যে সতর্কতার প্রয়োজন, গিরিজাশঙ্করের এই গ্রন্থে তার অভাব। পারিপার্শ্বিক ঘটনার দৃশ্যপট অঙ্কন করা এক জিনিস, আর সেই দৃশ্যপটের উপর বর্ণিত চরিত্রের মূর্তি ফুটিয়ে তোলা অন্য জিনিস। শ্রদ্ধেয় লেখক তাঁর এই গ্রন্থে মাত্র ১৯১০ সাল পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেছেন ; যুগমানবের পরবর্তী জীবনলীলা লেখকের কাছে রহস্যে আবৃত বলে মনে হয়েছে। কিন্তু ১৯১০-এর পর শ্রীঅরবিন্দের যে-জীবন, তাই-তো তাঁর প্রকৃত জীবন এবং এর আলোচনা ব্যতীত এই যুগমানব সম্পর্কে আমাদের ধ্যান-ধারণা আদৌ সম্পূর্ণ হতে পারে না।

বরং অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের 'লাইফ-ওয়ার্ক অব শ্রীঅরবিন্দ' এবং অধ্যাপক হরিদাস চৌধুরীর 'শ্রীঅরবিন্দের সাধনা' বই দুটি ক্ষুদ্রায়তন হলেও, শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও জীবনাদর্শকে বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। তেমনি কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার-বিরচিত 'শ্রীঅরবিন্দ' তাঁর ইংরেজি জীবনচরিতগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দিলীপকুমার রায়ের লেখা 'শ্রীঅরবিন্দ কেম টু মি' বইটিও শ্রীঅরবিন্দের জীবন-সাধনার উপর অনেকখানি আলোকসম্পাত করতে সক্ষম হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা শ্রীঅরবিন্দের সুদীর্ঘ জীবনকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করতে পারি : ১. ১৮৭২-১৮৭৯ , ২. ১৮৭৯-১৮৯৩ ; ৩. ১৮৯৩-১৯০৬ ; ৪. ১৯০৬-১৯১০ ও ৫. ১৯১০-১৯৫০—এই পাঁচটি পর্বে পরিব্যাপ্ত তাঁর বিরাট জীবনের সকল ঘটনার উল্লেখ বিস্তারিতভাবে করা অসম্ভব এবং আমাদের পক্ষে তার প্রয়োজনও নেই। সে-কাজ করবেন ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক। প্রথম পর্বে আছে তাঁর বাল্য ও শৈশব জীবন—সাত বছর বয়স পর্যন্ত ; দ্বিতীয় পর্বে ইংল্যাণ্ডে ছাত্রজীবন ; তৃতীয় পর্বে বরোদায় কর্মজীবন ; চতুর্থ পর্বে তাঁর রাজনৈতিক জীবন আর শেষ পর্বে তাঁর মহিমান্বিত সেই আধ্যাত্মিক জীবন যা ভারতবর্ষ তথা সমগ্র পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে—উন্মোচন করে দিয়েছে একটি নব দিগন্তের। যুগমানবের সমগ্র জীবন-নাট্য যেন এই পঞ্চাঙ্কে বিধৃত এবং এর গর্ভাঙ্ক-গুলিও কম বর্ণাঢ্য নয়। এই নাট্যের কেন্দ্র-চরিত্র অরবিন্দ, কিন্তু পার্শ্বচরিত্রের সংখ্যাও বড়ো কম নয়। তাঁদের অনেকের জীবন ও চিন্তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় চরিত্রের জীবন ও চিন্তাকে মিলিয়ে মিশিয়ে দেখতে হবে, নতুবা আমাদের আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না,

নিরপেক্ষ হবে না। ইতিহাসের দৃশ্যপটে সংস্থাপিত করেই এই চরিত্রগুলিকে দেখতে হবে ও তাঁদের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করতে হবে।

অরবিন্দের জন্ম উনিশ শতকের সপ্তম দশকের গোড়ায়। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণ বা রেণেসাঁস তখন অনেকখানি পথ অতিক্রম করে একটা শান্ত লয়ে এসে পৌঁছেছে। অরবিন্দের জন্ম বৎসরেই প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' তো তারই একটি ভাস্বর নিদর্শন। বীজ বপনের পর্ব বহু পূর্বেই সমাধা হয়েছে, এইবার অঙ্কুর উদ্গমের পালা। যুগ-যুগান্তের মূর্ছিত ভারত, অবক্ষয়িত হিন্দুত্বের পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রধানত তিনটি প্রেরণার প্রয়োজন ছিল। সেই প্রেরণা সঞ্চারিত হলো পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসবার পর। কোন বিতর্কের আশঙ্কা না রেখেই বলা চলে যে, এই সংস্পর্শটা ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই ভারতবাসীর জীবনে দেখা দিয়েছিল এবং এটা আমাদের জীবনে হয়ে উঠেছিল, যাকে বলে 'শাপে বর' অথবা ছদ্মবেশী কল্যাণ। এই সংস্পর্শ বা 'ইমপ্যাক্ট' আমাদের মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছিল সুপ্ত বুদ্ধি ও আত্ম-সমালোচনার আগ্রহ, এর ফলে সম্ভব হলো জীবনের পুনর্বাসন ও সেই সঙ্গে আমাদের মধ্যে প্রবুদ্ধ হলো নব সৃষ্টির আগ্রহ। তৃতীয়তঃ এই সংঘাতের ফলেই নব জাগ্রত ভারতীয় আত্মা নতুন পরিবেশ ও নতুন আদর্শের মুখোমুখী দাঁড়াল। সেইগুলিকে যখন আমরা যথাযথভাবে অনুধাবন করে, পরিপাক করে নিজেদের ভাবানুযায়ী আয়ত্ত করার তাগিদ অনুভব করলাম, তখনি তো আমাদের চেতনায় ফুটে উঠল নব-জাগৃতির বৈভবময় রূপ। তাঁর 'ভারতের নব জাগরণ' (দি রেণেসাঁস অব ইণ্ডিয়া) গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ এই বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

নতুন যুগ নতুন মানুষ নিয়ে আসে যাঁদের কাছ থেকে আমরা পাই অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্ব। ইতিহাসের নিয়মই হলো এই। এই পুনরুজ্জীবনের পথ অনেকখানি প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন যে কয়জন মহাপ্রাণ ইংরেজ মনীষী, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন তিনজন, যথা—স্যর উইলিয়াম জোন্স, হেনরি কোলব্রুক ও হোরেস হেম্যান। এঁদের সহৃদয়তাপূর্ণ ভারততত্ত্ব আলোচনাই প্রকৃতপক্ষে ভারতের নবজাগরণের শিলান্যাস করে দিয়েছিল। কিন্তু তাহলেও, তাঁরা ছিলেন বিদেশী এবং জাতির মুক্তির কথা জাতির নিজের লোকদেরই ভাবতে হবে, তাদেরই উদ্বুদ্ধ হতে হবে কর্মপ্রযাসে। তাইতো দেখা গেল ভারতের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়ে গেল যুগ-পুরুষ রামমোহনের আবির্ভাবের শুভক্ষণ থেকেই। নতুন যুগে এই পৃথিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত এসেছিল, সেই নব প্রভাতের বার্তা বাংলা তথা ভারতবর্ষে বহন করে এনেছিলেন তিনি। তারপর থেকেই বাংলার সমতল ভূমিতে নামল গঙ্গোত্রীর প্রবাহ। একে একে আবির্ভূত হতে লাগলেন নবজাগরণের নেতৃবৃন্দ: দ্বারকানাথ ঠাকুর, দয়ানন্দ সরস্বতী, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাদেব

গোবিন্দ রাণাডে, বাল গঙ্গাধর তিলক, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। কর্মে, চিন্তায়, মেধায় ও মনীষায় এঁদের প্রত্যেকেই যেন সুমেরুশৃঙ্গবৎ বিরাট। এই ধারার শেষ উদ্ভাসন ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। কাজেই ইতিহাসের দৃশ্যপট থেকে তাঁকে আমরা বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি না। রামমোহনের মতো অরবিন্দ একটি ঐতিহাসিক চরিত্র।

অরবিন্দের পুরোভাগে এই যে মানব-মিছিল, এঁদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রতিভা অনুসারে ভারতীয় সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত করেছেন নতুন প্রেরণায় এবং এঁদের প্রত্যেকেই ভারত-আত্মার মহিমাকে সর্বপ্রযত্নে তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়। নিখিল মানবের সার্বিক কল্যাণের জন্য তার উপযোগিতার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিপন্ন করেছেন। অরবিন্দ নিজেই তো এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁর 'বঙ্কিম টিলক-দয়ানন্দ' গ্রন্থের একস্থলে তিনি বলেছেন: "শাশ্বত এই আমাদের দেশ, শাশ্বত স্বদেশবাসী আর শাশ্বত আমাদের ধর্ম। এই ধর্মের মহত্ত্ব আচ্ছন্ন হতে পারে, কিন্তু কখনো এক মুহূর্তের জন্য তা বিলুপ্ত হবার নয়। ক্ষাত্রশক্তিসম্পন্ন বীর, ঋষি অথবা সাধু—সবই এই ভারতের মাটির স্বাভাবিক ফসল এবং এমন একটি যুগ দেখা যাবে না, যখন তাদের আবির্ভাব না ঘটেছে।" এর মধ্যে যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ কি তাঁর নিজের সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন? হয়ত করেছেন।

অরবিন্দের জন্ম ১৮৭২ সালে। তাঁর ভূমিষ্ঠ হবার আগের চৌদ্দ বছরের দৃশ্য-পটটার প্রতি এবার দৃষ্টিপাত করা যাক। এই সময়কার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশের সঙ্গে ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাটাও আমাদের আলোচনার বলয়ের মধ্যে রাখতে হবে। প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে যে, এই বিরাট দেশে সেই সময় কি কি শক্তি সক্রিয় ছিল। গোটা ভারতবর্ষ তখন ইংরেজ শাসনের লৌহ-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে, কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকটি সামন্তরাজ্য নিজ নিজ সীমানার মধ্যে কতকটা স্বায়ত্ত শাসনের রীতিতে তাদের তথাকথিত সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে পেরেছে, যদিও আসলে এটা ছিল রাজশক্তির বিশেষ অনুগ্রহের দান, কারণ ঐসব সামন্তরাজ্যেও ব্রিটিশ শাসনের যথেষ্ট ছায়াপাত হতো। কোন সামন্ত নৃপতিরই স্বাধীন গতিবিধির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের (ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ যাকে 'মিউটিনি' আখ্যা দিয়েছিল) পরেই শুরু হয় ইংরেজের কঠিন এবং নৃশংস শাসন। বিদ্রোহ দমিত হলো বটে, কিন্তু স্বাধীনতার আগুন ভস্মস্তূপের মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে। মাঝে মাঝে ঘটে তার বিস্ফোরণ। এরই নিদর্শন ছিল বাংলার চাষীদের বিদ্রোহ আর ওয়াহবি আন্দোলন। শেষের বিদ্রোহটা ছিল কতক ধর্মসংক্রান্ত আর কতক রাজনৈতিক। অবশ্য এগুলির মধ্যে সর্বভারতীয় কোন ব্যাপকতা ছিল না।

তবে আগুনের শিখা এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে জ্বলে উঠত এবং এর পিছনে কিছুটা অর্থনৈতিক আর কিছুটা রাজনৈতিক কারণ পরম্পরা বিদ্যমান থাকত। তবে একথা সত্যি যে, সাতান্ন সালের অভ্যুত্থানের ফলে ভারতের মাটিতে বিদ্রোহের যে বীজ রোপিত হয়েছিল, পরবর্তীকালের অঙ্কুরোদ্গম যে সেই প্রচ্ছন্ন বীজ থেকেই সম্ভব হয়েছিল তার সমর্থন আছে সিপাহীযুদ্ধের পরবর্তী ইতিহাসে।

এইবার এইসময়কার অর্থনৈতিক চিত্রটা একটু তুলে ধরি। ইতিহাসের ছাত্রদের জানা আছে যে, ইংরেজ প্রথমে এসেছিল বণিক হয়ে। তারপর সে বণিকের তুলাদণ্ড ফেলে দিয়ে গ্রহণ করল রাজদণ্ড এবং শেষে কৌশলে করায়ত্ত করল বিশাল ভারত সাম্রাজ্য—যে সাম্রাজ্য কালক্রমে হয়ে উঠেছিল অশোকের সাম্রাজ্যের চেয়েও বিস্তৃত, মুঘল সাম্রাজ্যের চেয়েও সমৃদ্ধ। কিন্তু দোকানদারি বুদ্ধিটা তারা কখনো ত্যাগ করতে পারে নি। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর অর্থনৈতিক ইতিহাসে প্রভূত পরিমাণ তথ্য সহকারে প্রমাণ করেছেন যে, ভারতের অপরিমিত ধনসম্পদ শোষণ করেই ইংল্যাণ্ডের লক্ষ্মীশ্রী সম্ভব হয়েছিল। এই অর্থনৈতিক শোষণই ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের মূল নীতি। ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল এই নীতির দৌলতেই। ভারতবর্ষ ছিল তাদের কাছে কাঁচা মালের জোগানদার, আর এখানকার মানুষ গ্রহণ করবে ইংল্যাণ্ডে তৈরি যত কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। মেজর বি. ডি. বসুর বিখ্যাত বই 'দি রুইন অব ইণ্ডিয়ান ট্রেড অ্যাণ্ড ইনডাসট্রিজ' পাঠে জানা যায় যে, শাসকগোষ্ঠী তাদের এই মতলব অব্যাহত রাখার জন্য কোন রকমের অন্যায়কে অন্যায় বলেই মনে করে নি। এইভাবেই সেদিন ধ্বংস হয়েছিল ভারতের নিজস্ব অনেক অর্থকরী শ্রমশিল্প। ব্যবসা-বাণিজ্য সবই থাকত শাসকজাতির কবলে। এর ফলে ভারতবাসীর দারিদ্র্য ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। কি কোম্পানির আমলে, কি মহারাণীর আমলে ভারতের এই ক্রম-বর্ধমান দারিদ্র্যের কথা বলেছেন দাদাভাই নৌরজী, বলেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত। রমেশচন্দ্র তো স্পষ্টভাবেই তাঁর 'দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন যে, ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতে শান্তি স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু ভারতবাসী বঞ্চিত হয়েছে সমৃদ্ধি থেকে।* মোটকথা, ইংরেজ আমলে ভারতের শ্রমশিল্পের সর্বনাশ, ভারতবাসীর দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। একদিকে ইংরেজের নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক প্রভুত্ব আর অন্যদিকে তাদের অবাধ অর্থনৈতিক শোষণের পথ দিয়েই ভারতীয় জনসাধারণের মনে যে অসন্তোষের ভাব পুঞ্জীভূত হতে থাকে, কালক্রমে তাই-ই একদিন ইতিহাসের অমোঘ বিধানে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।

---

* লেখকের 'রমেশচন্দ্র' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এবং তাঁরা এ বিষয়ে একটা নিরপেক্ষতাই দেখিয়ে এসেছেন। সাতান্ন সালের ভারতব্যাপী সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা বুঝেছিলেন যে, শাসিত জাতির ধর্মবিশ্বাসের উপর হাত পড়লে হঠাৎ বিস্ফোরণ হয়ে একটা মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এই নিরপেক্ষ নীতি শাসন ব্যবস্থাকে কায়েম করবার পথে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। এর থেকে অবশ্য আমাদের এই ধারণা করবার :কোন কারণ নেই যে, শাসকজাতি হিন্দু বা মুসলিম অথবা অন্য কোন ভারতীয় ধর্মের উপর সত্যিকার কোন শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাঁদের চক্ষে ভারতবাসী ছিল 'হিদেন'। এদেশের ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের যা কিছু ধ্যান-ধারণা, তা তাঁরা অবগত হতেন প্রধানত খ্রীস্টান পাদ্রীদের মাধ্যমে। ভারততত্ত্বের গবেষণা তখনো পর্যন্ত খুব প্রবল হয়ে ওঠেনি, ফলে পাশ্চাত্যের কাছে ভারতের পরিচয় তেমনভাবে প্রকাশিত হয়ে ওঠে নি। বিজিত ও বিজেতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই শাসকজাতি ভারতের ধর্ম ও সামাজিক আচরণকে অনেকটা উপেক্ষার মনোভাব নিয়েই দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। ফলে এদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে জাগ্রত করে দিয়েছিল এক প্রকার বিকৃত মানসিকতার। সেই মানসিকতা রচনা করেছিল শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান। খ্রীস্টান মিশনারিদের প্রতি শাসক জাতির পক্ষপাতিত্ব সুবিদিত। শুধু পক্ষপাতিত্ব নয়, সহানুভূতিও। এদেশের অপপ্রচারের ফলেই তো শাসকবর্গের মনে এইরকম একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, ভারতে যত রকমের ধর্ম আছে সব কিছুর চেয়ে তাদের খ্রীস্টধর্ম হলো বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ভারতবাসীর ধর্ম বা ধর্মাচরণ কুসংস্কারের নামান্তর মাত্র।

ঠিক সেই সংকটক্ষণেই আবির্ভাব ঘটল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের। তাঁর অলৌকিক সাধনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভারতের আধ্যাত্মিক গগন আর সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মের স্রোতোমুখ যেন একটা নতুন বাঁক নিল। পাশ্চাত্যের ছাঁচে ঢালা দেশীয় সংস্কারকদের দল তাঁকে দেখে বিস্ময়ে অবাক এবং হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর অদ্ভুত সাধনা ও সিদ্ধি তাঁদের এই সত্যটাই বুঝিয়ে দিয়েছিল—শুধু বুঝিয়ে দেওয়া নয়, নিঃসন্দেহে প্রমাণও করে দিয়েছিল—যে, ধর্মের বিষয়টা গভীরতর শ্রদ্ধার দৃষ্টি দিয়ে দেখা উচিত। তাঁকে দেখেই আমরা বুঝলাম হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় আর এর অন্তর্নিহিত শক্তি কী গভীর ও ব্যাপক। যে পূর্ণযোগের প্রবক্তা শ্রীঅরবিন্দ, সেই যোগপদ্ধতি রামকৃষ্ণের সময় থেকেই এক অটল ভিত্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়েছিল। শুধু তাই নয়। তাঁর সর্বব্যাপক ও সকল মানুষের উপযোগী অনুশাসনবাণী ও শিক্ষা এবং দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে তাঁর মানবতা ও বিশ্বজনীনতা ধর্মের ক্ষেত্রে একটা নতুন চেতনার সৃষ্টি করে দিয়েছিল। তারপর তাঁরই বাণীবাহকরূপে স্বামী

ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা এক নতুন গরিমা নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে থাকে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই সময়কার চিত্রটা এইরকম। প্রাচীন আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতি আর রইল না। মেকলের ফরমান অনুযায়ী এদেশের নতুন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতির অবতারণা করা হলো। ঐতিহ্যের প্রচলিত রীতিকে উচ্ছেদ করে দিয়ে এখানে পাশ্চাত্যের তথাকথিত উদারনৈতিক ব্যবস্থা ও কেবল বুদ্ধিরই অনুশীলনের নবরীতি প্রবর্তিত করা হলো। প্রধান স্থান পেল ইংরেজি ভাষা। নবশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য দাঁড়াল কোন রকমে এই ভাষাটিকে আয়ত্ত করা, অন্য বিষয়গুলির পঠন-পাঠন গৌণ হয়ে পড়ল। তৈরি হলো এক নতুন শিক্ষিত সম্প্রদায় যাদের ইংরেজি ভাষাতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি, কিন্তু স্বদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা ছিল শোচনীয। এই শিক্ষিত সম্প্রদাযই শাসকজাতির হাতে তাদের শাসনযন্ত্র চালাবার যন্ত্র-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। পরানুকরণে এরা দক্ষ হয়ে উঠল—বিস্মৃত হলো নিজেদের জন্মগত মহৎ সংস্কার আর পিতৃপুরুষের অনুসৃত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনধারা। এই নব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষদের ধিক্কার দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন: "এরা আকৃতিতেই ভারতীয়, কিন্তু সকল বিষযেই এরা বিজাতীয়—'ডিন্যাশনালাইজড্'। এরা ইংরেজের মানসপুত্র।"

শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের এই হলো পশ্চাৎপট। এই ছিল সেই যুগের জীবন ও চিন্তাধারা। বংশ এবং পিতামাতার প্রভাবে যেমন মানুষের চরিত্র গডে উঠতে দেখা যায, তেমনি তার বিকাশের পিছনে থাকে যুগের প্রভাব। এইবার আমরা দেখব অরবিন্দের জন্মকালে তাঁর জন্মভূমি ও শৈশবের বাসভূমি বাংলাদেশে কি কি প্রভাব সক্রিয ছিল। আমাদের জানা আছে যে উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশেই এখানে পুনরভ্যুত্থানের তৎপরতা পূর্ণমাত্রায চলতে থাকে। তখন এর প্রত্যেক ক্ষেত্রে বডো বডো মনীষী তাঁদের প্রতিভা ও উদ্যমকে যথাসাধ্য সচেষ্টভাবেই প্রযোগ করেছিলেন। আত্মজিজ্ঞাসার ও অতীত সন্ধানের আকাশ-প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছিলেন তাঁরা। দেশের মধ্যে তাঁরা এনে ফেলেছিলেন এক নতুন রকমের দৃষ্টিভঙ্গি। তখন শুরু হয়েছে মোহ-ভঙ্গের যুগ, ঘুচতে আরম্ভ করেছে দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্লীবতার অবসন্নতা। নব প্রভাতের আলোয় বাঙালির হৃদয় মন যেন অগ্নিকমল হয়ে ফুটে উঠতে ব্যগ্র হয়েছিল। সন্ন্যাসীর কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হলো প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন রাগিনী। ভারত তার উপযুক্ত ক্ষেত্র। সেই ভারতকে এই ভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলবার জন্য বাংলা দেশই সবচেয়ে বেশি কাজ করেছিল। নবজাগ্রত এই বাংলাদেশেই ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের তৃতীয় পুত্ররূপে আর জাতীয়তাবাদের ঋষি রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করলেন ক্ষণজন্মা অরবিন্দ।

॥ চার ॥

—আমি তোমাকে বলে রাখছি মনু, বড়ো হয়ে 'অরো' একটা কিছু হবে।

—সকল বাপ-মায়েই তো আশা করে যে, তাদের ছেলেমেয়ে বড়ো হয়ে একটা কিছু হোক। অরোর সম্পর্কে আমারও ঠিক ঐ ধারণা।

—আমার কি ইচ্ছা জানো? তিনটি ছেলে তিনভাবে বড়ো হোক। মনো হবে কবি, বিনু হবে ডাক্তার আর অরো হবে—

—সিভিলিয়ান, তাই তো?

দুই বন্ধুতে একদিন সকালে থিয়েটার রোডের বাড়িতে বসে এই রকম আলোচনায় যখন নিযুক্ত ছিলেন তখন ছোট ছেলের হাত ধরে স্বর্ণলতা প্রবেশ করলেন সেই ঘরে। তাঁর পিছনে তাঁর সখী স্বর্ণলতা। তাঁর পুত্র কন্যাদের মধ্যে কৃষ্ণধনের প্রিয়তম পুত্র ছিলেন অরবিন্দ। তাকে আদর করে তিনি ডাকতেন 'অরো' বলে। নিজে যদিও তিনি সংশয়বাদী মানুষ, তথাপি অরবিন্দকে তিনি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের দান বলেই মনে করতেন। মনে করতেন মা স্বর্ণলতা। মনে করতেন পিতৃবন্ধু মনোমোহন ঘোষ ও তাঁর সহধর্মিণী। থিয়েটার রোডের সেই বাড়ির সকলের নয়নানন্দ নিধি হিসাবেই গণ্য হয়েছিল সেই অনিন্দ্যসুন্দর দেবশিশু। চাঁপাফুলের মতো পাতলা ঠোঁট, আয়ত চক্ষু, পদ্মফুলের মতো ঢলঢলে মুখ—যে একবার এই শিশুটিকে দেখত, সে আর চোখ ফেরাতে পারত না।

বিনয়ভূষণ, মনোমোহন, অরবিন্দ ও বারীন্দ্র।

কৃষ্ণধনের এই চারটি পুত্রের মধ্যে জগদ্বিখ্যাত হলেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্রও স্বল্পবিস্তর সুপরিচিত। কিন্তু বিনয়ভূষণ ও মনোমোহনের বিষয় অনেকেরই জানা নেই। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষালাভের পর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনয়ভূষণ কুচবিহার মহারাজের একজন উচ্চ পদস্থ অফিসার—'এডিকং'-এর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মধ্যম পুত্র মনোমোহন বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে কৃষ্ণধন তাঁর এই ছেলের নামকরণ করেন মনোমোহন—যেমন দীনবন্ধু মিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্বের স্মারক হিসাবে তাঁর এক ছেলের নাম রেখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র। মনোমোহন সম্পর্কে

অরবিন্দ স্বয়ং অথবা তাঁর কোন জীবনীকার বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নি। গিরিজাশঙ্কর অবশ্য কিছুটা উল্লেখ করেছেন তাঁর বইতে। মনোমোহন ঘোষের একমাত্র কন্যা লতিকা ঘোষের কাছ থেকে তাঁর স্বনামধন্য পিতৃদেব সম্পর্কে যেটুকু বিবরণ আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি, প্রসঙ্গত এখানে তার কিছু উল্লেখ করছি।

মনোমোহন শিক্ষালাভ করেছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার গ্রামার স্কুলে এবং অক্সফোর্ড ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে। তিন ভাইয়ের মধ্যে মনোমোহন ও অরবিন্দই পড়াশুনায় খুব ভালো ছিলেন। মনোমোহন প্রতিযোগিতায় বৃত্তিলাভ করে ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে প্রবেশ করেছিলেন। গৌরবান্বিত পিতা তাঁর এই দুই পুত্র সম্পর্কে জনৈক আত্মীয়কে এক পত্রে লিখেছিলেন: "অরো হবে দেশের একজন সুদক্ষ শাসক, আর মনো হবে সুকবি ও তার দাদামশাইয়ের মতো উদার বিশ্বপ্রেমিক।" দ্বিতীয় পুত্র সম্পর্কে কৃষ্ণধনের এই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নি। মনোমোহন ঘোষ সত্যিই একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তবে মাতৃভাষায় নয়, ইংরেজি ভাষায়। কৃষ্ণধনের প্রথম তিনটি পুত্রেব মধ্যে কেউই তাঁদের শৈশবে মাতৃভাষার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন নি। তাঁদের অক্ষর পরিচয় হয় এ-বি-সি-ডি দিয়ে, অ-আ-ক-খ দিয়ে নয়। উত্তরকালে অরবিন্দ অবশ্য নিজের চেষ্টায় বাংলাভাষা শিক্ষা করেন ও ঐ ভাষার একজন সুলেখকও তিনি হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মধ্যম অগ্রজ বাংলাভাষা একেবারেই জানতেন না—কেবলমাত্র নিজের স্ত্রীর নামটি ছাড়া, তিনি দ্বিতীয় কোন বাংলা শব্দ উচ্চারণ করতে পারতেন না।

সেণ্ট পলস্ স্কুলে থাকতেই মনোমোহন কাব্য সাধনায় জীবন উৎসর্গ করবেন, এই সংকল্প করেছিলেন। সহপাঠী কবি লরেন্স বিনিয়নের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং কাব্য ও জীবন সম্পর্কে ধারণা নিয়ে দুই বন্ধুতে পত্রালাপও হয়েছিল অনেক। অক্সফোর্ডের ছাত্রজীবনেই তিন বন্ধুর সঙ্গে মিলে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর প্রথম কবিতাবলী। তাঁদের সেই সংকলন-গ্রন্থটির নাম 'প্রিমা-ভেরা' এবং সহযোগী তিন বন্ধু হলেন ষ্টিফেন ফিলিপস্, লরেন্স বিনিয়ন এবং আর্থার ক্রিপ্‌স্। তখনকার বহু সাহিত্য-পত্রিকায় বইখানির প্রশংসা হয়েছিল এবং অস্কার ওয়াইল্ড্ বিশেষ করে মনোমোহনের কবিতার সুখ্যাতি করেছিলেন। ভারতে ফিরে 'গার্ল্যাণ্ড' নামে আর একটি সংকলনে তিনি তাঁর কয়েকটি কবিতা দিয়েছিলেন। এলকিন্ ম্যাথুজ-সম্পাদিত 'শিলিং গার্ল্যাণ্ড সিরিজেও' 'লভ সংস্ য়্যাণ্ড এলিজিস' নামে তাঁর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। জীবিত অবস্থায় মনোমোহন আর কোন বই প্রকাশ করেন নি, যদিও তাঁর রচিত কবিতাবলীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়—ছাপিয়ে প্রকাশ করলে দেড় হাজার পৃষ্ঠার কম হবে না। অধিকাংশই গীতি-কবিতা, কিছু দীর্ঘ কবিতাও আছে। তাছাড়াও আছে অমিত্রাক্ষর ছন্দে

রচিত একখানি অসমাপ্ত মহাকাব্য—'পার্সিয়ুস্ দ্য গর্গন স্লেয়ার'; কাব্যগাথা—'অ্যাডাম অ্যালার্মড ইন প্যারাডাইজ', এবং একখানি নাট্যকাব্য 'নল-দময়ন্তী'। ১৯২৪ সালে মনোমোহনের মৃত্যুর দু'বছর পরে অক্সফোর্ডের ব্ল্যাকওয়েল থেকে লরেন্স বিনিয়নের লেখা একটি মর্মস্পর্শী স্মৃতি কথা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল মনোমোহনের সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সংস অব লভ য়্যাণ্ড ডেথ'। এর কবিতাগুলির উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন য়েটস, ডি-লা-মেয়ার, স্টার্জমুর প্রভৃতি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবিগণ। লণ্ডন মার্কারি পত্রিকায় জন্ ফ্রীম্যান লিখেছিলেন: 'ইংরেজি সাহিত্যের কবি হিসাবে আমাদের সংকলন সমূহে ভারতীয় কবি মনোমোহন ঘোষের স্থান পাওয়া উচিত।'

কবি হিসাবে যেমন, আদর্শ শিক্ষক হিসাবেও তেমনি মনোমোহনের খ্যাতি ছিল। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সরকারী শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন। অবসর গ্রহণের কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। য়ুরোপীয় প্রাচীন সাহিত্যে তাঁর ছিল সুগভীর জ্ঞান আর কবি-শক্তি ছিল সহজাত, তাই তাঁর অধ্যাপনা হতো প্রাণময়, পাশ্চাত্য সভ্যতার নানান দিক তিনি উদ্‌ঘাটিত করে দিতেন তাঁর ছাত্রদের সামনে, আর পড়ানোব মধ্য দিয়ে কাব্যের রসলোকে নিয়ে যেতেন তাদের। মহৎ সাহিত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মনোমোহনের বহু ছাত্রই উত্তরকালে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে মনোমোহন কিন্তু সুখী হতে পারেন নি। মধুর কোমল ছিল তাঁর মন, কিন্তু ভাগ্যে সুখ ছিল না। আবাল্য বিদেশে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁকে চলতে হয়েছে। অপরিচিত অনাত্মীয়দের মাঝখানে নিশ্চয় অনেক সময়ে অস্বস্তি অনুভব করতেন। পরে যখন সাহিত্যিকদের কাছ থেকে তাঁর কবি প্রতিভার স্বীকৃতি এলো, তখনই তাঁকে বিলাত ত্যাগ করে চলে আসতে হলো স্বদেশে। এখানে আর একটি দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া দেখা দিল। সে ছায়া আর কোন দিন অপসৃত হয় নি। তাঁর চির আদরের জীবনসঙ্গিনী অসুস্থ হয়ে শয্যা নিলেন, কথা বলবার বা উঠে বসবার শক্তি পর্যন্ত হারালেন। আমৃত্যু তিনি ঐ অবস্থায়ই কাটিয়েছেন। তাছাড়া, মানিকতলার পৈতৃক বাড়িতে বোমা আবিষ্কারের পর থেকে পুলিশের খরদৃষ্টিও পড়েছিল মনোমোহনের উপর। শোনা যায়, আলিপুর বোমার মামলায় তাঁর দুই সহোদর ও অন্যান্যদের বিচার কালে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তাঁর বাড়ির আশেপাশে সব সময়ে গোয়েন্দা ঘুরত। এমন কি, তাঁর গ্রেপ্তারের আশঙ্কা আছে, এ খবরও তাঁর কাছে পৌঁছল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দেহে মনে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়েও কাব্যচর্চা তিনি পরিত্যাগ করেন নি। ঠিক হয়েছিল, ১৯২৪ সালে অবসর গ্রহণের পর তিনি আবার বিলাত যাবেন, সেখানে প্রকাশিত হবে তাঁর

রচনাবলী। মার্চ মাসে যাবেন বলে টিকিটও কাটা হয়েছিল। ইতিমধ্যে তিনি অসুখে পড়েন এবং তাতেই তাঁর দেহান্ত ঘটে। (৪ঠা জানুয়ারি, ১৯২৪) কলকাতায় তাঁর একমাত্র বন্ধুস্থানীয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবি যখন এখানে থাকতেন তখন কত সময় জোঁড়াসাঁকোয় গিয়ে মনোমোহন তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন ও দুজনে একান্তে বসে কাব্যচর্চা করতেন। কবি স্বয়ং মনোমোহনের কবিতার উচ্চ প্রশংসা করতেন। "মনোমোহন যে কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন, বাংলা ভাষার চর্চা করিলে তিনি নিঃসন্দেহে একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন।"—কবি মনোমোহন ঘোষ সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি স্মর্তব্য। দুঃখের বিষয়, তাঁর বিপুল রচনাবলীর মধ্যে অরবিন্দ তাঁর মধ্যম অগ্রজ সম্পর্কে কোথাও কিছু উল্লেখ করেন নি—এমন কি সাহিত্য-বিষয়ক পত্রাবলীর মধ্যেও নয়। আরো দুঃখের কথা, মনোমোহনের বহু মূল্যবান রচনার পাণ্ডুলিপি আজো পড়ে আছে। দেখেছি, সে সব রচনার লেখার কালি অস্পষ্ট হয়ে আসছে, কাগজ ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। এমন কি, তাঁর জন্মশতবার্ষিকীটা পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালি ঠিক সেইভাবে পালন করে নি, যে ভাবে হওয়া উচিত ছিল।

দেখতে দেখতে অরবিন্দ পাঁচ বছরেরটি হলেন।

এবার লেখাপড়া শিখবার পালা। তিনটি ছেলেকেই কৃষ্ণধন ভর্তি করে দিলেন দার্জিলিঙ-এর লরেটো কনভেন্ট স্কুলে। খাঁটি ইংরেজি স্কুল—ভারতীয় সংস্কৃতি বা শিক্ষা-দীক্ষার নামগন্ধ নেই সেখানে। ছেলেদের তিনি সাহেব করে তুলবেন—এই রকমই মনের ইচ্ছা ছিল পিতার। কিন্তু অলক্ষ্যে থেকে বিধাতাপুরুষ বোধ হয় সেদিন হেসেছিলেন। অন্তত তাঁর তৃতীয় এবং সবচেয়ে প্রিয়তম পুত্রটি সম্পর্কে কৃষ্ণধনের মনের এই ইচ্ছা আদৌ পূর্ণ হতে পারে নি। দার্জিলিঙ-এর কনভেন্টে অথবা তারপরে একাদিক্রমে চৌদ্দ বছর বিলাতে রেখেও নয়। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, ১৮৭২ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে সেই স্মরণীয় উষার শান্ত লগ্নে যে নব শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সে নিশ্চয়ই সাধারণ শিশু ছিল না। একদা যেভাবে মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণ অথবা বেথ্‌লহেমে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সন্তান দিব্য আত্মা যীশু, শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবও কি ঠিক সেই রকম নয়?

তাঁর সুবিখ্যাত 'এসেজ্‌ অন দি গীতা' গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ যে অবতার-তত্ত্বটি বিশদভাবে বুঝিয়েছেন, পাঠককে একবার সেটি স্মরণ করতে বলি। সেটি পাঠ করলেই বুঝা যায় যে, "যে সর্বাঙ্গ সম্পন্ন অপূর্ব মানবীয় ব্যক্তিত্ব জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকেই আধার করিয়া এই যুগ-সন্ধিক্ষণে ভগবান মানবকে অতিমানবত্বে উত্তীর্ণ করাইয়া দিবার জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন।" সেই ব্যক্তিত্বই শ্রীঅরবিন্দ,

যিনি একাধারে "সংসারী ও সন্ন্যাসী, কবি ও দার্শনিক, যোগী ও যুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষ, সত্যদ্রষ্টা ঋষি ও রাজনৈতিক নেতা।" কিন্তু নিগূঢ় এসব তত্ত্বের কথা এখন থাক। আমরা কাহিনীতে ফিরে যাই।

শ্রীঅরবিন্দ নিজে বলেছেন যে, বিলাত যাওয়ার আগে তিনি ইংরেজি ও হিন্দুস্থানী ছাড়া আর কোন ভাষা শিখবার সুযোগ পান নি এবং তাঁদের তিন ভাইয়ের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা হয়েছিল দার্জিলিঙ-এ আইরিশ খ্রীস্টান সন্ন্যাসিনীদের পরিচালিত একটি স্কুলে। অভ্যাসে, আচরণে ও আদর্শে সম্পূর্ণভাবেই ইঙ্গভাবাপন্ন পিতার পক্ষে তাঁর পুত্রগণের শিক্ষার জন্য এই রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করাই সঙ্গত ছিল। "বাবার দৃঢ় সংকল্প ছিল যে তাঁর ছেলেরা সম্পূর্ণভাবে ইংরেজি কায়দায় মানুষ হয়।" সাহেবিয়ানার উপর কৃষ্ণধনের এই উদগ্র ঝোঁক আর সেই সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর এই বিরাগ ও বিরূপ মনোভাব তাঁর পুত্রদের জীবনের ধারাকে তাঁদের শৈশবেই এক ভিন্ন পথে প্রবাহিত করে দিয়েছিল। কথিত আছে যে, বাঙালিয়ানার ছোঁয়াচ থেকে তাঁর পুত্রদের সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণধন কর্মব্যপদেশে যখন যেখানে থাকতেন তখন সেখানে তিনি বাড়িতে কোন বাঙালি চাকর পর্যন্ত রাখতেন না। বাংলা দেশে এমন পিতা খুব কমই দেখা গিয়েছে।

দার্জিলিঙ-এর কনভেন্টে সব কিছু খাঁটি য়ুরোপীয় ব্যবস্থা।

ভারতীয় প্রভাবের নাম গন্ধও সেখানে ছিল না।

কোন ভারতীয় ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা পর্যন্ত সেখানে ছিল না।

এখানে যেসব ছেলেমেয়ে পড়ে সবই ইংরেজ। কৃষ্ণধনের তাই খুব পছন্দ হয়েছিল এই কনভেন্টটি। এখানকারই বোর্ডিং-এ থেকে তিন পুত্রের শিক্ষা চলতে লাগল। তবে বেশি দিন নয়। ছেলেরা মাত্র দুটি বছর এখানে পড়েছিল। বালক অরবিন্দ কনভেন্টে পড়তে এলেন। সদ্যফোটা পদ্মের মতো ঢল-ঢল করছে মুখ, টানা চোখ, কী শান্ত তার উজ্জ্বল দৃষ্টি সেই দুই চক্ষে, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাক, মৃদু কথা, নম্র ব্যবহার—পঞ্চম বর্ষীয় এই বাঙালিটিকে দেখে কনভেন্টের সকল ইংরেজ শিক্ষক-শিক্ষিকাই মুগ্ধ হলেন। মুগ্ধ হলেন তাঁরা ছেলেটির চালচলন আর লেখাপড়ায় তার গভীর মনোযোগ দেখে। ইংরেজি দ্বিতীয় ভাগের শ্রেণীতে ভর্তি হলেন তিনি; বড়দা ও মেজদা উপরের ক্লাসে পড়েন। কনভেন্টের ছাত্রাবাসেই তিন ভাই থাকেন। ক্লাসে তাঁর সহপাঠীরা অরবিন্দের মুখে ইংরেজি উচ্চারণ শুনে অবাক হতো আর বিস্মিত হতেন শিক্ষকরা। তাঁর স্কুল জীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি।

বড়দিন। বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। ক্লাস প্রমোশন হয়ে যাওয়ার পর আর সব ছাত্র-ছাত্রী ছুটিতে বাড়ি চলে গেল। তাঁর দুই দাদাও গেলেন কলকাতায়। গেলেন না শুধু অরবিন্দ। কনভেন্টের প্রধান শিক্ষকের প্রিয় ছাত্র তিনি। ছেলের

মতো স্নেহ করেন অরবিন্দকে। ছুটিতে প্রতিদিন তাকে নিয়ে সকালে-বিকেলে তিনি বেড়াতেন। একদিন খুব সকালে তাকে নিয়ে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্যোদয় দেখালেন। সে দৃশ্য দেখে বালক অরবিন্দ মুগ্ধ হয়। হিমালয়ের বিশালতা, তার তুষারশুভ্র সৌন্দর্য, তার শৃঙ্গশিখরে সূর্যোদয়--মুগ্ধ করল বালকের মনকে। তন্ময় হয়ে তিনি দেখেন সেই অপরূপ দৃশ্য। সকালে যা দেখেছিলেন রাত্রে তাই নিয়ে দশ লাইনের একটি কবিতা লিখলেন অরবিন্দ। কবিতা ঠিক নয়, কবিতার মতো ছন্দোবদ্ধ একটি রচনা। পরের দিন সকালে প্রধান শিক্ষক তাকে যখন জিজ্ঞাসা করেন, কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্যোদয় তার কেমন লাগল, তখন অরবিন্দ বলেন, ভেরি নাইস, স্যর। এই বলে জামার বুক পকেট থেকে পেন্সিল দিয়ে লেখা সেই রচনাটি তাঁকে সসংকোচে দেখালেন। আগ্রহের সঙ্গে সেটি পড়েন প্রধান শিক্ষক। তারপর ছাত্রের পিঠ চাপড়িয়ে তিনি বলেন, বড়ো হয়ে তুমি নিশ্চয়ই একজন বড়ো কবি হবে।

কনভেণ্টের প্রধান শিক্ষকের এই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নি।

তখন কি তিনি জানতেন যে, ষষ্ঠ বর্ষীয় বালক অরবিন্দের মধ্যেই রয়েছে। উত্তরকালের 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের অমর কবি শ্রীঅরবিন্দ?

খুলনা থেকে কলকাতায় তাঁর বন্ধু মনোমোহন ঘোষকে এই সময় এক চিঠিতে কৃষ্ণধন লিখছেন: "মন্টু, আমি ঠিক করেছি আগামী বছরের মে মাসের গোড়ার দিকে স্বর্ণ ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিলেত যাব। বিনু, মনো আর অরোর লেখাপড়ার ব্যবস্থা ওখানেই করব। দেয়ার দি চিলড্রেন সুড রিসিভ য্যান এনটায়ালি ইউরোপিয়ান আপব্রিংইং—কী বলো তুমি? এজন্য অনেক খরচ পড়বে প্রতিমাসে জানি—বাট আই মাস্ট প্রোভাইড দি বয়েজ উইথ দি বেষ্ট অব দি ইংলিশ এডুকেশন। বাই দি ওয়ে, তুমি বোধহয় জানো না, মিসেস ঘোষ ইজ ক্যারিইং এগেন। তাঁরো একটু চেঞ্জ দরকার। তাই এবার আমি সপরিবারেই বিলেত যাচ্ছি। ছেলেদের একটা ব্যবস্থা করে দিয়েই ফিরব।"

শ্বশুর রাজনারায়ণ বসুকেও কৃষ্ণধন অনুরূপ একখানি চিঠি লিখে তাঁর মনের কথা জানিয়েছিলেন। তখন যে সব শিক্ষিত বাঙালি পরিবারের ছেলেরা বিলাত যেতেন সাধারণত তাঁরা উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য অথবা ব্যারিস্টার বা আই. সি. এস হওয়ার জন্যই যেতেন। কিন্তু বাংলা দেশে আর কোন পরিবার থেকে এর আগে বা পরে এত কম বয়সের আর কোন ছেলে বোধ হয় বিলাত যায় নি লেখাপড়া শিখতে যেমন গিয়েছিলেন অরবিন্দ তাঁর অগ্রজ দুইজনের সঙ্গে। আর এত দীর্ঘকাল ধরে সেখানে অবস্থানও কেউ করে নি।

॥ পাঁচ ॥

আপাদমস্তক পাক্কা সাহেব ছিলেন ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ। তাঁর ছেলেদেরও তিনি তাই সাহেবিয়ানার তন্ত্রে দীক্ষিত করতে চাইলেন এবং সেটা করতে হলে বিলেতে রেখেই তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতেই হয়। শিক্ষা বিষয়ে গোড়াপত্তনটা এইভাবেই করা কম ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল না এবং কৃষ্ণধনের মতো একজন বেহিসাবী মানুষের পক্ষে এটা যেন একটি রীতিমত দুঃসাহসিক প্রয়াস ছিল। অরবিন্দের বয়স সাত বছর পূর্ণ হতে তখনো চার মাস বাকী যখন কৃষ্ণধন সপরিবারে দ্বিতীয়বার সাগরপারে যাত্রা করলেন। ছেলেদের বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করা ভিন্ন এইবার তাঁর বিলাত গমনের আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল—স্ত্রীর চিকিৎসা।

১৮৭৯, মে মাসের গোড়ার দিক।

বিনয়ভূষণ. মনোমোহন, সপ্তম বর্ষীয় বালক অরবিন্দ, কন্যা সরোজিনী এবং সন্তানসম্ভবা পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণধন জাহাজে চড়ে বিলাত যাত্রা করলেন। এই সময় তিনি রংপুরের সিভিল সার্জন ছিলেন। তিনি যখন প্রথম বার ডাক্তারী পড়তে বিলাত গিয়েছিলেন তখন সেখানে এক নন-কনফর্মিস্ট পাদ্রী পারিবারের সঙ্গে কৃষ্ণধনের আলাপ হয়েছিল। মিস্টার ড্রুয়েট ও মিসেস ড্রুয়েটের তত্ত্বাবধানেই অরবিন্দকে রাখবেন তিনি ঠিক করেছিলেন। কারণ অত অল্প বয়সের ছেলেকে স্কুলে দেওয়া তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। তাই হলো। ইংল্যাণ্ডে এসে কৃষ্ণধন তাঁর বড়ো ও মেজ ছেলে দুটিকে ভর্তি করে দিলেন ম্যাঞ্চেস্টারে প্রাথমিক গ্রামার স্কুলে আর প্রিয় পুত্র অরবিন্দের শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন ড্রুয়েট দম্পতির উপর। তাঁরা সানন্দে গ্রহণ করলেন সেই দায়িত্ব। পিতা-মাতাকে ছেড়ে বহুদিন থাকতে হবে, তাই এই ব্যবস্থা করেছিলেন ছেলেদের জন্য কৃষ্ণধন। প্রবাসে তাঁর তিন পুত্রেরই অভিভাবক হয়েছিলেন এই ড্রুয়েট-দম্পতি।

প্রসঙ্গত অরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্রকুমারের জন্মের কথা উল্লেখ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন: "আমাকে গর্ভে নিয়া বিলাতে পৌঁছিয়া সেখানে মর্মর প্রাসাদের ('ক্রিস্টাল প্যালেস') সামনে লণ্ডন-উপকণ্ঠে

আমার জন্ম। প্রায় সমুদ্রগর্ভে জন্ম বলে নাম হলো বারীন্দ্রকুমার।" এই কনিষ্ঠ সহোদরটি অরবিন্দের বড়ো স্নেহভাজন ছিলেন এবং পরবর্তীকালে অগ্নিযুগের বাংলায় তাঁর সেজদার সঙ্গে বারীন্দ্রও একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি, আলিপুর বোমার মামলায় সেজদার সঙ্গে ইনিও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কিন্তু সে কাহিনী যথাস্থানে বর্ণিতব্য। এখন আমরা ইংল্যাণ্ডে অরবিন্দের চৌদ্দ বৎসরব্যাপী ছাত্রজীবনের কাহিনীকেই অনুসরণ করব।

ইংল্যাণ্ডে অরবিন্দের ছাত্রজীবন সম্পর্কে তাঁর জীবনীকারদের প্রদত্ত বিবরণের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায় না—এক-একজন এক-একরম কথা বলেছেন। এর ফলে তাঁর জীবনের এই অধ্যায়টি সম্পর্কে বহুবিধ কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এই সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ নিজে যা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তাঁর 'অন হিমসেলফ' গ্রন্থটিতে, তাকেই নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য বিবরণ বলে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন: "১৮৭৯ সালে বাবা আমাদের তিন ভাইকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এলেন এবং সেখানে একজন ইংরেজ পাদ্রী ও তাঁর স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে আমাদের রেখে গেলেন। তাঁদের তিনি এই মর্মে কঠিন নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমরা যেন কোন ভারতীয়ের সঙ্গে মেলামেশা না করি অথবা কোন রকম ভারতীয় প্রভাবের আওতার মধ্যে না আসি। এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছিল এবং আমি মানুষ হয়েছিলাম সেই পরিবেশের মধ্যে যেখানে ভারতবর্ষের কোন অস্তিত্ব ছিল না; স্বদেশ, স্বজাতি, নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি—এসব বিষয়ে আমার তখন কোন ধারণাই ছিল না।"

এখানে উল্লেখ্য যে, ইংল্যাণ্ডে ছেলেদের লেখা পড়ার ব্যবস্থা করে, চার মাস পরে কৃষ্ণধন কন্যা, নবজাত শিশু বারীন্দ্র ও স্ত্রীকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। তাঁর তৃতীয় পুত্রের জন্মকাল থেকেই তার সম্পর্কে পিতার মনের মধ্যে কেমন একটা ভাব ছিল; তাঁর কেবলই মনে হতো—এ ছেলেটি ক্ষণজন্মা, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এ একটা কিছু হবে। তাই তাঁর আদরের 'অরো' সম্পর্কে কৃষ্ণধনের চিন্তাভাবনার যেন অন্ত ছিল না। কতো দিন স্ত্রী স্বর্ণলতার সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করেছেন; বলেছেন—এই যে পুত্রটি তোমার গর্ভে জন্মেছে এটি জেনো সাধারণ পুত্র নয়, পুত্ররত্ন। সেই ছেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবার সময়ে কৃষ্ণধনের চক্ষু দুটি যে অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়েছিল, এ আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। "মাই সন, আই চেরিস এ গ্রেট ফিউচার ফর ইউ। আই মে নট লিভ টু সী ইউ ইন ইওর ফুল গ্লোরি।" কৃষ্ণধন কি বুঝেছিলেন, ইহজীবনে তাঁর এই প্রিয়তম পুত্রটির সঙ্গে তাঁর আর দেখা হবে না?

শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর অগ্রজ দুজন

ভর্তি হয়েছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার গ্রামার স্কুলে আর তিনি বাড়িতে মিস্টার ও মিসেস ড্রুয়েটের কাছেই পড়তেন। ড্রুয়েট ছিলেন লাতিন ভাষাতে সুপণ্ডিত। তিনি দেখলেন এই ভারতীয় ছেলেটি খুব বাধ্য আর মেধাবী। বাড়িতেই পড়তেন বলে অরবিন্দ অন্যান্য বিষয়ের বই পড়তেও যথেষ্ট সময় পেতেন। তাই এই সময়ের মধ্যে তিনি বাইবেল, শেক্সপিয়র, শেলি ও কীট্‌সের কাব্য, এবং আরো অনেক লেখকের বই পড়ে ফেললেন। "ড্রুয়েটের কাছে আমি লাতিনই পড়েছিলাম, গ্রীক নয়। লাতিন ভাষায় তিনি আমাকে এমন পোক্ত করে দিয়েছিলেন যে, পরে আমি যখন সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলে পড়তে এলাম তখন কঠিন গ্রীক ভাষা শিখতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নি। সেণ্ট পল্‌সের প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমাকে খুব যত্নের সঙ্গে ঐ ভাষা শিখিয়েছিলেন। এই দুটি ভাষা আয়ত্ত করার ফলেই ওপরের ক্লাসগুলিতে আমি খুব তাড়াতাড়ি প্রমোশন পেতে লাগলাম।"

'গ্রীক, লাতিন আর ইংরেজি'—এই তিনটি ভাষাতে খুব অল্প বয়সেই অরবিন্দ সমান দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ঐ বয়সেই তিনি যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। যে কোন অপরিচিত ভাষাকে সহজে আয়ত্ত করে ফেলবার ক্ষমতা তাঁর ছেলেবেলা থেকেই অতি অদ্ভুত ছিল। এমনি আশ্চর্য ক্ষমতা আমরা দেখেছি আর একজন বাঙালি সন্তানের মধ্যে। তিনি বহু ভাষাবিদ্ হরিনাথ দে। ইংল্যাণ্ডে আসার পর দেখতে দেখতে দু' বছর কেটে গেল। অরবিন্দের বয়স এখন তেরো বছর। সেই কিশোর বয়সেই তাঁর মনের পরিণতি দেখলে অবাক হতে হয়। এ-বিষয়ে তিনি নিজে অবশ্য কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নি। কিন্তু তাঁর বিশিষ্ট জীবনীকারদের বিবরণ থেকে আমরা যে চিত্র পাই সেটি সংক্ষেপে হলো এই :

"যদিও তাঁর হৃদয়াবেগের দিক দিয়ে আর চরিত্রের দিক দিয়ে কোথাও কিছু উল্লেখ দেখা যায় না, কিন্তু এটা জানা গেছে যে, স্বভাবতই তিনি খুব নম্র ও স্নেহপ্রবণ ছিলেন, আর কদাচিৎ কিছুতে রাগ বা উষ্ণতা প্রকাশ করতেন না। এদিকে কারো সঙ্গে মেলামেশা করা বা আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেওয়ার চেয়ে তিনি নিঃসঙ্গভাবে এক কোণে সরে থাকাই বেশি পছন্দ করতেন। আপন মনে তিনি নিজের পড়াশুনা নিয়ে আর নিজের কল্পনা ও চিন্তা নিয়ে থাকতেই ভালবাসতেন। ঐ বয়সের একটি ছেলেকে এতটা বেশি গম্ভীর ও চিন্তাপ্রবণ বললে কথাটা অত্যুক্তির মতো শোনায় বটে, কিন্তু এখানে যথার্থ কথাই বলা হচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে একটি অদ্ভুত অথচ সত্য ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। তাঁর বয়স যখন মাত্র তেরো বছর, তখন হঠাৎ তিনি এমন এক আভ্যন্তরিক প্রেরণা পেলেন যার ফলে তখন থেকেই তিনি সকল বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজের স্বার্থত্যাগ করে চলবেন বলে

দৃঢ়সংকল্প করে ফেললেন। তাঁর আত্মত্যাগের সাধনা ঐ অল্প বয়স থেকেই শুরু হয়ে গেল।"*

স্বার্থত্যাগ!

আত্মত্যাগ!

এই তো অরবিন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এটা ছিল তাঁর সহজাত, কারণ উত্তর কালে পত্নী মৃণালিনীকে লেখা একটি পত্রে তিনি নিজেই বলেছেন: "এই ভাব লইয়া জন্মিয়াছিলাম।" এই যুগমানবের মহিমান্বিত জীবনের প্রতিটি পর্বেই আছে স্বার্থত্যাগ আর আত্মত্যাগের অপূর্ব লীলা। এই চির নির্বাক ও রহস্যময় মানুষটির অতলস্পর্শ মানসলোকের উপর সন্ধানী আলো ফেলতে হলে বুঝতে হবে কী ভাব নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। কিন্তু সে কথা পরে বলব।

লণ্ডনের সেণ্ট পলস্ স্কুল।

ইংল্যাণ্ডের ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি বিদ্যানিকেতন।

সেই বিখ্যাত স্কুলে অরবিন্দ ভর্তি হলেন বারো বছর বয়সে।

ডক্টর ওয়াকর এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। লাতিন ও অন্যান্য বিষয়ে অরবিন্দের দক্ষতা দেখে তিনি চমৎকৃত হলেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে গ্রীক ভাষায় দীক্ষা দিলেন। য়ুরোপের আত্মাকে জানতে হলে লাতিন ও গ্রীক জানতেই হয়। ইংল্যাণ্ডের স্বনামধন্য যাঁরা তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই স্কুলের ছাত্র। মহাকবি মিলটন এখানেই বিদ্যা অর্জন করেছেন। অরবিন্দ ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লণ্ডনে এলেন এবং ১৮৮৪ সালে ভর্তি হলেন এখানকার সেণ্ট পলস্ স্কুলে। এই স্কুলে তিনি পড়েছিলেন পাঁচ বছর। এখান থেকে ১৮৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বৃত্তি নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন এবং অতঃপর কেমব্রিজ কিংস কলেজে প্রবিষ্ট হন। বলা বাহুল্য, কলকাতায় এসে কৃষ্ণধন তাঁর প্রবাসী পুত্র তিনটির লেখা পড়ার সব খবরই রাখতেন। বিশেষ করে তৃতীয় পুত্রটির সম্পর্কে পিতার আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার সীমা-পরিসীমা ছিল না। যে ড্রুয়েট পরিবারের তত্ত্বাবধানে ছেলেদের তিনি রেখে এসেছিলেন, তাঁরা অরবিন্দের সেণ্ট পলস্ স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর ম্যাঞ্চেস্টার ত্যাগ করে অস্ট্রেলিয়া চলে যান। বারীন্দ্রের আত্মকথায় আমরা জানতে পারি যে, অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পথে তাঁরা কলকাতায় কৃষ্ণধনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অরবিন্দ লেখা পড়ায় কতদূর অগ্রসর হয়েছেন তার একটা বিবরণ তাঁকে দিয়ে যান। সেই বিবরণ শুনে পুত্র-গর্বে গর্বিত পিতার মনে, আমরা কল্পনা করতে পারি, এইরকম প্রত্যয় হয়ে থাকবে যে, তাঁর আদরের 'অরো' সম্পর্কে তিনি এতকাল যে উচ্চ আশা পোষণ করে এসেছেন, তা বোধ হয় নিষ্ফল হবে না।

* মহাযোগী: দিবাকর।

এরই প্রতিধ্বনি আছে ১৮৯০ সালে খুলনা থেকে শ্যালক যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লেখা কৃষ্ণধনের একটি সুদীর্ঘ পত্রে। এই চিঠির তারিখ ডিসেম্বর ২, ১৮৯০। সেই চিঠির এক স্থলে তিনি লিখছেন: "আমি আশা করি, তোমার এই ভাগ্নেটি (অরবিন্দ) ভবিষ্যতে দেশের মুখোজ্জ্বল করবে। আমি হয়ত তখন বেঁচে থাকব না, কিন্তু যদি পারো তখন এই চিঠিখানার কথা মনে রেখো আর আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী মিলিয়ে নিও।"* এই চিঠিতেই বিলাতে শ্রীঅরবিন্দের তখনকার সম্পর্কে আরো দুটি জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। কেমব্রিজে কিংস কলেজে অরবিন্দ নিজের কৃতিত্বেই প্রবিষ্ট হয়েছিলেন এবং স্বনামধন্য কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর স্বনামধন্য পুত্র অস্কার ব্রাউনিং (যিনি তেরো বছর যাবৎ ঐ কলেজের পরীক্ষক ছিলেন) অরবিন্দের উত্তরপত্র দেখে এই মন্তব্য করেছিলেন যে, তাঁর সুদীর্ঘ পরীক্ষক জীবনে তিনি এত ভাল উত্তরপত্র কখনো দেখেন নি। তাঁর বিবেচনায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একমাত্র অরবিন্দের রচনাই সর্বোত্তম বা এক্সেলেণ্ট। এর থেকেই বোঝা যায় কি রকম মেধাবী আর প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন অরবিন্দ। একথা মিথ্যা নয়, ভারতীয় লেখকগণের মধ্যে তাঁর মতো ইংরেজি ভাষায় পারঙ্গম লেখক আজ পর্যন্ত খুব কমই দেখা গিয়েছে। অরবিন্দের যে রচনাটির কথা অস্কার ব্রাউনিং উল্লেখ করেছেন সেটির বিষয়বস্তু ছিল শেক্সপিয়র ও মিলটনের তুলনামূলক আলোচনা।

এই প্রসঙ্গটি অরবিন্দ স্বয়ং এক চিঠিতে তাঁর বাবাকে লিখে জানিয়েছিলেন। শ্যালককে লেখা তাঁর সুদীর্ঘ পত্রের শেষাংশে কৃষ্ণধনই পুত্রের সেই চিঠির কিছুটা উদ্ধৃত করেছেন। অরবিন্দের চিঠির সেই অংশটুকু এই: "গত রাত্রে আমাদের এক অধ্যাপকের বাসভবনে আমার কফির নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁর গৃহে কফির টেবিলে সাক্ষাৎ হলো স্বনামধন্য অস্কার ব্রাউনিং-এর সঙ্গে। কিংস কলেজের গৌরবস্থল তিনি। তিনি আমার খুব প্রশংসা করলেন এবং আমাকে বললেন, তুমি বোধহয় জানো যে তুমি একটি সুকঠিন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। এর আগে আমি তেরবার এই পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি এত ভালো উত্তর-পত্র আর দেখি নি। এই উত্তরপত্রগুলির বিষয়বস্তু ছিল প্রাচীন সাহিত্য।"

কৃষ্ণধন শ্যালককে লেখা তাঁর চিঠিখানি শেষ করেছেন এই বলে: "তাহলে ভায়া, তোমার মনের মধ্যে এমন গুণবান ভাগ্নের জন্য কি গর্বের উদ্রেক হবে না?" শ্যালক যোগীন্দ্রনাথ তাঁর ভগ্নীপতির এই স্মরণীয় পত্রের উত্তরে কি লিখেছিলেন তা জানা যায়না। তবে, শুধু তাঁর মাতুল নন, তাঁর স্বদেশবাসীও ইংল্যাণ্ডে অরবিন্দের ছাত্রজীবনের এই কৃতিত্বের জন্য চিরকাল গর্ব বোধ করবে আর বলবে, শুধুমাত্র তাঁর প্রিয়তম পুত্রটিকে মানুষ করবার জন্য কৃষ্ণধন যে তাঁর যথাসর্বস্ব খুইয়ে ছিলেন তা

* শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ: গিরিজাশঙ্কর।

ষোল আনার উপর আঠারো আনা সার্থক হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অন্তত এইটুকু আশ্বাস নিয়ে মরতে পেরেছিলেন যে, তাঁর অয়োর ছাত্রজীবনের প্রতিভার সৌরভ প্রস্ফুটিত অরবিন্দের মতোই আমোদিত করে তুলেছিল লণ্ডনের বিখ্যাত এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যানিকেতন কিংস কলেজের পরিমণ্ডল। এজন্য পিতা অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হন নি। এমন পিতা লাভ করা কারো জীবনে কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়।

শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেণ্ট পলস্ স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি অবসর সময় ইংরেজি কাব্য, সাহিত্য, উপন্যাস, ফরাসী সাহিত্য, যুরোপের প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক ইতিহাস পাঠে অতিবাহিত করেছেন। কিছু সময় তিনি ইতালীয়, জর্মন ও স্প্যানিস ভাষা শিখবার জন্য ব্যয় করেছেন। কবিতা লিখবার জন্যও প্রচুর সময ব্যয় করেছেন। স্কুলের নির্দিষ্ট পাঠ তৈরি করার জন্য তাঁর বিশেষ কোন উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা ছিল না, বরং এজন্য তাঁকে সামান্য সময় দিলেই চলত। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত সাহিত্য ও ইতিহাস সম্পর্কিত রাশি রাশি বই তিনি এক মনে অধ্যয়ন করেছেন এবং তা তিনি করেছেন সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। এই যে একাগ্রচিত্ত অধ্যয়নস্পৃহা—এটাই ছিল অরবিন্দের ছাত্রজীবনের একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। স্কুলের ছাত্র—যার বযস তখন খুব বেশি হলে ষোল কি সতেরো বছর—যে এমন প্রগাঢ় অধ্যযন করতে পারে, তা ভাবলে পরে বিস্মিত হতে হয় বৈকি।

ছাত্রানাং অধ্যয়নং হি তপঃ।

অধ্যযনই ছাত্রদের তপস্যা।

প্রাচীন ভারতের এই শিক্ষার কথা কি সেণ্ট পলস্ স্কুলেব ছাত্র অরবিন্দ জানতেন?

অথবা, এই ভাব নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন।

১৮৯০। স্কুলের পড়া শেষ হলো। এবার কিংস কলেজ— কেমব্রিজের বিখ্যাত শিক্ষানিকেতন। এখানে এক বছরের মধ্যেই লাতিন ও গ্রীক কবিতার জন্য যতগুলি প্রাইজ ছিল তার সবকটিই এই ভারতীয় ছাত্রটি লাভ করলেন। সহপাঠী ইংরেজ ছাত্ররা তাঁর এই কৃতিত্ব দেখে বিস্মিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, কেমব্রিজে তিনি স্নাতক হন নি। প্রথম শ্রেণীর ট্রাইপস্ পরীক্ষার প্রথম অংশে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তাঁর স্থান উঁচুতে ছিল। এই কিংস কলেজেই তাঁর অন্যতম সহপাঠী ছিলেন উত্তরকালের সিভিলিয়ান বীচক্রফ্ট্ সাহেব যাঁর আদালতে অরবিন্দের বিচার হয়েছিল আলিপুর বোমার মামলায়। এখানে তিনি একই সঙ্গে কঠিন ট্রাইপস্ ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাব জন্য তৈরি হয়েছিলেন। অরবিন্দের ছাত্রজীবনে বিলাত

সময়টাই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সাড়ে তিন বছরেই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের ছক অনেকখানি সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল বললেই হয়।

প্রবাসে তিনটি ভাই কিভাবে পড়াশুনা করেছিলেন সেই প্রসঙ্গে অরবিন্দের নিজস্ব বিবরণ খুবই মর্মস্পর্শী। "আমরা তিন ভাই কিছুকালের জন্য একসঙ্গে লণ্ডনে ছিলাম। তখন আমাদের অভিভাবিকা ছিলেন মিস্টার ড্রুয়েটের বৃদ্ধা মা। কিন্তু একদিন ধর্ম নিয়ে মেজদার সঙ্গে ঝগড়া হওয়াতে ভদ্রমহিলা আমাদের ত্যাগ করে চলে যান। পরে বড়দা ও আমি সাউথ কেনিংসটনে লিবারেল ক্লাবে একটা ঘর ভাড়া করে সেখানে চলে যাই। এই ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন মিস্টার জে. এন. কটন। ইনি স্যর হেনরি কটনের ভাই। স্যর হেনরি কিছুকাল বাংলাদেশের লেঃ গভর্নর ছিলেন। মেজদা চলে গেলেন লজিংস-এ। এই সময়টাই ছিল আমাদের তিন ভাইয়ের জীবনে সবচেয়ে দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের সময়। পরে কেমব্রিজে বাসা না নেওয়া পর্যন্ত আমিও লজিংস-এ চলে যাই। সেণ্ট পলস্-এ পড়বার সময় একবার সারা বছর দিনে একখানা কি দুখানা স্যাণ্ডউইচ, রুটি ও মাখন আর সকালে এক কাপ চা আর সন্ধ্যেবেলায় এক পেনির স্যাভলয়—এই ছিল একমাত্র আহার্য।"

এখানে একটি প্রশ্ন আছে। কৃষ্ণধনের আর্থিক অবস্থা তখন কি খারাপ হয়ে পড়েছিল? তিনি কি তখন তাঁর প্রবাসী পুত্রদের কাছে নিয়মিত ও প্রয়োজনীয় মাসোহারা পাঠাতে অসমর্থ ছিলেন? তিনি তো কর্তব্যপরায়ণ পিতা ছিলেন এবং এই তিনটি পুত্রের প্রতি তাঁর মমতার সীমা-পরিসীমা ছিল না। বিভিন্ন সূত্রের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এইসময়ে কৃষ্ণধনের নিজের খুব আর্থিক অনটন চলছিল। এর প্রধান কারণ উন্মাদ রোগগ্রস্তা তাঁর স্ত্রী। তাঁকে দেওঘরে একটি স্বতন্ত্র স্থানে (রাজনারায়ণ বসুর গৃহে নয়) রাখার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল এবং তাঁর তত্ত্বাবধানের জন্য বহু টাকা খরচ করে আয়া ও চাকর-বাকর রাখতে হয়েছিল। কনিষ্ঠ পুত্র ও কন্যা সরোজিনীকে তিনি তাঁর নিজের কাছেই রেখেছিলেন। প্রকৃতিতে কৃষ্ণধন ছিলেন, যাকে বলে আমীর লোক এবং সব সময়েই মাত্রাতিরিক্ত খরচ করতেন। এইসব কারণেই শেষের দিকে পুত্রদের তিনি নিয়মিতভাবে আর মাসোহারা পাঠাতে পারতেন না। ফলে তিনটি ভাইকেই প্রবাসে দারুণ অর্থকষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তথাপি অধ্যয়নে তাঁদের ছিল অখণ্ড মনোযোগ। কেমব্রিজে ট্রাইপস্ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে অরবিন্দ যে বৃত্তি পেয়েছিলেন তাই দিয়ে নিজের পড়ার খরচ তখন তিনি নিজেই বহন করতেন।

এইবার বলি তাঁর আই. সি. এস. পরীক্ষা দেওয়ার কথা।

অরো হবে একজন সুদক্ষ শাসক—কৃষ্ণধনের এই ছিল আশা। তাই তিনি অরবিন্দকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য এখান থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে থাকবেন। অরবিন্দ যখন ঐ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন চিত্তরঞ্জন দাশও ইংল্যাণ্ডে এসেছেন ঐ পরীক্ষা দেবার জন্য। এইখানেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত এবং তাঁরা দুই বন্ধুতে একই সঙ্গে ঐ পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হন। তখন চিত্তরঞ্জন ফিরে আসেন ব্যারিস্টারি পাশ করে, অরবিন্দ ফিরে আসেন কেমব্রিজের ডিগ্রী না নিয়ে। অরবিন্দ অবশ্য ঠিক অকৃতকার্য হন নি, কারণ পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলেন। কিন্তু ইচ্ছা করেই ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষাটা দেন নি। দেখা যাচ্ছে, কি ডিগ্রী নেওয়া, কি আই. সি. এস. হওয়া—কিছুতেই যেন তাঁর মোহ ছিল না। এক-আধ বছর নয়, বিলাতে চৌদ্দ বছর থেকে অধ্যয়ন করে না নিলেন তিনি একটা ডিগ্রী, না হলেন আই. সি. এস.—এজন্য সবচেয়ে মর্মাহত বোধ করেছিলেন কৃষ্ণধন। তিনি ইচ্ছা করেই ছাত্রের মাসোহারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ও তাঁকে পত্রপাঠ দেশে ফিরে আসবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

"সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করার জন্য অন্তর থেকে কোন তাগিদই আমি বোধ করি নি।" বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ নিজেই। তিনি আরো বলেছেন: "তাই তো এই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একটা উপায়ের কথা আমি তখন চিন্তা করছিলাম। সরাসরি সার্ভিস প্রত্যাখ্যান না করে কোন একটা ওজুহাতে আমি রাইডিং-এ অকৃতকার্য হলাম। এটা অবশ্য আমার পিতার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না।" কথিত আছে, এই পরীক্ষায় গ্রীক ও লাতিনে তিনি রেকর্ড নম্বর পেয়েছিলেন। অরবিন্দের বয়স তখন কুড়ি বছরও পূর্ণ হয় নি, কিন্তু সেই বয়সেই তিনি দুর্লভ জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। আজন্ম জ্ঞানতাপস তিনি—জ্ঞানই তিনি চেয়েছিলেন, ডিগ্রী নয় অথবা কোন তকমা নয়। তাঁর সেই দেদীপ্যমান ছাত্রজীবনের প্রকৃত গৌরব তো এইখানেই। তাঁর এক জীবনীকার এই প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "মোট কথা, সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরকাল ইংল্যাণ্ডে অধ্যয়ন করার ফলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অগাধ সম্পদভাণ্ডারের চাবীকাঠি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন।" অর্থাৎ পুঁথিগত জ্ঞানের চরম শিখরে তিনি পৌঁছেছিলেন এবং অধীত বিদ্যা পরিপাক করেছিলেন। তাঁর মনীষার গঠন ও বিকাশের পক্ষে য়ুরোপের জ্ঞানভাণ্ডার অনেকখানি সহায়তা করেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে পিতৃ-পিতামহের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে এবং শৈশবাবধি সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর ইংল্যাণ্ডে বাস করার ফলে তিনি কি খাঁটি ভারতীয় ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীঅরবিন্দ নিজেই দিয়েছেন: "বিদেশী ভাবধারা ও আদব-কায়দায় আমি অনেকখানি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম এবং আমি আমার ভারতীয়ত্ব অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছিলাম, ভারত যেমন

হারিয়েছিল তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।"* অথচ তিনি ছিলেন বিধাতা-নির্দিষ্ট সেই যুগমানব যিনি ভারতের লুপ্ত মহিমাকে উদ্ধার করবেন, আর স্বজাতির স্বদেশ-চেতনায় নিয়ে আসবেন রূপান্তর আর নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করবেন আপন ভারতীয় সত্তায়। এইটাই তাঁর ছাত্রজীবনের ফলশ্রুতি।

* বক্তৃতাবলী : শ্রীঅরবিন্দ।

॥ ছয় ॥

বিলাতে তাঁর ছাত্রজীবনের কথা আরো একটু আলোচনা করতে হবে।

বলেছি, শেষের তিন বছর ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর তাৎপর্যটা এবার দেখা যাক।

বিলাতে পাঠ্যাবস্থার শেষের দিকে অরবিন্দ শুধু অধ্যয়ন নিয়েই ছিলেন না। তদ্‌তিরিক্ত আরো কিছু করেছিলেন তিনি। করেছিলেন কাব্য ও রাজনীতি চর্চা। মনোমোহন আর অরবিন্দ এক বৃন্তে যেন দুটি ফুল—অন্তত কাব্য রচনার দিক দিয়ে এটা খাঁটি সত্য। ইংল্যাণ্ডে তাঁদের ছাত্রজীবনেই কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনায় দুই ভাই একই সঙ্গে ব্রতী হয়েছিলেন। অরবিন্দের কবি-প্রতিভার উন্মেষ ওদেশে থাকতেই। ঐ সময়ে আঠারো থেকে কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে তিনি যে সব কবিতা রচনা করেছিলেন সেইগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তাঁর ভারতে ফিরে আসার পর।

যে কোন কবির প্রথম রচনার মধ্যে থাকে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর। তরুণ কবি অরবিন্দ এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। আমরা যাকে বলি আপাত মূল্য অর্থাৎ 'ফেস ভ্যালু', তাঁর এই সময়কার রচনার মধ্যে তার নিদর্শন সুস্পষ্ট। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হলো তাঁর কৈশোরকালের এই কবিতাগুলি পাঠ করলে পাঠকচিত্তে এই প্রত্যাশাই জাগবে যে, সেই প্রাথমিক প্রয়াসের মধ্যেই অনুভব করা যায় একটি নিটোল কবি-সত্তাকে। উত্তরকালে যাঁর লেখনী প্রসব করেছে স্বর্ণোজ্জ্বল সুমহৎ কবিতা, সেই অরবিন্দের তখনকার রচনার মধ্যেই ছিল তার আভাস। একটা উপমা দিয়ে বিষয়টা বলা যেতে পারে। কোন একজন ধনী লোক যদি হ্যাণ্ডনোট নিয়ে কারো কাছ থেকে টাকা ধার করেন, তখন সেই উত্তমর্ণের মনে কোন দ্বিধা বা সংশয় থাকবে না যে, সেই হ্যাণ্ডনোটখানি চোতাকাগজ নয়, কর্জ দেওয়া সেই টাকা সুদে আসলেই তিনি ফিরে পাবেন।

অরবিন্দের প্রাথমিক রচনাগুলি ছিল এই জাতীয় হ্যাণ্ডনোট।

কিশোর কবির রচনায় আবেগ ছিল। বুদ্ধির দীপ্তি ছিল এবং ছন্দগাঁথার দক্ষতাও তিনি ক্রমে অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছিলেন। সমগ্রভাবে বিচার করলে পরে দেখা যাবে যে, সেই কবিতাগুলির মধ্যে বিশুদ্ধ য়ুরোপীয় সংস্কৃতি-প্রসূত শিক্ষা, ভাব, কল্পনা ও অনুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যে বিদেশীভাব থেকে তাঁর উপাদান সংগ্রহ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই এবং এই সময়কার অধিকাংশ কবিতার মধ্যে তার ছাপও সুস্পষ্ট। এসব কবিতার নাম-ধাম গোত্র, বর্ণ-বিন্যাস সবই বিদেশী,

ভারতীয় পাঠকচিত্তে এই ধারণাই জন্মাবে। কিন্তু এ ছাড়া উপায় ছিল কি? তখনো পর্যন্ত ভারত ও ভারত-সংস্কৃতি সম্পর্কে অরবিন্দ তো কিছুই জানতেন না। এছাড়া য়ুরোপের বহু কবির কবি-কর্মের প্রতিধ্বনি আছে তাঁর এই সময়কার কবিতার মধ্যে, নানা সূত্র থেকেই তিনি সংগ্রহ করেছেন তাঁর বিষয়বস্তু। ফলে, অনেকের বিবেচনায়, অরবিন্দের এই কবি-কর্মের মধ্যে আর যাই থাক, সত্যিকারের কবিতার সন্ধান মেলে না। তাঁর 'সংস্ টু মার্ত্তিলা'-র প্রথম দু লাইন পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেয় ফিট্‌জেরাল্ডের 'ওমর খৈয়াম্'-এর প্রারম্ভিক লাইন দুটিকে। নিঃসন্দেহে ঐ বয়সে তিনি 'ভার্স' রচনায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন (এবং সেটা বয়সের বিবেচনায় কম সাফল্যের কথা নয়), কিন্তু কাব্যলক্ষ্মীর অন্তরলোকের সন্ধান তখনো পর্যন্ত অরবিন্দ পান নি। তখনো পর্যন্ত কবির মন অপরিণত, তাই আবেগ ও উচ্ছ্বাসের দিকেই তাঁর প্রবণতা যেন বেশি; শব্দ-ঝঙ্কার ও বর্ণ-সুষমার সৃষ্টিতেই তিনি যেন বেশি আনন্দ পান। তাঁর 'কালেক্‌টেড পোয়েমস্ য়্যাণ্ড প্লেজ' গ্রন্থে এই ধরণের বহু কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। এই কবিতাগুলির মধ্যে লিরিকে কীট্‌সের ও ব্যালাডে স্কটসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তথাপি সন্দেহ নেই, শ্রীঅরবিন্দ একজন 'বরন্ পোয়েট'।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইংল্যাণ্ডে এসে সর্বপ্রথম যে দুটি কঠিন ভাষা অরবিন্দ আয়ত্ত করেছিলেন তা হলো লাতিন ও গ্রীক। বাংলার অমর কবি মাইকেল মধুসূদনও এই দুটি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁরো কবি-কর্মের উন্মেষের মধ্যে এই দুটি য়ুরোপীয় প্রাচীন ভাষার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তেমনি লক্ষ্যণীয় এদের প্রভাব অরবিন্দের প্রথম বয়সের কবিতাগুলির মধ্যে। কিন্তু কবি-প্রতিভা তাঁর যে সহজাত ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, যেমন সহজাত ছিল তাঁর মধ্যম অগ্রজের। এই সময়ে রচিত তাঁর 'নাইট বাই দি সী' সনেটটির মধ্যে কীট্‌সের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; সৌন্দর্যানুভূতি, প্রেম, রহস্যময়তা আর রোমান্টিক ভাব এই সনেটটির প্রতি ছত্র থেকে হীরকদ্যুতিতে বিচ্ছুরিত হয়েছে, ফলে পাঠকচিত্ত সহজেই মুগ্ধ হয়। ছন্দের উপর দখলও লক্ষ্যণীয়; এই অনায়াস দক্ষতা 'দি লাভার্স কমপ্লেন্ট' ও 'লাভ ইন সয়ো' প্রভৃতি কবিতাবলীর মধ্যে আরো সুপরিস্ফুট।

প্রশ্ন হতে পারে কবিতা লেখার প্রেরণা এলো কোথা থেকে?

এলো এই ভাবে। এক-আধ বছর নয়, চৌদ্দটি বছর বিলাতে অতিক্রান্ত হলো। অতিক্রান্ত সেই সুদীর্ঘ সময়ের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন অরবিন্দ—দেখলেন অধ্যয়ন আর অভীপ্সার ভেতর দিয়ে একান্ত নির্জনতার সঙ্গে তিনি কাটিয়েছেন সেই বিস্তীর্ণ সময়। উচ্চাশার সবই যে পূর্ণ হয়েছে তা নয়। এই সময়ের মধ্যে ইংল্যাণ্ডকে যদিও তিনি নিজের দেশ বলে চিন্তা করেন নি,

কিন্তু অসীম অনুরাগ আর আকর্ষণ বোধ করেছেন ইংরেজি ও য়ুরোপীয় চিন্তা ও সাহিত্য সম্পর্কে। এমনিতেই আবাল্য তিনি একটু অতিমাত্রায় নির্জনতা-প্রিয় মানুষ। ইংল্যাণ্ডে তাঁর ছাত্রজীবনে বন্ধু বলতে বিশেষ কেউ ছিলেন না। প্রগল্‌ভতা তাঁর প্রকৃতি থেকে বহু দূরে, প্রয়োজন ছাড়া কথা খুব কম বলতেন। এ ভাব উত্তরকালেও তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছে। পৃথিবী একদিকে, সংসার একদিকে আর তিনি যেন অন্য দিকে। এই ভাব নিয়েই তাঁর জন্ম। এই ভাবের আবরণেই আবৃত তাঁর সমগ্র সত্তা। তাঁর মধ্যম অগ্রজ তো ইংল্যাণ্ডকেই তাঁর মাতৃভূমি বলে জ্ঞান করতেন। অরবিন্দ কখনো তা করেন নি। এখানে উল্লেখ্য যে, জীবনে যদিও তিনি ফরাসী দেশ দেখেন নি, কিংবা ঐ দেশে কখনো বাস করেন নি, তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আবেগের দিক দিয়ে ও বুদ্ধিগতভাবে তিনি যেন বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতেন ফরাসী দেশ সম্পর্কে। তাই তো বিদায়ের বেলায় ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে তিনি কোন বেদনাই বোধ করেন নি যদিও সেখানকার জল-হাওয়ার মধ্যে চৌদ্দ বছর কাটিয়েছেন। সেই মানসিক নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্যই কি তিনি কাব্য-লক্ষ্মীর আরাধনা করেছিলেন তখন? প্রাচীন ও আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যের স্তনরসে তাঁর কবি-কল্পনা যে কতখানি পুষ্ট হয়েছিল তারই সাক্ষ্য বহন করে তাঁর এই সময়কার রচিত কবিতাগুলি।

এইবার অরবিন্দের ছাত্রজীবনে রাজনীতি চর্চার প্রসঙ্গে আসা যাক।

কবিতার ভিতর দিয়ে যেমন তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, তেমনি এবার আমরা দেখতে পাব যে, তাঁর ছাত্রজীবনেই অরবিন্দ স্বল্পবিস্তর রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। দেশপ্রেমের বীজটা তাঁর রক্তের মধ্যেই ছিল। বাইরে থেকে দেখতে শান্তশিষ্ট নিরীহপ্রকৃতির মানুষ হলেও আসলে শ্রীঅরবিন্দ চিরকালই একটি প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরি। এ ভাবটা তাঁর বংশগত বললেই হয়—পিতৃবংশ ও মাতুল বংশ দুই-ই। অ্যাবার্ডিনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেও এবং আচারে-আচরণে ঘোরতরভাবে সাহেব হলেও পিতা কৃষ্ণধন তাঁর নিজের দেশকে খুবই ভালবাসতেন তবে তাঁর নিজস্ব ধারণা এই ছিল যে পাশ্চাত্য রীতিনীতিকে সম্পূর্ণভাবে অনুকরণ করতে পারলেই দেশের সবচেয়ে মঙ্গল হবে। জানা যায় যে, প্রবাসী পুত্রদের কাছে তিনি যেসব চিঠিপত্র লিখতেন তার মধ্যে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা থাকত—থাকত ভারতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অন্যায় অত্যাচার, অবিচার, শাসনে অপটুতা ও হৃদয়হীনতার অনেক বিবরণ থাকত খুব তীব্র ভাষাতেই। ছেলেদের তিনি প্রতি মেলে 'বেঙ্গলি' কাগজ পাঠাতেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলি'

তখন শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে দেশপ্রেমের অগ্নিগর্ভ চেতনা নিয়ে এসেছে বললেই হয়। কখনো-কখনো অমৃত বাজার পত্রিকা ও অন্যান্য সংবাদপত্র থেকে 'কাটিং' কেটে নিয়ে ছেলেদের কাছে নির্বাচিত বিরুদ্ধ মন্তব্যগুলি পাঠিয়ে দিতেন। এর থেকেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এই সাহেব ডাক্তারটি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন না। সুতরাং এমন অনুমান অসঙ্গত না-ও হতে পারে যে, অরবিন্দ তাঁর দেশপ্রেমের প্রথম প্রেরণা এইভাবেই লাভ করেছিলেন।

ভারতীয় রাজনীতির অতিবৃদ্ধ পিতামহ দাদাভাই নৌরোজী তখন থাকতেন ইংল্যাণ্ডে। সেখানে থেকেই তিনি ভারতের দাবী-দাওয়া নিয়ে শাসনতান্ত্রিকভাবে সংগ্রাম করতেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্বনামধন্য যেসব ভারতীয় সন্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে কিংবা ব্যারিস্টারি পড়তে লণ্ডনে যেতেন তাঁদের অধিকাংশই কোন না কোন সূত্রে নৌরোজী-সাহেবের সংস্পর্শে এসেছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত থেকে শুরু করে চিত্তরঞ্জন অরবিন্দ সবাইকেই আমরা দেখি এই বর্ষীয়ান্ দেশপ্রেমিকের সংস্পর্শে আসতে। রমেশচন্দ্রের ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে তাঁর কর্মজীবন পর্যন্ত তিনি এই মানুষটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, তেমনি নৌরোজী সাহেবও ছিলেন রমেশচন্দ্রের বিশেষ গুণমুগ্ধ—এঁরা উভয়েই ভারতের দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক সমস্যার কথা গভীরভাবে আলোচনা করেছিলেন বলেই না পরবর্তীকালে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ অনেকখানি প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল।

বিলাতে চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দ দুজনেই এই নৌরোজীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। এঁরা দুজনেই পার্লামেণ্টে তাঁর নির্বাচনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। লর্ড স্যালিসবারি 'ভারতের সেই কালা আদমি' বলে দাদাভাই নৌরোজীর প্রতি কটাক্ষ করলেন। যুবক অরবিন্দ ও তাঁর বন্ধু চিত্তরঞ্জন দুজনের কাছেই এটা অসহ্য বোধ হয়েছিল—এটা তাঁরা উভয়েই জাতীয় অপমান বলে মনে করেছিলেন। এর প্রতিবাদে অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জন দুজনেই বক্তৃতা করেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের সেই বক্তৃতার মধ্যে দিয়েই ভবিষ্যতের দেশনেতা দেশবন্ধুর বিষাণ ফুৎকার শোনা গিয়েছিল সুস্পষ্টভাবেই। এইটাই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তাঁর অকৃতকার্যতার কারণস্বরূপ হয়েছিল।* এ ছাড়া, তাঁর বিলাত প্রবাসের শেষ বৎসরে অরবিন্দ কেমব্রিজে থেকে ভারতের কংগ্রেসের কার্যাবলী গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গেই পর্যবেক্ষণ করছিলেন বলে জানা যায়। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাব্লিউ. সি. ব্যানার্জি) সে বছরে (১৮৯২) দ্বিতীয় বারের জন্য জাতীয় মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত

*লেখকের 'দেশবন্ধু' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

হয়েছিলেন, এর জন্ম লগ্নে তিনিই ছিলেন এর প্রথম সভাপতি। সেই বছরে বিলাতে সেণ্ট্রাল ফিনসবারি কেন্দ্র থেকে নৌরোজী সাহেব পার্লামেণ্টে সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কেমব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের একটি 'মজলিশ' ছিল। অরবিন্দ সেই মজলিশে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি জোরালো বক্তৃতা করেছিলেন। ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের উন্মেষ কেমব্রিজে থাকার সময়ই দেখা যায়। এই মজলিশ আসলে ছিল ছাত্রদের একটি বিতর্ক সভা, বা ডিবেটিং সোসাইটি। উনিশ শতকের শেষ স্ফুলিঙ্গ সুভাষচন্দ্র যখন কেমব্রিজে অধ্যয়ন করতেন তখন তিনিও এই মজলিশে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উত্তরকালে ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে যে কয়জন বাঙালিসন্তান জাতির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তাঁদের নামেব মুদ্রাঙ্কিত করে গিয়েছেন সেই স্বনামধন্য আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ ও সুভাষচন্দ্র সকলেই রাজনীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন ইংল্যাণ্ডে তাঁদের ছাত্রজীবনে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার কেমব্রিজের এই ভারতীয় মজলিশ প্রথম স্থাপিত হয় ১৮৯১ সালে এবং অরবিন্দ ছিলেন তার সেক্রেটারি। এখানে সেই সময়ে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন কে. জি. দেশপাণ্ডে, হরিসিং গৌর, বীচক্রফট, ফেলিক্স ডিসুজা প্রভৃতি। এঁরা সকলেই মজলিশের তর্ক-বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁর এক জীবনীকারের মতে, মজলিশের সভ্যদের মধ্যে বক্তৃতা করতে গিযে অরবিন্দ কখনো কখনো ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিন্দায় পঞ্চমুখ হতেন ও এমন সব মারাত্মক উক্তি করতেন যাকে বলা যেতে পারে রীতিমতো বিপ্লবাত্মক। অনেকের মতে তাঁকে নাকি এই কারণেই সিভিল সার্ভিসের চাকরিতে নেওয়া হয়নি; ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া অতিরিক্ত এবং হয়ত বা ন্যায্য কারণ বলে গণ্য হয়ে থাকবে। কিন্তু সে কথা থাক। তাঁর এই প্রাথমিক রাজনৈতিক চেতনার শেষ পরিণতি কি হলো এবার দেখা যাক।

দাদাভাই নৌরোজী রাজনীতিতে একজন নরমপন্থী ছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দশকে কেমব্রিজের মজলিশে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই চরমপন্থী হয়ে উঠেছিলেন, এরই পরিণতি 'কমল ও কৃপাণ' ('লোটাস অ্যাণ্ড ড্যাগার') নামে একটি গুপ্ত সমিতি যা সবাই একত্রে মিলে লণ্ডনে গড়ে তুলেছিলেন। অরবিন্দও এই সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজের বক্তব্য এই: "অনেকে বলেছেন যে বিলাতে থাকার সময়ে আমি 'লোটাস অ্যাণ্ড ড্যাগার' নাম দিয়ে একটা গুপ্ত সমিতি গঠন করেছিলাম। কথাটা ঠিক নয়। সেই সময়ে

লণ্ডনস্থ ভারতীয় ছাত্রগণ একবার একত্র হয়ে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করে ও তার এইরকম রোমান্টিক নামকরণ করে। সমিতির প্রত্যেক সভ্যই এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে প্রত্যেকেই ভারতের মুক্তির জন্য কাজ করবে এবং এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তারা বিশেষ ধরণের কাজে আত্মনিয়োগ করবে। আমি নিজে এই সমিতি গঠন করি নি, তবে আমি ও আমার দুই অগ্রজসহ এতে যোগদান করেছিলাম। কিন্তু জন্মলগ্নেই সমিতির মৃত্যু ঘটে। আমার ভারতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত আগে এটি গঠিত হয়েছিল এবং তখন আমি কেমব্রিজ ত্যাগ করেছি।" সমিতি উঠে গেল বটে, কিন্তু সভ্যদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে অরবিন্দ তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। সে-কাহিনী আমরা যথাস্থানে বলব। বিলাতে অবস্থানকালে পিতার চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে প্রথম যে উগ্র দেশপ্রেমের বীজ তরুণ অরবিন্দের হৃদয়ে উপ্ত হয়েছিল, কালক্রমে তা অঙ্কুরিত হয়ে তাঁকে চরম জাতীয়তাবাদের পথে টেনে নিয়ে এসেছিল। সে-ইতিহাস অগ্নিযুগের বাংলার একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য।

ইংল্যাণ্ডে ছাত্রাবস্থায় তিনি অতিবাহিত করেছিলেন চৌদ্দটি বছর। পছন্দ করতেন ইংরেজি ভাষা খুবই—এ ভাষা তাঁর কাছে যে মাতৃভাষার সমতুল্যই হয়ে উঠেছিল তার নিদর্শন তাঁর রচিত কবিতাগুলি। কিন্তু তাই বলে ঐ দেশের প্রতি বা সেখানকার রাজনীতি সম্পর্কে অরবিন্দের মনে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। অন্য দিকে আয়ার্ল্যাণ্ডের সম্বন্ধে, সেখানকার স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে, আর সর্বোপরি আইরিশ নেতা পার্নেলের সম্বন্ধে তাঁর মনে ছিল সুগভীর শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধার স্বাক্ষর আছে ১৮৯১ সালে বীর পার্নেলের মৃত্যুতে লেখা একটি কবিতার মধ্যে। ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কেও তাঁর মনে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল বলে জানা যায়। ফরাসী বিপ্লব ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তিসংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবেই তরুণ অরবিন্দের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল আর সেই সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত করে তুলেছিল স্বদেশের স্বাধীনতা আনবার জন্য একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা। পূর্বোক্ত গুপ্ত সমিতিতে তাঁর যোগ দেবার এই ছিল প্রকৃত কারণ। অতঃপর ভারতে ফিরে তিনি যে কোন্ পথ ধরে চলবেন তা অনুমান করা আদৌ কঠিন নয়।

এইবার তিনি ভারতে ফিরবার জন্য অস্থির হলেন।

তুষারমৌলি হিমালয়, স্রোতস্বিনী গঙ্গা—এই তাঁর জন্মভূমি।

সুনীল জলধিতল থেকে উত্থিতা তাঁর স্বদেশ ভারতবর্ষ।

সেই জন্মভূমি ভারতবর্ষে দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পরে ফিরে এলেন অরবিন্দ। ফিরে এলেন তিনি য়ুরোপের জ্ঞান-গরিমায় বিভূষিত হয়ে। অগ্রজ দুজন ইংল্যাণ্ডে রয়ে

গেলেন, তিনি একাই ফিরলেন। ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এক সন্ধ্যায় নিরাপদে বোম্বাই বন্দরে পৌঁছলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী না-পাওয়া ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় স্বেচ্ছায় অকৃতকার্য অরবিন্দ ঘোষ। তাঁর জীবননাট্যের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের পরিসমাপ্তি এইখানেই।

॥ সাত ॥

একজন যুগমানব যতখানি তাঁর যুগের সৃষ্টি, তিনিও ঠিক ততখানি সেই যুগকে সৃষ্টি করে থাকেন স্বীয় চিন্তা ও কর্মের দ্বারা। সাধারণ মানুষের জীবন দিন যাপনের গ্লানির অতিরিক্ত কিছু নয়—তাদের জীবনে না থাকে বর্ণ, না থাকে বিস্তার। কিন্তু যুগমানবের জীবন থেকে আমরা তাঁর যুগের হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে পারি, কারণ তাঁর জীবন-প্রবাহ আর তাঁর যুগের প্রবাহ ঠিক সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়ে থাকে। কোন একটি জাতির জীবনে মাঝে মাঝে এমন একটা সময় আসে যখন সেই জাতির অন্তস্তল থেকে আবির্ভূত হযে থাকেন এমন এক-একজন মানুষ যাঁরা ইতিহাসের বুকে তরঙ্গ তোলেন, নিয়ে আসেন যুগান্তর। অরবিন্দ এই শ্রেণীরই একজন। তাই যুগের পটভূমিকাতেই তাঁর জীবনের গতিপথ অনুসরণ করতে হবে। যে চৌদ্দ বছর তিনি বিলাতে অতিবাহিত করলেন ছাত্র হিসাবে, সেই চৌদ্দ বছর কালের মধ্যে বাংলা তথা ভারতের নব জাগরণ কতদূর সার্থকতা লাভ করল বিভিন্ন যুগপুরুষের চিন্তা ও কর্মপ্রযাসের ভিতর দিয়ে তারই একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা এই অধ্যায়ে করব।

সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ও শিক্ষা—আমাদের জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তখন দেখা গিয়েছে একাধিক প্রতিভা এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনালোকে তখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ইতিহাসের দিগন্ত, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রচনা করেছেন নব দিগন্ত। আলো ঝলমল সেই চৌদ্দ বছরের পরিমণ্ডলের মধ্যে আমরা যাঁদের পাই তাঁদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, টিলক, বিপিনচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। অরবিন্দের বিলাত যাত্রার সময় মাইকেল জীবিত ছিলেন না। একা বঙ্কিমচন্দ্র তখন কেন্দ্রপুরুষ হিসাবে বাংলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর প্রতিভার স্বর্ণচ্ছটা বিকিরণ করে চলেছেন। অরবিন্দের জন্মবৎসরেই তো তাঁর যুগান্তকারী পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করে স্বজাতিকে স্বদেশের মর্ম ব্যাখ্যানে উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি। আর অরবিন্দের জন্মক্ষণে অর্থাৎ তিনি যখন মাতৃগর্ভে সদ্য এসেছেন তখন তাঁর মাতামহকে আমরা 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' সম্পর্কে বক্তৃতা করতে দেখি। আর অরবিন্দের বিলাত গমনের ঠিক পূর্ব বৎসরে (১৮৭৮)

বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে একটা ছোটখাটো বিস্ফোরণ দেখা গিয়েছিল কেশবচন্দ্রের অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার সঙ্গে কুচবিহারের রাজার বিবাহকে উপলক্ষ্য করে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই কুচবিহার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ পরিণতি ছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে, চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।*

এইসব বহু ও বিচিত্র ঘটনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, একটা তরঙ্গ-মুখর পরিবেশের মধ্যেই যুগমানব অরবিন্দের জীবনের উদ্ভব ও আরম্ভ। তাঁর জীবনের বিশাল পরিণতিতে সমকালীন ইতিহাস, বিশেষ করে বাংলার জীবন্ত প্রাণ-প্রবাহ কতখানি সহায়তা করেছিল এইবার আমরা সেইটা লক্ষ্য করব। তিনি বিলাত গেলেন ১৮৭৯ সালের মে মাসে। ঐ বছরের শুরুতেই সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলি' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণধন বিলাতে তাঁর পুত্রদের কাছে এই কাগজ থেকে সুরেন্দ্রনাথের গরম গরম লেখা কাটিং করে পাঠাতেন। তখনো অবশ্য 'বেঙ্গলি' দৈনিকে রূপান্তরিত হয় নি। সেদিনের ভারতের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার প্রধান মুখপত্র ছিল এই কাগজখানি। অরবিন্দের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে মডারেট-পন্থী সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলি' পত্রিকা যে কিছুটা সহায়তা না করেছিল তা নয়।

অরবিন্দের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর তখনকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম। ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইতে প্রখ্যাতনামা ব্যারিস্টার ডাব্লিউ. সি. ব্যানার্জির (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। পরে আমরা দেখতে পাব, এই কংগ্রেসের সঙ্গে অরবিন্দের সম্পর্ক কিভাবে স্থাপিত হয় এবং কেমন করেই বা তিনি এর মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন নতুন প্রাণ। অরবিন্দের এক জীবনীকার প্রশ্ন করেছেন: "নব-প্রসূত কংগ্রেস কি বালক অরবিন্দের মনে স্বদেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করিয়াছিল?" নিশ্চয়ই। কারণ, সহধর্মিণী মৃণালিনীকে লেখা অরবিন্দের একটি চিঠি থেকেই আমরা এর সমর্থন পাই। তিনি নিজেই বলেছেন: "চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল।" দেশপ্রেমের বীজ ভিন্ন এ আর কিছু হতে পারে না।

কিন্তু আমার বিবেচনায় এই দেশপ্রেমের বীজ অরবিন্দের হৃদয়ে আরো কিছু আগে থেকেই উপ্ত হয়েছে—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্তত চার বছর আগে থেকে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয় (১৮৮১)। কংগ্রেসের চেয়ে 'আনন্দমঠের' প্রভাব তাঁর উত্তরকালের জীবনের মধ্যে সমধিক পরিলক্ষিত। বাংলাদেশে ঐ একই সময়ে আরো একটি ঘটনা ঘটেছিল—ঐ বছরেই কোন একদিন

* লেখকের 'কেশবচন্দ্র' ও 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সংশয়বাদী নরেন্দ্রনাথ দত্ত দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। অরবিন্দের বয়স তখন দশ বছর আর তখন তিনি বিলাতে ড্রুয়েট পরিবারের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখছেন। দক্ষিণেশ্বরের ঘটনার সংবাদ হয়ত তাঁর কাছে তখন গিয়ে পৌঁছয় নি, কিন্তু 'আনন্দমঠের' বার্তা তাঁর কাছে পৌঁছেছিল তখন। এই 'আনন্দমঠ' বাঙালি তথা ভারতবাসীর অন্তরে দেশাত্মবোধকে কিভাবে স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তার আলোচনা উত্তরকালে অরবিন্দ নিজেই বহুবার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি তাঁর দেশাত্মবোধের প্রধান গুরু বলে স্বীকার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বা তাঁর 'আনন্দমঠ' না থাকলে বিপ্লবী অরবিন্দকে আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ।

১৮৮৬ সালের ১৬ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের তিরোভাব সমকালীন বাংলার একটি স্মরণীয় ঘটনা। অরবিন্দের জীবনে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষে রামকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য জীবন ও ততোধিক অলৌকিক সাধনার প্রভাব কতখানি তা তিনি স্পষ্টত বলেন নি বটে। তবে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর উক্তিগুলি বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র যদি তাঁর মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে থাকেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক জীবন তেমনি তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনাকে প্রদীপ্ত করে থাকবে। এই বিষয়ে আমরা যথাস্থানে বিশদ আলোচনা করব। তবে বিলাতে তাঁর ছাত্রজীবনে আইরিশ জাতীয় দলের মুক্তিসংগ্রাম ও সেই সঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তি আন্দোলনের নেতা পার্নেলের দেশপ্রেম ঐ সময়ে তাঁর মনে তীব্র দেশপ্রেমের সঞ্চার করেছিল। ১৮৮৯ সালে বিলাতে পার্লামেণ্টে এদেশের ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে আলোচনা হবার কথা ছিল। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেই আলোচনার তদারকি করতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল বিলাতে আসেন। এই দলের মধ্যে ছিলেন, উমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, মনোমোহন ঘোষ, ফিরোজ শা মেহতা প্রভৃতি আটজন। এঁদের মধ্যে মনোমোহন ঘোষ অরবিন্দের পিতৃবন্ধু। তিনি যখনি বিলাতে আসতেন বন্ধু-পুত্রদের খোঁজখবর করতেন। এবারও করেছিলেন। অরবিন্দের বয়স তখন সতেরো বছর; তাই অনুমান হয়, কংগ্রেস থেকে এতগুলি প্রতিনিধির একত্রে লণ্ডন আগমন, লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্র-সমাজে একটা উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল নিশ্চয়ই। সেই উত্তেজনার স্পর্শ অরবিন্দও যে কিছুটা পেয়ে থাকবেন, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। ১৮৯১ সালের প্রসিদ্ধ ঘটনা বিদ্যাসাগরের মৃত্যু।

"বিদ্যাসাগরের মৃত্যুসংবাদ বিলাতের বাঙালি ছাত্রমহলে নিশ্চয়ই গিয়া পৌঁছিয়াছিল, অরবিন্দ নিশ্চয়ই এ সংবাদ শুনিয়া থাকিবেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, 'বিধাতা যখন সাতকোটি বাঙালি তৈরি করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভুলিয়া

একজন মানুষ তৈরি করিয়া ফেলিলেন।' রাজা রামমোহনের পরে এতবড় পুরুষসিংহ আর দেখা যায় না।"* বিদ্যাসাগরের প্রভাব অরবিন্দের জীবনে কতটুকু ছিল, বা আদৌ ছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তবে প্রত্যক্ষে হোক বা পরোক্ষে হোক, এইসব ঘটনা যে তাঁর চরিত্র বিকাশে ও মানস-গঠনে সহায়তা করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনিই বিদ্যাসাগরকে তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার জন্য বাংলার 'ছত্রপতি' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন।

পিতা আই. এম. এস।

পুত্র আই. সি. এস হলে কৃষ্ণধন চরিতার্থ হতেন।

কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে থেকে বিধাতা তার চিহ্নিত মানুষদের জীবনের ছক কেটে রাখেন। তাই বুঝি দেখা যায় যে, অনেক পিতামাতার জীবনে তাঁদের সন্তান সম্পর্কে পোষিত আকাঙ্খা খুব কমই চরিতার্থ হতে দেখা যায়। চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ ও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ভুবনমোহন, কৃষ্ণধন ও জানকীনাথ যে আশা পোষণ করেছিলেন তা পূর্ণ হয় নি। তা যদি হতো, ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ অন্য খাতে বইত। কিন্তু এই তিনজনের জীবনে একটা অলক্ষ্য বিধান কাজ করে গিয়েছে, নইলে দেশের কাজে এঁদের আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কেও সেই একই কথা। তিনি যদি সার্ভিসে থাকতেন, এবং ঐভাবে পদচ্যুত না হতেন তাহলে অমন বজ্র-আবাবে দেশকে জাগ্রত করে তুলত কে? অরবিন্দ যদি সার্ভিসের সোনার খাঁচায় বন্দী হতেন তাহলে কি আমরা দেশাত্মবোধের কবি, বা জাতীয়তা-বাদের অগ্রদূত অরবিন্দকে পেতাম, না দিব্যজীবনের দিশারী ও পূর্ণযোগের প্রবক্তা যুগমানব শ্রীঅরবিন্দকে পেতাম? তাঁর ছাত্রজীবনের এই পর্বটি সম্পর্কে তাই পরিষ্কারভাবে আরো একটু বলার আছে।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সব কয়টি টার্মিন্যাল তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, এ কথা আগেই উল্লিখিত আছে। কিন্তু আগে থেকেই তিনি মনস্থির করেছিলেন যে কিছুতেই তিনি সার্ভিসে প্রবিষ্ট হবেন না। তখন থেকই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের ছক ঠিক করে ফেলেছিলেন—স্বজাতিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করবেন স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে। সেইজন্যই বুঝি ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষার দিন ইচ্ছা করেই অনুপস্থিত ছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁর এক জীবনীকার একটি অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন: "কথিত আছে যে, শেষ মুহূর্তে একটি অতি-প্রাকৃত শক্তি তাঁকে বাধা দিয়েছিল যার জন্য চেষ্টা করেও তিনি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি এবং নির্ধারিত সময়ে ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় উপস্থিত থাকতে

*শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশীযুগ: গিরিজাশঙ্কর।

পারেন নি। কে যেন তাঁর পা দু'টি জোর করে টেনে ধরেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে যাঁদের এইরকম অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা এটা সত্য বলে গ্রহণ করবেন আর যাঁরা তা করবেন না তাঁরা আমাদের সঙ্গে একমত হবেন যে, ইহা বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ যদি অরবিন্দ পরীক্ষায় পাশ করতেন আমরা চিরকালের জন্য ভারতের মুক্তি সংগ্রামের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা ও বিপ্লবীর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হতাম।"* এই মন্তব্যটির সঙ্গে আমরাও সম্পূর্ণ একমত। জন্ম থেকে মহাপ্রয়াণের দিন পর্যন্ত এই যুগমানবের জীবনের প্রত্যেকটি অধ্যায়ে অতিপ্রাকৃতশক্তির লীলা বিশেষভাবেই লক্ষ্যণীয়। তা নইলে অরবিন্দ শ্রীঅরবিন্দ হতেন না।

এখন দেখা যাক ঐ বছরের অর্থাৎ ১৮৯২ সালের সিভিল সার্ভিস কমিশনের রিপোর্ট এ বিষয়ে কি সাক্ষ্য দেয়। উক্ত রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রথম দিন ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন ও দুদিন পরে একটা ডাক্তারি সার্টিফিকেট দাখিল করেন। তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হয় কবে তাঁর সুবিধা হবে ; তিনি তার কোন উত্তর দেন নি। আরো দুবার তাঁকে ঐ মর্মে চিঠি লেখা হয়েছিল এবং তৃতীয় পত্রের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন যে অমুক তারিখে তিনি উপস্থিত থাকবেন। তখন আর একটি দিন ধার্য হলো কিন্তু অরবিন্দ ঘোষ আবার অনুপস্থিত হলেন। এইভাবে দেখা যায় যে, আগস্ট মাসের ৯ তারিখ থেকে নভেম্বরের ১২ তারিখ পর্যন্ত অরবিন্দকে ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেওয়া হয় এবং প্রত্যেকবারই কোন না কোন অছিলায় তিনি অনুপস্থিত থাকেন। তখন তাঁকে সার্ভিসে অনুত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়।

এই চাঞ্চল্যকর অশ্বারোহণ পরীক্ষা পর্বের আরো একটু ইতিহাস আছে। তাঁর জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে অরবিন্দের গুণমুগ্ধ দুজন ভারতপ্রেমিক ইংরেজ দরবার করেছিলেন তাঁকে সার্ভিসে গ্রহণ করার জন্য, কারণ তিনি তো সব কটি টার্মিন্যাল কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন জেম্‌স্ কটন, অপরজন কেমব্রিজের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জি. এম. প্রথেরো। জেম্‌স কটন ছিলেন প্রখ্যাত সিভিলিয়ান্ স্যর হেন্‌রি কটনের ভাই। ভারতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসের সঙ্গে হেন্‌রি কটনের নাম জড়িত আছে। অরবিন্দের মাতামহের ইনি বিশেষ বন্ধুও ছিলেন। কিন্তু অরবিন্দকে সার্ভিসে গ্রহণ করার ব্যাপারে এঁরা যখন উদ্যোগী হলেন তখন সার্ভিস কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁকে না-নেওয়া সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রথেরো অরবিন্দের প্রশংসা করে কর্তৃপক্ষের কাছে যে পত্রখানি লিখেছিলেন সেটি বিলাতে অরবিন্দের দেদীপ্যমান ছাত্রজীবনের উপর অনেকখানি আলোকসম্পাত করে। পত্রখানির কিছু অংশ তাই এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

* লাইফ-ওয়ার্ক অব অরবিন্দ : জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।

"অশ্বারোহণের পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকার দরুণ মিস্টার ঘোষকে আই. সি. এস পরীক্ষায় পাশ করতে দেওয়া হয়নি শুনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। কিংস কলেজে যে দুটি বছর তিনি অতিবাহিত করেছেন, আচারে-ব্যবহারে তিনি সব সময় সমস্ত ছাত্রদের সামনে মহান এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন। আই. সি. এস পরীক্ষার প্রথমাংশে যোগদানের পূর্বেই তিনি প্রাচীন সাহিত্যের এক প্রতিযোগিতায় একটি ফাউণ্ডেশন বৃত্তি লাভ করেছিলেন। অর্থের প্রয়োজন থাকায় তিনি এই বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তাঁকে নির্বাচিত প্রার্থীরূপে স্বীকার করা হলে পর বৃত্তির নিয়মানুসারে তিনি প্রাচীন সাহিত্যের গবেষণাতেই অনেকখানি সময় অতিবাহিত করতে বাধ্য হন—ফলে তাঁর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার পড়াশুনার বেশ কিছুটা ক্ষতি হয়। কলেজের পক্ষ থেকে বলতে পারি যে দুরূহ এই গবেষণায় তিনি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হন এবং ক্লাসিকাল ট্রাইপসের প্রথম শ্রেণীর এক কৃতিত্বপূর্ণ বিভাগে স্থান পান—এখানে তাঁর দ্বিতীয় বৎসর অতিবাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে। ইংরেজি ভাষার উপরে তাঁর দুর্লভ অধিকার এবং অসামান্য সাহিত্য-প্রতিভার দরুণ কলেজের অন্যান্য অসংখ্য পুরস্কারও তিনি লাভ করেন। যে ব্যক্তি এমন অসাধ্য সাধন করতে পারেন (যা করতে যে-কোন আণ্ডার-গ্রাজুয়েটই রীতিমত হিম সিম খেয়ে যাবেন) এবং সেই সঙ্গে সিভিল সার্ভিসের পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারেন—তাঁর শ্রমক্ষমতা এবং যোগ্যতা যে অসাধারণ তা না মেনে উপায় নেই। ক্লাসিকাল বৃত্তিগুলি ছাড়াও ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান যে-কোন সহপাঠীর চেয়ে শতগুণে গভীর। তাঁর অনবদ্য ইংরেজি রচনাশৈলী যে-কোন ইংরেজ যুবককে লজ্জা দেবে। এমন একজন প্রতিভাবানকে ভারতের শাসন কার্যে না-নেওয়াটা (নিছক ঘোড়ায় সওয়ার না-হওয়াটই যাঁর একমাত্র অপরাধ।) বাধ্য হয়েই স্বীকার করছি, সরকারি দূরদর্শিতার শোচনীয় অভাবের লক্ষণ।

"ঘোষ শুধুমাত্র সক্ষমই নন, দুর্লভচরিত্র বটে। গত দু-বছর অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে তিনি দিন কাটিয়েছেন। দেশ থেকে তাঁর ভরণপোষণের প্রতিশ্রুত অর্থ প্রায় একেবারেই আসে নি; তা সত্ত্বেও তিনি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে দুই অগ্রজের এবং নিজেরও ব্যবস্থা নিজেই করে এসেছেন—তাঁর নির্জীব সহিষ্ণু স্বভাবে সামান্য বিকারও জাগে নি তবু।...হলফ করে বলতে পারি, সামান্যতম অসংযমও নেই ঘোষের চরিত্রে, যা থেকে তাঁর এই অর্থাভাবের উদ্ভব হতে পারে। তাঁর জীবনযাত্রা এর জলন্ত দৃষ্টান্ত; সাদাসিধে কৃচ্ছ্রব্রতীর জীবন তিনি যাপন করেন। সম্ভবত অর্থাভাবের জন্যই তিনি ঘোড়ায় চড়ার পিছনে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পারেন নি।...এমন যোগ্যতা-সম্পন্ন প্রতিভাবান একজন হিন্দু ছাত্রকে তুচ্ছ এক কারণে যদি ফেল করানো হয়—আইনত তা যতই শ্রেয় হোক, নীতিগতভাবে তা অন্যায় বলেই প্রমাণিত হবে।"*

* সমসাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ : পৃথ্বীন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কিন্তু প্রথেরো বা কটন সাহেব আদৌ জানতেন না যে, সরকার দপ্তরে তখন অরবিন্দ সম্পর্কে বিরুদ্ধ রিপোর্ট এসে গিয়েছে—ভারতীয় ছাত্রদের মজলিশে তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের কথা জানা হয়ে গিয়েছে। ভারত সচিব আর্ল কিম্বার্লি পূর্বাহ্নেই এক পত্রে তাঁর অক্ষমতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন: "আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে মিস্টার ঘোষকে গ্রহণ করা খুব বাঞ্ছনীয় হবে কিনা।" অমন দুজন প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তির ওকালতি যখন নিষ্ফল হলো, তখন দেখা গেল ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে অরবিন্দকে দেড়শো পাউণ্ডের একটি এলাউয়েন্স দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হয় এবং সেটি নির্ধারিতও হয়। অরবিন্দ অবশ্য ইংরেজ সরকারের এই দাক্ষিণ্য গ্রহণ করেন নি।

আগেই বলেছি জেমস কটন অরবিন্দের গুণমুগ্ধ ছিলেন।

যখন তাঁদের প্রয়াস নিষ্ফল হলো, তখন কটন সাহেব খুবই উদ্বিগ্ন হলেন অরবিন্দের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। কিন্তু বিন্দুমাত্র উদ্বেগ ছিল না অরবিন্দের নিজের। সেই বয়স থেকেই দেখা যায় যে তিনি যেন নিজেকে ভগবানের হাতে যন্ত্র হিসাবে সমর্পণ করে গিয়েছেন। আশৈশব তাঁর সমগ্র সত্তা যেন এই লক্ষণের দ্বারাই চিহ্নিত ছিল। তা নইলে শেষের দিকে অমন অর্থকষ্ট ও কৃচ্ছ্রতার ভিতর থেকেও তিনি কি অধ্যয়নে অখণ্ড মনঃসংযোগ করতে পারতেন? প্রথেরো মিথ্যা বলেন নি, অরবিন্দ দুর্লভ চরিত্রের মানুষ। দুর্লভ এবং দুরধিগম্য। যাই হোক, কটন সাহেব তখন চিন্তা করতে লাগলেন কেমন করে অরবিন্দকে একটা ভাল চাকরি সংগ্রহ করে দেওয়া যায়। দৈবক্রমে সেই সময় ভারতের অন্যতম সামন্ত নৃপতি বরোদার গায়কোয়াড় মহারাজা শুর সয়াজিরাও ইংল্যাণ্ড পরিদর্শনে লণ্ডনে উপস্থিত হয়েছেন। দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে বরোদার মহারাজার বিশেষ খ্যাতি ছিল। নিজে তিনি শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী মানুষ ছিলেন। রাজ্যের উন্নতির জন্য খুব সতর্কতার সঙ্গে যোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করতেন। সম্ভবত এই কারণেই বরোদা তখন ভারতের মধ্যে একটি উন্নতিশীল দেশীয় রাজ্য বলে গণ্য হয়েছিল। এই সয়াজিরাওই সেদিন তাঁর রাজ্যের উন্নতির জন্য বাংলার দুটি রত্নকে তাঁর রাজ্যের সবচেয়ে দায়িত্বজনক পদে আমন্ত্রণ করে এনে বসিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত, অপরজন অরবিন্দ।

সয়াজিরাও যখন কটন সাহেবের কাছ থেকে অরবিন্দের বিষয় সব জানতে পারলেন এবং আরো জানতে পারলেন যে অরবিন্দ একটি ভাল চাকরির চেষ্টা করছেন, তখন একদিন উভয়ের মধ্যে একটি সাক্ষাৎকার হয়। মুগ্ধ হলেন সয়াজিরাও অরবিন্দের সঙ্গে কথা বলে ও তাঁকে দেখে। এমন একজন প্রতিভাবান মানুষকে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা, তাঁর মন বলল। স্বল্পভাষী অরবিন্দও মহারাজার

সঙ্গে কথা বলে খুশি হলেন। দরকার কি অন্য কারো অধীনে চাকার করার, এঁরই সঙ্গে থাকি—অরবিন্দের মনও বলল এই কথা। অতঃপর মহারাজার অনুরোধে অরবিন্দ বরোদার স্টেট সার্ভিসে চাকরি গ্রহণ করলেন। এই ঘটনা ১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। আমরা অনুমান করতে পারি, মাসিক মাত্র দুই শত টাকা বেতনে কেমব্রিজের একজন ট্রাইপস্ ও আই. সি. এস-কে তাঁর রাজ্যের জন্য সংগ্রহ করতে পেরে বরোদার মহারাজা নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিলেন। বরোদা রাজ্যের চাকরি নিয়ে ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অরবিন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর এই কৃতী পুত্রের প্রত্যাগমন স্বচক্ষে দেখবার জন্য পিতা কৃষ্ণধন তখন কিন্তু জীবিত ছিলেন না।

অরবিন্দের জীবনের এই শোচনীয় ঘটনাটির বিবরণ সংক্ষেপে এই।

দেশে ফিরবার আগেই ডাক্তার কৃষ্ণধন তাঁর শ্যালকের কাছে তাঁর প্রিয়তম পুত্র অরবিন্দের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত ভাষায় সুদীর্ঘ একটি চিঠি লেখেন, সে কথা আগেই বলেছি। সেই পত্র পাঠে জানা যায় তাঁর 'অরো' সম্বন্ধে তিনি কি রকম প্রত্যাশা রাখতেন আর তার সম্বন্ধে কি রকম গর্ব অনুভব করতেন। সেই ছেলে দেশে ফিরছে, তার আগমন পথ চেয়ে থাকা পিতার পক্ষে স্বাভাবিক। তাই বরোদার মহারাজার সঙ্গে কোন্ জাহাজে তিনি ভারতে ফিরছেন সেই খবরটা পূর্বাহ্ণেই অরবিন্দ টেলিগ্রাম করে কৃষ্ণধনকে জানিয়ে থাকবেন। কৃষ্ণধন তখন কলকাতার গোমেস লেনের একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তখন তাঁর নিঃসঙ্গ ও অবসরপ্রাপ্ত জীবন। কাছে আছে শুধু কন্যা সরোজিনী আর কনিষ্ঠ পুত্র বারীন্দ্র। 'অরো' আসছে, এই সংবাদ স্নেহময় পিতা জানালেন তাঁর বন্ধুদের। জাহাজ কবে এসে পৌঁছবে? কলকাতায়, না বোম্বাই বন্দরে? এইসব তিনি আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন তাঁর ব্যাঙ্কার গ্রিন্‌লে য়্যাণ্ড সন্স কোম্পানির কাছে। পুত্রের কৈশোরোত্তীর্ণ, জ্ঞান-গরিমাভূষিত মূর্তিটি দেখবার জন্য কৃষ্ণধনের হৃদয়ে সে কী আকুলতা!

এমনি অধীর আগ্রহ নিয়ে পুত্রের আগমন পথ চেয়ে কৃষ্ণধন যখন দিন গুণছিলেন, এমন সময় একদিন তাঁর ব্যাঙ্কার এক চিঠি লিখে তাঁকে জানালেন যে, তাঁর ছেলে যে জাহাজে উঠে দেশে ফিরছিল, সেই জাহাজটি লিসবনের উপকূলে হঠাৎ ডুবে গেছে। বজ্রাঘাতের মতোই এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ বিদ্ধ করল বৃদ্ধ কৃষ্ণধনের হৃদয়। বারংবার প্রিয়তম পুত্র অরবিন্দের নাম উচ্চারণ করতে করতে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই ছিল যে নির্দিষ্ট জাহাজে না এসে পরবর্তী 'কার্থেজ' জাহাজে রওনা হয়ে ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিরাপদেই বোম্বাই এসে পৌঁছলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রিন্‌লে কোম্পানীর

কলকাতার অফিসে 'কার্থেজ' জাহাজে অরবিন্দের রওনা হওয়ার সংবাদটি সময়মত এসে পৌঁছয় নি। নিয়তির নির্মম পরিহাস মানুষের জীবনে বুঝি এইভাবেই ঘটে থাকে। কী প্রচণ্ড বেদনাই না বুকে নিয়ে অরবিন্দের সেই পরদুঃখকাতর স্নেহার্দ্রহৃদয় ও তেজস্বী পিতা দেহত্যাগ করলেন।

॥ আট ॥

১৮৯৩। ফেব্রুয়ারি মাস।

অরবিন্দের বিচিত্র জীবন-নাট্যের তৃতীয় অঙ্ক শুরু হবে এইবার।

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৮৯৩ একটি স্মরণীয় বৎসর।

অরবিন্দ ফিরছেন ভারতবর্ষে চৌদ্দ বছর পরে। এই বছরেই অদ্বৈত-বেদান্তের বাণী কণ্ঠে নিয়ে তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ গেলেন আমেরিকায় আর পোরবন্দরের এক তরুণ ব্যারিস্টার, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভাগ্যান্বেষণে। পরবর্তীকালে এই তিনজন ভারত-সন্তানই ভারতের রাজনীতি ও অধ্যাত্মজীবনে কী প্রচণ্ড তরঙ্গ তুলেছিলেন, সেই ইতিহাস অল্প-বিস্তর অনেকেরই জানা আছে—যদিও এঁরা কখনো পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে একত্রে মিলিত হবার সুযোগ পান নি। অরবিন্দের জীবনে বিবেকানন্দ অনেকখানি স্থান জুড়ে আছেন। তাই তাঁর জীবনের সঙ্গে বিবেকানন্দের জীবনকেও একটু মিলিয়ে দেখতে হবে। যথাস্থানেই আমরা এ-বিষয়ে আলোচনা করব। এই বছরেই ভারতবর্ষে আসেন য়্যানি বেসান্ত যিনি পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এখন অরবিন্দের কথাই বলি।

তাঁর বরোদা-জীবন এক মহাপ্রস্তুতির যুগ।

তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের এই পর্বটাও চৌদ্দ বছরের ঘটনাবলীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এইসব ঘটনার অনুধাবন ও বিশ্লেষণ এবং তাৎপর্য গ্রহণ বিশেষ সতর্কতার সঙ্গেই করতে হবে। মনে রাখতে হবে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাল ইংল্যাণ্ডে অতিবাহিত করে এইবার অরবিন্দ এক নতুন অভিজ্ঞতার জগতে প্রবেশ করছেন। ওদেশে থাকবার সময়ে যদি তিনি আহরণ করে থাকেন পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে অপূর্ব রত্নরাজি, এইবার নিজের জন্মভূমি ভারতবর্ষে এসে প্রাচ্যের অনাদি অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রে তাঁকে একমনে নিমগ্ন থাকতে দেখব আমরা। যে অতন্দ্র অধ্যয়ন-তপস্যার মধ্যে বিলাতে কাটিয়েছেন চৌদ্দ বছর, এখানেও সেই একই দীর্ঘ সময় ঠিক সেই একই ভাবে তাঁকে আমরা অতিবাহিত করতে দেখব। বোম্বাইয়ের অ্যাপোলো বন্দরে পদার্পণ করার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর স্বদেশ যেন অরবিন্দকে নিজের ক্রোড়ে বরণ করে নিলো। কী যে একটা অপূর্ব প্রশান্তির ভাব সেই মুহূর্তে তাঁর মনের মধ্যে জেগেছিল তা শুধু অনুভবের

বিষয়। মাতৃভাষার সঙ্গে সম্পর্কহীন, স্বদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন সাত বছরের এক বালক বিলাতে অধ্যয়ন করতে গেলেন, থাকলেন চৌদ্দ বছর সেখানে ভিক্টোরীয় যুগের মধ্যভাগের সেই বিচিত্র প্রাণ-চঞ্চল পরিবেশের মধ্যে। তবু তিনি মুগ্ধ হলেন না লাস্যময়ী পাশ্চাত্যের মোহে, অথবা আকৃষ্ট হলেন না ওদেশের চাকচিক্যময় সভ্যতায়। ভারতের অরবিন্দ ভারতীয় ধ্যান-ধারণা নিয়েই ফিরলেন। বাঙালি অরবিন্দ বাঙালি হয়েই ফিরলেন। এটা বড়ো কম শ্লাঘার বিষয় নয়।

ইংল্যাণ্ডে তাঁর ছাত্রজীবন সম্পর্কে যেমন, এখানে তেমনি অরবিন্দের বরোদা-জীবন সম্পর্কে অনেকে অনেক রকম আজগুবি কথা বলেছেন। সেগুলির সত্য-মিথ্যা, এই সুদূর কালের ব্যবধানে, যাচাই করা কঠিন। তাই প্রথমে আমরা তাঁর নিজস্ব বক্তব্যকেই অনুসরণ করব। তিনি লিখেছেন: "বরোদায় প্রথমে আমি কিছুকাল সেট্‌লমেণ্ট বিভাগে কাজ করি, পরে স্বল্পদিনের জন্য স্ট্যাম্প অফিসে। তারপর সেণ্ট্রাল রেভিনিউ অফিসে ও সেক্রেটেরিয়েটে। তখনো আমি কলেজের কাজে যোগদান করি নি এবং অন্য কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে কলেজে ফরাসী ভাষার লেকচারার পদে নিযুক্ত হয়েছিলাম। অবশেষে আমার নিজের অনুরোধক্রমেই আমি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক নিযুক্ত হই। এই সময়ের মধ্যে মহারাজার ব্যক্তিগত কাজ, যেমন চিঠিপত্র ইত্যাদি লেখা, আমাকে করতে হতো। সময় সময় তাঁর বক্তৃতাও লিখে দিতাম। এ ছাড়া তাঁর সাহিত্যকর্মে বা শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁকে সহায়তা করতাম। এর অনেক পরে আমি কলেজের সহ-অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হই এবং কিছুকাল অস্থায়ীভাবে অধ্যক্ষের দায়িত্বও বহন করেছি। মহারাজার ব্যক্তিগত কাজগুলির অধিকাংশই আমি বেসরকারিভাবে সম্পাদন করতাম। প্রাতরাশের সময় মহারাজা প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন এবং তখন আমি প্রাসাদে তাঁর খাস-কামরায় বসে তাঁর ব্যক্তিগত কাজগুলি সম্পন্ন করতাম।

"আমি কখনো তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করি নি বা ঐ রকম কোন পদে আমি নিযুক্তও হই নি। সেট্‌লমেণ্ট বিভাগে আমি কোন অফিসারের পদে নিযুক্ত হইনি; স্ট্যাম্প ও রাজস্ববিভাগেও নয়। মহারাজার ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও বক্তৃতা ছাড়া বিভিন্ন প্রকারের দলিলপত্র মুসাবিদা করার কাজেও আমি তাঁকে সহায়তা করতাম। এইসব দলিলের ভাষাগত দিকটাই আমি বিশেষভাবে দেখে দিতাম। এসবই ছিল বেসরকারী। প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসাবে কোন নিয়োগপত্রও আমাকে কখনো দেওয়া হয় নি। একবার শুধু তাঁর কাশ্মীর-ভ্রমণের সময়ে মহারাজা আমাকে সেক্রেটারি হিসাবে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ ভ্রমণপর্বের সময়ে

আমাদের উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সংঘর্ষ হয় এবং ভবিষ্যতে আমি আর কখনো মহারাজার ভ্রমণের-সঙ্গী হই নি।”

এখানে প্রসঙ্গত বরোদা ও সয়াজিরাও গায়কোয়াড সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। গুজরাটের অন্তর্গত এই দেশীয় রাজ্যটির রাজধানী বরোদা। আয়তনে অবশ্য রাজ্যটি খুব বড়ো নয়, তবে বরোদা অতি সুদৃশ্য শহর। একজন প্রগতিশীল ও শিক্ষিত নৃপতি হিসাবে সয়াজির বিশেষ খ্যাতি ছিল। প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনের দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল এবং যদিও সেটা গণতন্ত্রের যুগ ছিল না তথাপি বরোদা ও ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ চিন্তার দিক দিয়ে যথেষ্ট আধুনিক মনোভাবের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। তবে তাঁদের সার্বভৌমত্ব ছিল খুবই সীমিত। তখন প্রত্যেকটি দেশীয় রাজ্যেই ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে তদারকি করবার জন্য একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ সিভিলিয়ান থাকতেন। এঁকে বলা হতো রেসিডেণ্ট। রেসিডেণ্টকে মন রেখেই রাজাদের চলতে হতো। এমন হাত-পা বাঁধা অবস্থার মধ্যে কোন কোন করদনৃপতি প্রজাদের উন্নতির কথা চিন্তা করতেন ও তাদের সুখে রাখবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াসও পেতেন। বরদা ছিল এমনি একটি রাজ্য ও এর মহারাজা ছিলেন এমনি একজন উন্নতমনা ও প্রজা-দরদী নৃপতি। নিজে তিনি শিক্ষিত ছিলেন ও বহু দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। তাই রাজ্যের প্রজাদের সুশাসনে রেখে শিক্ষিত করে তোলার দিকে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। তাঁর সময়েই বরোদা রাজ্যে বহুবিধ সংস্কার সাধিত হয়, বিশেষ করে ভূমি-সংস্কার এবং এই ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্ব ছিল আর একজন বাঙালি সন্তানের। তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত।

সেযুগে ব্রিটিশ ভারতে ইনি ছিলেন সিভিল সার্ভিসের একজন স্তম্ভস্বরূপ এবং সুদক্ষ শাসক। তাই সয়াজিরাওর দৃষ্টি ছিল এঁর উপর। রমেশচন্দ্রকে তিনি প্রথমে তাঁর রাজ্যের রাজস্ব সচিব ও পরে প্রধান অমাত্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ইনি ১৯০৪ সালে বরোদা রাজ্যের রাজস্ব সচিবের পদে নিযুক্ত হন। অরবিন্দের পিতা ছিলেন রমেশচন্দ্রের বন্ধু। সেই সূত্রে বন্ধুপুত্র হিসাবে তিনি অরবিন্দকে যেমন স্নেহ করতেন, তেমনি তিনি ছিলেন তাঁর প্রতিভামুগ্ধ। অরবিন্দও রমেশচন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ১৯০৯ সালে বরোদায় রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ‘কর্মযোগিন্’ পত্রিকায় রমেশচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে অরবিন্দ-রচিত শ্রদ্ধাঞ্জলিটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই স্মর্তব্য। সেই অনুপম রচনাটির উপসংহারে অরবিন্দ লিখেছিলেন, “রমেশচন্দ্র শুধু ব্রিটিশ শাসিত ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসই রচনা করেননি, এই ক্ষেত্রে তিনি সত্যিই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।” এই রমেশচন্দ্রের আমলে বরোদা রাজ্যের কি রকম উন্নতি সাধিত হয়েছিল তার উল্লেখ করেছেন লর্ড মিণ্টো। ১৯০৪ থেকে ১৯০৯-এর নভেম্বর মাস পর্যন্ত রমেশ-প্রতিভা এই

দেশীয় রাজ্যটির সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে নিয়োজিত ছিল এবং এইখানেই তার মৃত্যু হয়।*

কর্মস্থল বরোদা অরবিন্দের দ্বিতীয় তপস্যাক্ষেত্র।

ইংল্যাণ্ডে যে তপস্যার সূত্রপাত, এখানে তারই পরিণতি।

সেই নিরলস ও একাগ্রচিত্ত অধ্যয়ন-তপস্যা।

বরোদার মনোরম পরিবেশের মধ্যে তাঁর জ্ঞান-তপস্যার বিরাম ছিল না।

ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্য সাধনা—এই দুটি বিষয়েই তিনি বেশি মন দিলেন এবার। য়ুরোপের কয়েকটি ভাষা যিনি আয়ত্ত করেছেন তাঁর পক্ষে ভারতীয় ভাষা আয়ত্ত করা বিশেষ কঠিন ছিল না। বাংলাদেশ থেকে তাঁর মাতুল যোগীন্দ্রনাথ বসু ভাগিনেয়কে বাংলা ভাষায় রপ্ত করে তোলার জন্য পাঠিয়েছিলেন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে। নাম তাঁর দীনেন্দ্রকুমার রায়। বিলাতে থাকবার সময় অরবিন্দ বাংলা যে একেবারেই জানতেন না অথবা তখনো পর্যন্ত তাঁর বাংলা অক্ষর পরিচয় হয় নি, তা নয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজের উক্তি এই :

"আমার বাংলা শেখা সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে যে, শিক্ষক নিযুক্ত হওয়ার আগেই আমি ঐ ভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলাম। বিলাতে যখন ছিলাম, সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাংলা একটি বিষয় বলে গণ্য হতো না। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রোবেশনার হিসাবে আমি যখন বাংলাদেশকে নির্বাচন করি তখনি আমি বাংলা শিখতে আরম্ভ করি। তবে কোর্সটা ছিল খুবই সামান্য রকমের আর আমার শিক্ষক ছিলেন বাংলাদেশেরই একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ জজ। এই ভাষায় তিনি আদৌ পারঙ্গম ছিলেন না। তবে যেটুকু শিখেছিলাম, তা কয়েকটি শব্দ শেখার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তারপর বরোদায় এসে আমার নিজের চেষ্টাতেই বাংলা শিখি। বঙ্কিমের উপন্যাস ও মধুসূদনের কবিতা বুঝতে পারতাম। পরে ঐভাষায় রচনা করার শক্তিও অর্জন করেছিলাম। তবে একথা সত্যি যে, ইংরেজি ভাষায় আমার যে দক্ষতা ছিল আমার মাতৃভাষা সম্পর্কে অনুরূপ দক্ষতা আমার কোনদিনই হয় নি এবং সেই কারণে আমি কখনো বাংলায় বক্তৃতা করতে সাহসী হই নি।"

অনেকেই লিখেছেন যে অরবিন্দ বাংলা শিখেছিলেন দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কাছ থেকে। এ কথাও যে পুরোপুরি ঠিক নয় তা আমরা অরবিন্দের নিজের কথাতেই জানতে পারি। তিনি বলেছেন : "না, বাংলা শেখার জন্য দীনেন্দ্রকুমার রায়ের নিকট হতে আমি কখনো নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করি নি। তিনি আমার একজন

* লেখকের 'রমেশচন্দ্র' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সঙ্গী হিসাবেই এখানে অবস্থান করতেন ; নিয়মিত পাঠও আমি তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করি নি। বরং তাঁর কাজ ছিল বাংলাভাষা সম্পর্কে আমার যেটুকু জ্ঞান ছিল তাকে সম্পূর্ণ করে তোলা ও সংশোধন করে দেওয়া। নিয়মিত পাঠ গ্রহণ অপেক্ষা মুখে মুখে বাংলা বলার অভ্যাসটা তাঁর সাহায্যেই রপ্ত হয়েছিল বলা যায়। সংস্কৃত শেখাবার জন্য কোন শিক্ষক বরোদায় ছিলেন না।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা শেখা বলতে ঠিক যা বুঝায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কাছ থেকে অরবিন্দ তা শেখেন নি। তবে তাঁর বরোদা-জীবনের একটি নিখুঁত চিত্র আছে দীনেন্দ্রকুমার-রচিত 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' বইটিতে। অরবিন্দের বরোদা আগমনের পাঁচ বছর পরে তাঁকে বাংলা ভাষায় রপ্ত করে তোলার জন্য তাঁর সঙ্গী হিসাবে দীনেন্দ্রবাবু এখানে আসেন। অরবিন্দকে সেদিন বাঙালি-সমাজে পরিচিত করে দেওয়ার জন্য 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' বইটি খুবই সহায়তা করেছিল, বলা যায়। তাঁর এই রচনাটি যখন ধারাবাহিকভাবে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন তাঁর স্বজাতির কাছে অরবিন্দ পরিচিত হয়ে উঠলেন—তার আগে পর্যন্ত আত্মীয়-স্বজনের বাইরে তাঁর নাম কেউ বড়ো একটা জানত না। দীনেন্দ্রবাবু লিখছেন :

"অরবিন্দ আবাল্য ইংলণ্ডপ্রবাসী, পাঁচ ছয় বৎসর হইতে যৌবনারম্ভের পর পর্যন্ত বিলাতেই ছিলেন ; এজন্য মাতৃভাষা শিক্ষার তেমন সুযোগ পান নাই। বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ থাকায় ভাল করিয়া বাংলা শিখিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল। যিনি ইউরোপের নানা ভাষায় সুপণ্ডিত, তিনি মাতৃভাষায় একখানি চিঠি পর্যন্ত লিখিতে পারেন না, এমন কি বাঙালির মতো বাংলা কথা বলিতে পারেন না, ইহা বোধ হয় তিনি অমার্জনীয় ত্রুটি মনে করিতেন। ...অরবিন্দকে বাংলা পড়াইতে হইবে ভাবিয়া প্রথমে আমার বড় ভয় হইয়াছিল। তিনি তখনো বাংলায় কথা বলিতে পারিতেন না ; কিন্তু মাতৃভাষায় কথা কহিবার জন্য তাঁহার কি প্রগাঢ় ব্যাকুলতা !"

এই যোগাযোগটা কিভাবে হয়েছিল সেটা এখানে উল্লেখ করা দরকার। বরোদা থেকে অরবিন্দ প্রতি বছরেই পূজার সময় দেওঘরে মাতুলালয়ে আসতেন ও দাদামশাইয়ের সান্নিধ্যে কাটাতেন পূজার ছুটিটা। ভারতবর্ষে ফিরবার পর চার-পাঁচ বছর যখন অতিক্রান্ত হলো তখন তাঁর আত্মীয়-স্বজন দেখলেন যে, তিনি বাংলায় ভালো করে কথা বলতে পারেন না। অত বড়ো একজন ভাষাবিদের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই একটি অমার্জনীয় ত্রুটি। যত বড়ো পণ্ডিতই তিনি হোন না কেন, নিজের মাতৃভাষাটা যদি না শিখলেন তবে তো কিছুই শেখা হলো না—এইরকম কথা মাঝে মাঝে বলতেন অরবিন্দর মাতামহ রাজনারায়ণ বসু। তখন তাঁর মাতুল যোগীন্দ্রনাথ

প্রস্তাব করেন যে একজন ভালো মাস্টার নিযুক্ত করা দরকার। অনুসন্ধানের পর সুসাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার নির্বাচিত হন এই কাজের জন্য। কলকাতাতেই তাঁর বাংলার গুরুমশাইয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল বলা যায়। অরবিন্দকে প্রথম দর্শনের চিত্র দীনেন্দ্রকুমারের অপূর্ব লেখনীমুখে এইভাবে ফুটে উঠেছে :

"অরবিন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে বড়ই নিরাশ হইয়াছিলাম। তখন কে ভাবিয়াছিল যে পায়ে শুঁড়ওয়ালা সেকেলে নাগরা জুতা, পরিধানে আমেদাবাদের মিলের বিশ্রী পাড়ওয়ালা মোটা থাদি, কাছার আধখানা ঝোলা, গায়ে আঁটো মেরজাই, মাথায় লম্বা লম্বা গ্রীবাবিলম্বিত বাবরীকাটা পাতলা চুল, মধ্যে চেরা সিঁথি, মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ, চক্ষুতে কোমলতাপূর্ণ স্বপ্নময় ভাব, শ্যামবর্ণ ক্ষীণ দেহধারী এই যুবক ইংরেজি, ফরাসী, লাতিন, হিব্রু, গ্রীকের সজীব ফোয়ারা শ্রীমান অরবিন্দ ঘোষ!"

এই বর্ণনাটুকু থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, 'সাহেব' কে. ডি. ঘোষের পুত্র বিলাতে চৌদ্দ বছর কাটিয়ে উৎকট সাহেব সেজে দেশে ফিরে আসেন নি—তিনি যে ভারতীয় সেই নির্ভেজাল ভারতীয়ই ছিলেন। এটা বাঙালির বিশেষ সৌভাগ্যের কথাই বলতে হবে। কিন্তু দীনেন্দ্রবাবুর চিত্র এখানেই শেষ নয়। চিত্রের অপর অংশটুকু আরো সুন্দর। তিনি লিখেছেন: "দিবারাত্রি একত্র বাস করিয়া ক্রমে যতই অরবিন্দের হৃদয়ের পরিচয় পাইতে লাগিলাম, ততই বুঝিতে পারিলাম, তিনি এ পৃথিবীর মানুষ নহেন; অরবিন্দ শাপভ্রষ্ট দেবতা। তাঁহার হৃদয়ে পৃথিবীর হীনতা ও কলুষতা নাই। তাঁহার হাসি শিশুর হাসির মতো সরল তরল ও সুকোমল। হৃদয়ের অটল সংকল্প ওষ্ঠপ্রান্তে আত্মপ্রকাশ করিলেও মানবের দুঃখে আত্মবিসর্জনের দেবদুর্লভ আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন সে হৃদয়ে পার্থিব উচ্চাভিলাষের বা মনুষ্যসুলভ স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই।"

যুগমানব শ্রীঅরবিন্দ-চরিত্রের নিগূঢ় মহিমা বুঝি এমনভাবে তাঁর আর কোন জীবনীকার বর্ণনা করতে পারেন নি যেমনটি পেরেছেন দীনেন্দ্রকুমার। "অরবিন্দ শাপভ্রষ্ট দেবতা"—এই একটিমাত্র বাক্যে সেই বিরাটপুরুষের স্বরূপকে লেখক যেন অবারিত করে তুলেছেন পাঠকের সামনে। বিলাত প্রত্যাগত অরবিন্দের আকৃতি ও প্রকৃতি এমন সজীবভাবে আর কারো লেখনীর দ্বারা উদ্ঘাটিত হয়েছে বলে আমরা জানি না। তাই দীনেন্দ্রকুমারের 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' থেকে আমরা আরো একটু উদ্ধৃতি দেব। তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যকে বুঝবার পক্ষে এর প্রয়োজন আছে। বসওয়েল যেমন জনসনের নিত্যসঙ্গী হয়ে জনমনের অন্তরঙ্গ পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, দেখা যায় যে, দীনেন্দ্রকুমারও ঠিক সেইভাবে বরোদায় তাঁর সুপণ্ডিত ছাত্রটির নিত্যসঙ্গী হয়ে তাঁর স্বভাবের একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর এই চিত্তাকর্ষক

স্বল্পায়তন গ্রন্থটির প্রতিটি পৃষ্ঠায়। দীনেন্দ্রকুমার সাহিত্যিক ছিলেন। তাই তাঁর দৃষ্টিতে উত্তরকালের মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলিই ধরা পড়েছিল এবং তাঁর সাবলীল লেখনীমুখে তার প্রায় সবটাই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, বলা যায়। তিনি লিখছেন :

"শ্রীঅরবিন্দ কখনো সাজ-পোষাকের পক্ষপাতী ছিলেন না, বিলাসিতার সঙ্গে তাঁব পরিচয় ছিল না ; এমন কি রাজদরবারে যাইবার সময়েও তাঁহাকে সাধারণ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ কবিতে দেখি নাই। তাঁহার শয্যাও তাঁহাব পরিচ্ছদের ন্যায় নিতান্ত সাধাবণ ও আড়ম্বরহীন ছিল। তিনি যে লৌহখট্টায় শয়ন করিতেন, ত্রিশ টাকা মূল্যের কেবাণীও সে খট্টায় শয়ন কবা অগৌরবেব বিষয় মনে করে। কোমল ও স্থূল শয্যায় শয়নে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। বরোদা মরু-সন্নিহিত স্থান বলিয়া সেখানে শীত গ্রীষ্ম উভয়ই অত্যন্ত প্রবল ; কিন্তু মাঘ মাসের শীতেও অরবিন্দকে কোনদিন লেপ ব্যবহার করিতে দেখি নাই। পাঁচ সাত টাকা মূল্যের একখানি নীল আলোয়ান তাঁহার শীতবস্ত্র ছিল। যতদিন তাঁহার সহিত একত্রে বাস করিয়াছি, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য-নিরত পরদুঃখকাতর আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী ভিন্ন আব কিছু মনে হইত না ; যেন জ্ঞানসঞ্চয়নই তাঁহার জীবনের ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কর্ম-কোলাহল মুখবিত সংসাবে থাকিয়াও যেন তিনি কঠোর তপস্যায় মগ্ন। অববিন্দ চিরদিনই অর্থকে তুচ্ছ মনে করিয়া আসিয়াছেন। বিলাসিতার সহিত তাঁহার পবিচয় ছিল না। কোন রিপুকেই তাঁহাব উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখা যাইত না। বিস্তর সাধনা ভিন্ন মানুষ এরূপ আত্মজয়ী ও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না।"

আমবা বুঝলাম, অরবিন্দ শুধু শাপভ্রষ্ট দেবতা নন, তিনি সন্ন্যাসীও।

নির্বিকারচিত্ত ও নিস্পৃহ।

অর্থে আসক্তি নেই, সম্মানে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাত্রির দীর্ঘ প্রহব পর্যন্ত অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকতেন—পলকহীন দৃষ্টি পুস্তকের উপর নিবদ্ধ।

যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য যোগনিমগ্ন তপস্বী।

এই ভাব নিয়েই কি তিনি জন্মেছিলেন ?

বস্তুত অরবিন্দের জীবনে বরোদা অধ্যায়টি চিহ্নিত হয়ে আছে তাঁর বিস্ময়কর জ্ঞান-তপস্যার জন্য। দীনেন্দ্রকুমার না লিখলে সে-তপস্যার কথা আমরা কোনদিন জানতেই পারতাম না। চিরকাল আত্মপ্রচারবিমুখ অরবিন্দ নিজেও এ বিষয়ে কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যান নি। অধ্যাপনার অবসরে নিজের ঘরটিতে বসে তিনি একাগ্রমনে রাশি রাশি বই পড়তেন। পড়তেন আর লিখতেন। আজ, এই সুদূর কালের ব্যবধানে, আমরা যখন কল্পনা করি "অরবিন্দ রাত্রি একটা পর্যন্ত দুঃসহ

মশক-দংশন উপেক্ষা করিয়া, টেবিলের ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া 'জুয়েল-ল্যাম্প'-এর আলোকে ইউরোপের নানা ভাষার কত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিতেন," তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

সপ্তাহে মাত্র দুই-একদিন বাংলা পড়তেন, আবার বেশ কিছুদিন বাদ যেত। দীনেন্দ্রকুমারের বিবরণ অনুসারে এই সময়ে বাংলা একটু ভাল রকম শিখে অরবিন্দ 'স্বর্ণলতা', 'অন্নদামঙ্গল', 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি বইগুলি পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। তবে বাংলা রচনায় হাত দিয়েছিলেন কিনা তা জানা যায় না। কিন্তু বাঙালি লেখকদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি যে বছর দেশে ফিরে এলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত ছিলেন। তার পরের বছর ৮ই এপ্রিল বাংলা সাহিত্যের এই লোকোত্তর প্রতিভা অন্তর্হিত হন। দীনেন্দ্রবাবু বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অরবিন্দ নিজেই পড়তেন, বেশ বুঝতে পারতেন। বঙ্কিমের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি ছিল অসাধারণ। বঙ্কিমকে তিনি মনে করতেন আমাদের অতীত ও বর্তমানের সুবর্ণ-সেতু।

বঙ্কিমের মৃত্যুর চার মাস পরে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তিনি যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, বঙ্কিম-প্রতিভার তা একটি উৎকৃষ্ট মূল্যায়ন। এই বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে দ্বিতীয় যে ব্যক্তির তেজগর্ভ রচনা পাঠে অরবিন্দ মুগ্ধ হতেন তিনি বিবেকানন্দ। তাঁর ভারতে ফিরে আসার পর কিঞ্চিদধিক দশ বৎসরকাল এই মানবপ্রেমিক সন্ন্যাসী জীবিত ছিলেন। শোনা যায়, অরবিন্দের মাতামহের সঙ্গে বিবেকানন্দের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। তাঁর দেশপ্রেমের একাংশে যদি থাকেন বঙ্কিমচন্দ্র, তার অপরাংশে বিদ্যমান বিবেকানন্দ। পরে আমরা দেখতে পাব যে, যুগপৎ বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতি ও এর সমাজজীবনে এই নিরীহ ও নির্বাক প্রকৃতির মানুষটি কি রকম তরঙ্গ তুলেছিলেন।

॥ নয় ॥

অরবিন্দ কর্তব্যপরায়ণ পুত্র।

তাঁর অগ্রজ দুজন থেকে এইখানেই তাঁর পার্থক্য।

পিতা কৃষ্ণধন ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁদের পরিবারে দেখা দিল আর্থিক বিপর্যয়। ছোট দুটি ভাই-বোন এবং পাগলী মা—এদের কথা না চিন্তা করলেন বিনয়ভূষণ, না মনোমোহন, যদিও এঁদের দুজনই তখন ভালো চাকরিতেই প্রবেশ করেছেন। কাজেই সংসার প্রতিপালনের সব দায়িত্বই এসে পড়ল একা অরবিন্দের উপর। সে-দায়িত্বগ্রহণে তিনি বিমুখ হলেন না। বিলাত থেকে ফিরে পিতার শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ প্রশান্তমনে গ্রহণ করলেও অন্তরে তিনি যে বেদনা বোধ করেন নি, সে কথা কে বলবে? নিশ্চয়ই করে থাকবেন, কারণ পিতাকে তিনি যারপর নাই ভক্তি করতেন, শ্রদ্ধা করতেন এবং তিনি আরো জানতেন যে, তাঁদের তিনটি ভাইকে মানুষ করতেই কৃষ্ণধন একরকম সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। অরবিন্দ নিজেই বলেছেন: "পিতৃদেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পরিবার পালনের দায়িত্ব গ্রহণের প্রশ্ন ছিল না, সেটা আমি গ্রহণ করি দেশে ফিরে আসার কিছুকাল পরে।"

অরবিন্দের মনে আরো একটি বেদনা ছিল।

সেটি তাঁর মা স্বর্ণলতা সম্পর্কে।

মা-কে তিনি খুবই ভালবাসতেন। কৃষ্ণধনের মাতৃভক্তি পুত্র অরবিন্দের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে থাকবে। আগেই বলেছি, এই তৃতীয় পুত্রটিকে গর্ভে ধারণ করার সময় থেকেই স্বর্ণলতা আর স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না এবং তারপর থেকে সারাজীবন দুরারোগ্য উন্মাদরোগে দিনাতিপাত করতেন দেওঘরের সেই নির্জন রোহিনী গ্রামে। তাঁর আদরের 'অরো' কতবড়ো হয়ে ফিরে এলো সাফল্যের মুকুট মাথায় নিয়ে—উন্মাদিনী স্বর্ণলতা তার কিছুই বুঝতে পারলেন না। ভারতে ফিরে দেওঘরে এসে সকলের আগে তিনি যখন তাঁর মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, কথিত আছে অরবিন্দকে তাঁর মা চিনতেই পারেন নি। সেই মর্মান্তিক চিত্রটি কল্পনা করলে আমাদের হৃদয়ে বেদনা বোধ না হয়েই পারে না।

সরোজিনী ঘোষ বলেছেন: "সেজদাকে নিয়ে বড়দা এলেন দেওঘরে। খুব কচি মুখ, মাথায় বড় বড় চুল, বিলিতি ছাঁটে বাবরী কাটা। সেজদা খুব

লাজুক ছিলেন। মেয়েরা যখন তাঁকে ঘিরে পড়ে, তিনি লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলেন। দাদামশাই কোলাকুলি দিয়ে বুকে তুলে নিলেন। মায়ের সঙ্গে রোহিনীতে গিয়ে সেজদা দেখা করেছিলেন। মা চিনতে পারেন নি, বলেন—আমার অরবিন্দ ছোট ছিল এত বড় তো নয়। আমার অরবিন্দের আঙুল কাটা ছিল।" সাত বছরের ছেলে আজ একুশ বছরেরটি হয়ে ফিরে এলো, কিন্তু স্বর্ণলতা ছেলেকে চিনতেই পারলেন না। বৃদ্ধ মাতামহ রাজনারায়ণ নীরবে দাঁড়িয়ে এই মর্মান্তিক দৃশ্যটি দেখেছিলেন। মাতা-পুত্রের এই সাক্ষাতে মায়ের অবস্থা দেখে অরবিন্দ নিশ্চয়ই মনে বেদনা বোধ করে থাকবেন। ইহা স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণভাবেই তাঁর প্রকৃতি-সঙ্গত।

আগেই বলেছি, কৃষ্ণধন অমিতব্যয়ী ছিলেন।

আয়ের তুলনায় ব্যয় করতেন বেশি। সেইজন্য মৃত্যুকালে তিনি বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেন নি। স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ছিল স্কট লেনে একটি বাড়ি এবং মানিকতলায় একটা বাগানবাড়ি। শোনা যায়, অনেক আগে থেকেই তিনি একটা উইল করে গিয়েছিলেন। তাতে স্ত্রী স্বর্ণলতার জন্য একটা ব্যবস্থার উল্লেখ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই উইল নিয়ে অনেক গণ্ডগোল হয়। অরবিন্দের প্রথম কাজ ছিল মা ও ভাই-বোন দুটির জন্য ব্যবস্থা করা। দীনেন্দ্রকুমারের সাক্ষ্যে আমরা জানতে পারি যে, "তিনি বেতন পাইলে সর্বাগ্রে তাঁহার মাতা ও ভগিনীকে খরচের টাকা পাঠাইতেন। কখন কখন অসময়েও তাঁহাদের কাছে অরবিন্দকে মনি-অর্ডার করিতে দেখিয়াছি। মায়ের প্রতি তাঁর অসাধারণ ভক্তির পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।"

কর্তব্য শুধু মায়ের জন্য নয়, সংসারে সকলের জন্যই তিনি কর্তব্য করে গিয়েছেন যতদিন তিনি বরোদার চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। সহোদরা, সহোদর, মাসতুতো বোন প্রভৃতি সকলকেই তিনি খুব স্নেহ করতেন, নিয়মিত চিঠিপত্র লিখতেন আর টাকাকড়ি পাঠাতেন। তিনি তো একা মানুষ, বিলাসিতার সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না—একটি পয়সাও অপব্যয় করতেন না। তবু, শোনা যায়, মাসের শেষে তাঁর হাতে একটি পয়সাও থাকত না। তখন বন্ধুদের কাছে ধার করতেন। এর দুটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। গোড়ার দিকে তাঁর মাইনে ছিল দুশো টাকা আর ১৯০৬ সালে কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে যখন বাংলা দেশে এলেন তখন অবশ্য অরবিন্দের বেতন ছিল মাসিক সাতশো পঞ্চাশ টাকা। ভাই-বোন ও মায়ের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন; অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদেরও টাকা পাঠাতেন। এ ছাড়া, তাঁর নিজের একটিমাত্র অপব্যয় ছিল। সেটির উল্লেখ না করলে তাঁর বরোদা-জীবনের চিত্র সম্পূর্ণ হবে না।

বই কেনা তাঁর একটা বাতিক ছিল। এই প্রসঙ্গে দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন: "অরবিন্দের পাঠাগারে ইউরোপের নানা ভাষার গ্রন্থ স্তূপীকৃত ছিল। ফরাসী, জার্মান, রুশীয়, ইংরেজি, গ্রীক, লাতিন, হিব্রু প্রভৃতি কত ভাষার কত রকমের পুস্তক। চসার হইতে সুইন্‌বরণ্‌ পর্যন্ত সকল ইংরেজ কবির কাব্যগ্রন্থ তাঁহার পাঠাগারে সজ্জিত ছিল। অসংখ্য ইংরেজি উপন্যাস আলমারিতে, গৃহকোণে, স্টীল-ট্রাঙ্কে স্তূপীকৃত ছিল। হোমারের ইলিয়ড, দান্তের মহাকাব্য, আমাদের রামায়ণ মহাভারত, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থাবলী সমস্তই অরবিন্দের পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল।...বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত পুস্তক-ব্যবসায়ী আত্মারাম রাধাবাঈ সেগুন ও থ্যাকারে কোম্পানী অরবিন্দকে পুস্তক সরবরাহ করিতেন। তাঁহারা প্রতি মাসেই অথবা প্রতি সপ্তাহেই নূতন নূতন পুস্তকের সুদীর্ঘ তালিকা অরবিন্দের নিকট পাঠাইতেন, তিনি সেই তালিকা দেখিয়া পছন্দমত পুস্তকের নাম নির্বাচন করিয়া অর্ডার পাঠাইতেন। বেতন পাইলেই তিনি প্রতি মাসে পঞ্চাশ-ষাট বা ততোধিক টাকা মনি-অর্ডার যোগে পুস্তকবিক্রেতাগণের নিকট পাঠাইতেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্যাকিং-বাক্সে বোঝাই হইয়া রেল পার্সেলে পুস্তকগুলি আসিত। অরবিন্দ সেই সকল কেতাব আট দশ দিনের মধ্যে পড়িয়া ফেলিতেন। আবার নূতন নূতন পুস্তকের অর্ডার যাইত। এমন সর্বভুক পাঠক আর কখন দেখি নাই।"

এইভাবে প্রতি মাসে বই কেনাই ছিল তাঁর একটি অপব্যয়। দীনেন্দ্রকুমার তাঁর সঙ্গী অথবা শিক্ষক হিসাবে অরবিন্দের সঙ্গে বরোদায় দু' বছরের কিছু বেশি সময় একত্রে যাপন করবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সেই সময়ে তিনি 'গ্রন্থকীট' অরবিন্দের এই অপব্যয় চাক্ষুষ করে বিস্মিত হয়েছিলেন। পূজোর ছুটিতে তিনি যখন দেওঘরে আসতেন তখন সেখানে তাঁর সঙ্গে যেত কয়েকটি ট্রাঙ্ক। সবাই ভাবত সেগুলির মধ্যে না জানি বিলেত ফেরৎ অরবিন্দের কত রকমের স্যুটই বা আছে। কিন্তু ঐ ট্রাঙ্কগুলি যখন খোলা হতো তখন দেখা যেত সেগুলির মধ্যে আছে শুধু বই আর বই। আর পরিধেয় বস্ত্র বলতে সামান্যই। ইংল্যাণ্ডে ছাত্রজীবনে এবং পরবর্তীকালে বরোদায় অরবিন্দ যে কত টাকার বই কিনেছিলেন, কেউ যদি তার একটা হিসাব রাখত তাহলে টাকার অঙ্কটার সঠিক পরিমাণ জানা যেত। ভারতে ফিরবার পর, শোনা যায়, বিলাত থেকেও তাঁর নামে বই আসত। সময় সময় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, অরবিন্দের সেই মূল্যবান সংগ্রহ গেল কোথায়? সম্ভবত বরোদা কলেজের লাইব্রেরিতে আছে।

অধ্যাপক অরবিন্দের কথা বলি এইবার।

বরোদা রাজ কলেজে তখন একজন ইংরেজ অধ্যক্ষ ছিলেন।

অধ্যাপকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন বাঙালি। সম্ভবত শেষের চার-পাঁচ বছর তিনি সহ-অধ্যক্ষেব পদে নিযুক্ত হয়ে থাকবেন। তখন তাঁর বেতন হয়েছিল মাসিক সাড়ে সাত শত টাকা। হাজার টাকা দিলেও অমন একজন বহু ভাষাবিদ্ অধ্যাপক মিলত কিনা সন্দেহ। সেদিক দিয়ে বরোদা রাজ কলেজেব সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, প্রথমে মাত্র দুই শত টাকায় কেম্‌ব্রিজের একজন ট্রাইপ্‌সকে মহাবাজা সয়াজি রাও পেয়েছিলেন তাঁর কলেজে অধ্যাপনা কাজের জন্য। মহারাজা যখন বুঝলেন যে অধ্যাপনাই অরবিন্দেব যোগ্য কাজ তখন থেকে তিনি তাঁকে দপ্তবেব বাজে কাজ থেকে সবিয়ে এনে সম্পূর্ণভাবে অধ্যাপনার কাজেই বহাল কবেন। অববিন্দ যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। রাজদরবাবে যাওয়া-আসায় ছেদ পড়ল, অতঃপর তিনি অধ্যয়ন আব অধ্যাপনা নিয়েই রইলেন। আগেই বলেছি, ওখানকার কলেজে প্রথমে তিনি ফরাসী ভাষার লেকচাবাব এবং পরে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণধনের দুটি পুত্র—মনোমোহন ও অরবিন্দ অধ্যাপক হয়েছিলেন এবং উত্তরকালে এই বৃত্তিতে উভয় ভ্রাতাই বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মনোমোহনের কথা আগেই বলা হয়েছে, অতঃপর আমরা তাঁর এই সহোদরটির অধ্যাপনা সম্বন্ধে কিছু বলব।

ছাত্র এবং সহকর্মীদের খুবই প্রিয় ছিলেন অরবিন্দ।

সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বরোদার ছাত্রসমাজ তাঁকে কী গভীর শ্রদ্ধার আসনেই না বসিয়েছিল। নিজের সম্বন্ধে যিনি চিরদিন নির্বাক, আপন মহত্বে যিনি চিব উদাসীন, সেই অরবিন্দ তাঁব অধ্যাপনা সম্পর্কে কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যান নি, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। নিজের ঢাকটা তিনি কোনদিনই ভাল করে পেটাতে জানতেন না। তাঁর স্বভাবের এই ত্রুটিই ছিল তাঁর চবিত্রের অন্যতম ভূষণ। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্র (যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তরকালে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন) অরবিন্দেব অধ্যাপনার কিছু বিবরণ দিয়েছেন। সেইগুলি থেকে আমরা অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষের একটি সুন্দর চিত্র পাই। বিখ্যাত লেখক ও কংগ্রেস নেতা কান্‌হাইয়া লাল মুন্সী বা ডক্টর কে. এম. মুন্সী অরবিন্দের ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি লিখেছেন:

"আমার বালক বয়সেই শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। বরোদা কলেজে তিনি আমার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর অধ্যাপনা-রীতির বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা মুগ্ধ হতাম এবং কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকদের অপেক্ষা তাঁর বৈশিষ্ট্য তাঁকে ছাত্রদের কাছে বিশেষভাবেই প্রিয় করে তুলেছিল। তিনি যখন ক্লাস নিতেন তখন ক্লাসঘর থাকত নিস্তব্ধ আর আমরা সবাই উৎকর্ণ হয়ে তাঁর লেকচার শুনতাম।

তিনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। যেমন বিশুদ্ধ তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ, তেমনি পঠিত বিষয়ের ব্যাখ্যানে তিনি ছিলেন নিপুণ। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সুমিষ্ট ও মৃদু, তাই ছাত্রদের খুব সতর্কতার সঙ্গে তাঁর লেকচার অনুসরণ করতে হতো। কোন একটি জিনিস পড়াবার সময় তিনি ঐ বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত কত বিষয়ের যে অবতারণা করে ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে সহায়তা করতেন, তা দেখে আমরা সবাই বিস্মিত হতাম। নতুন চিন্তার রসধারায় সিঞ্চিত করতেন তাদের অন্তর। তিনি পড়াতেন এক মনে। তিনি একটি নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে, লেকচার দেবার সময় কোন ছাত্র কোন প্রশ্ন করবে না—কারো যদি কোন জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে লেকচার সমাপ্তির পর তা করতে হবে। আমাদের ইংরেজ অধ্যক্ষ ক্লার্ক সাহেব বলতেন, বিলাতের কোন কলেজে প্রফেসর ঘোষের মতো এমন সুন্দরভাবে পড়াতে খুব কম অধ্যাপককেই তিনি দেখেছেন। মোট কথা, সকল ছাত্রই শ্রীঅরবিন্দকে শ্রদ্ধা করত তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য যতখানি না হোক, তার চেয়ে বেশি তাঁর সেই দেবদুর্লভ চরিত্রের জন্য। মহারাজা সয়াজি রাও সত্যিই একটি মহার্ঘ্য রত্ন বিলাত থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন।"*

এ. বি. ক্লার্ক ছিলেন বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ। ডঃ মুন্সী ১৯০২ সালে বরোদা কলেজের ছাত্র ছিলেন। মিস্টার আর. এন. পাটকার (যিনি পরবর্তীকালে একজন প্রখ্যাত আইনজীবী হয়েছিলেন) তাঁর আর একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি লিখেছেন: "অত্যন্ত অনাড়ম্বর ছিল শ্রীঅরবিন্দের জীবন। পোষাকে, আহারে কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাঁর, কারণ এগুলো তাঁর কাছে নেহাৎ গৌণ ছিল।...ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে তাঁর ছাত্র হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অভাবনীয় ছিল তাঁর শেখাবার পদ্ধতি। প্রথমে তিনি পাঠ্য বিষয়বস্তুটির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি লেকচার দিতেন। তারপর টেক্সটটি পড়া শুরু করতেন, এবং কঠিন শব্দ বা বাক্য থাকত তার অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। তারপর বিষয়বস্তুটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কয়েকটা সাধারণ লেকচার দিতেন।

"কিন্তু তাঁর ক্লাস-লেকচারগুলির চেয়েও উপভোগ্য ছিল মঞ্চের উপর তাঁর ভাষণ। কলেজের বিতর্ক-সমিতির সভায় প্রায়ই তাঁকে সভাপতিত্ব করতে হতো। তিনি যখন বলতে শুরু করতেন, কলেজের বিশাল কেন্দ্রীয় হলটিতে তিলধারণের ঠাঁই থাকত না। তিনি বাগ্মী ছিলেন না, কিন্তু অত্যন্ত উঁচুদরের বক্তা ছিলেন। তাঁর প্রতিটি কথাই শ্রোতারা শুনতেন নিবিষ্ট চিত্তে। সামান্যতম অঙ্গভঙ্গিও করতেন না তিনি; ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আর তাঁর কণ্ঠ থেকে বাণীর প্রবাহ নেমে

* এই গ্রন্থের লেখককে লেখা ডঃ মুন্সীর একটি পত্রের আংশিক উদ্ধৃতি।

আসত সহজ সুন্দরভাবে, সাবলীল স্বরের মতো—যা শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত।"

সাধারণ চাদর আর ধুতি—পরিচ্ছদ বলতে ছিল এই।

নারকোলের ছোবড়ার উপর মালাবার ঘাসের মাদুর—শয্যা বলতে ছিল এই।

অমন কঠিন শয্যা কেন?—এই প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলতেন—কঠিন। নরম বিছানায় শোওয়া ব্রহ্মচারীর নিষেধ, আমাদের শাস্ত্র বলে এই কথা।

টাকা মাটি, মাটি টাকা—দক্ষিণেশ্বরের সেই নিরক্ষররূপী অক্ষর পুরুষের মুখে আমরা শুনেছি এই কথা। অরবিন্দ কি তা জানতেন? প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে পাই—বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না তাঁরও টাকাকড়ি সম্পর্কে। "একটা থলি ভরে তিনি একসঙ্গে তিন মাসের মাহিনা নিয়ে এসে ঢেলে দিতেন একটা বারকোশের ওপর। টাকা কখনো তালা-চাবি দিয়ে বাক্সে রাখতেন না। খরচপত্রের কোন হিসেবও রাখতেন না তিনি।"

টাকাব হিসাব রাখেন না আপনি?

যদি এ কথা কেউ জিজ্ঞাসা করত, অমনি প্রশান্তবদনে বলতেন, আমার হিসাব ভগবান রাখেন।

বই পড়তেন তন্ময় হয়ে।

পৃথিবী আছে কি নেই তার হুঁশ নেই।

সন্ধ্যায় ভৃত্য এসে তাঁর টেবিলে খাবারের থালা সাজিয়ে রাখল।

আধ ঘণ্টা বাদে এসে দেখে টেবিলের খানা যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

তখন কেউ যদি এসে খাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তবে হুঁশ হয়।

লিখছেন এক মনে।

রাত্রির তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

সিগারের ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। ভ্রূক্ষেপ নেই যে ঘরের জানালা পর্যন্ত বন্ধ। শ্বাসরোধ হওয়া বিচিত্র নয়। ভৃত্য এসে স্মরণ করিয়ে দেয়, রাত শেষ হয়ে এলো, আর শোবেন কখন?—একটুখানি হাত-পা ছড়িয়ে নিলেই চলবে, বলেন মৃদু হেসে। আশ্চর্য, শরীরে কোন ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই হাতের লেখনীর।

সকাল বেলায় মহারাজার খাস কর্মচারী এসে জানায় একবার দরবারে যেতে হবে।

ঃ পৃথ্বীন্দ্রনাথের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

গায়কোয়াড়ের দরবার। সেখানে যারা যায় তারা দরবারী পরিচ্ছদেই ভূষিত হয়ে যায়। রাজদরবারের প্রচলিত প্রথা এই। ধুতি-সার্ট পরিধান করেই চললেন, তবে মাথায় একটা পাগড়ি জড়িয়ে নিলেন।

বিচিত্র চরিত্রের মানুষ এই অরবিন্দ।

তিনি কি এমনি অনাসক্ত ও নিস্পৃহ সন্ন্যাসীর ভাব নিয়েই জন্মেছিলেন ?

॥ দশ ॥

কেশবরাও গণেশ দেশপাণ্ডে কেমব্রিজে অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। সাধক-প্রকৃতির মানুষ। জাতিতে মারাঠী। ভারতে ফিরে তিনি পুণা থেকে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। পত্রিকাটির নাম দিলেন 'ইন্দু-প্রকাশ'। বরোদায় আসার চার মাস পরে দেশপাণ্ডের কাছ থেকে একদিন অনুরোধ এলো তাঁর 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে লিখবার জন্য। ১৮৯৩-এর আগস্ট মাস থেকে শুরু করে ১৮৯৪ সালের ৫ই মার্চ—এই সময়ের মধ্যে ভারতের জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেস সম্পর্কে কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখলেন অরবিন্দ। রচনার নাম ছিল 'নিউ ল্যাম্পস ফর দি ওল্ড' ('প্রাচীনপন্থীদের সামনে নতুন দিনের আলো')। আলোই বটে—ভারতের রাজনৈতিক চেতনার এক নবদিগন্ত রচনা করল অরবিন্দের এই চিন্তাগভ প্রবন্ধগুলি। ভারতের রাজনীতিতে এই ছিল তাঁর প্রথম তূর্যধ্বনি। গতানুগতিক রাজনীতির আসরে সে যেন এক বেসুরো বাজনা। কংগ্রেসের জাবর-কাটা নেতারা—যাঁদের সম্বল শুধু আবেদন আর নিবেদন—চমকে উঠলেন প্রবন্ধগুলি পাঠ করে। চমকে উঠলেন তাঁরা লেখকের বক্তব্যের বলিষ্ঠতা আর অপূর্ব লিখনভঙ্গি দেখে। অরবিন্দের এই প্রবন্ধগুলি সেদিন সত্যিই ইতিহাস রচনা করেছিল।

কংগ্রেস ও কংগ্রেসীয় রাজনীতি ছিল তাঁর এই রচনার উপলক্ষ্য, আসল লক্ষ্য কিন্তু ছিল তাঁর স্বদেশবাসীকে একটা নতুন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা। সমকালীন 'বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তাঁর এই লেখাগুলি সেদিন রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। শান্তশিষ্ট ও নির্বাক প্রকৃতির এই মানুষটির মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরি ছিল তা সেদিন সহসা কেউ ধারণা করতে পারেনি। তবে তার অগ্ন্যদ্গীরণের তখনো বেশ কিছুকাল বিলম্ব ছিল। অরবিন্দের এই রচনাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে প্রসঙ্গত কংগ্রেসের জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে কিছু বলার আছে। কারণ সাধারণত ভারতের জাতীয় মহাসভার উৎপত্তি সম্বন্ধে যেসব বিবরণ ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে তথ্যগত ভুল ভ্রান্তি যেমন আছে, সিদ্ধান্তের মধ্যেও অনেক গলদ আছে। যেসব ঐতিহাসিক কংগ্রেস তথা আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন, সাম্প্রতিককালে একজন তথ্যানুসন্ধানী ইংরেজ গবেষকের গবেষণালব্ধ তথ্যের নিরিখে সেগুলি যাচাই

করে দেখলে পরে মনে হবে যে কংগ্রেসের জন্মবৃত্তান্তটি ঠিকভাবে অনেকেই আলোচনা করতে সক্ষম হননি।

'নিউ ইণ্ডিয়া, ১৮৮৫ : ব্রিটিশ অফিসিয়াল পলিসি য়্যাণ্ড দি এমারজেন্স অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস'—এই নাম দিয়ে ব্রিটন মার্টিন নামে জনৈক গবেষক যে গ্রন্থখানি রচনা করেছেন, সেটি কংগ্রেসের জন্মবৃত্তান্তের সঠিক বৃত্তান্ত নিয়েই আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় গ্রন্থকার তাঁর গবেষণা শেষ করবার পূর্বেই মারা যান এবং তাঁর মৃত্যুব পবে এটি গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত হয়।* তথাপি প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ এই অসমাপ্ত গ্রন্থখানি কংগ্রেসেব আদিপর্বের উপর অনেকখানি আলোকসম্পাত করেছে। গ্রন্থকার এই দেশে এসে এখানে সংবক্ষিত উপাদানের উপর ভিত্তি করেই এই মূল্যবান গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। বইটির গুরুত্ব এইখানেই। ইতিপূর্বে যাঁরা কংগ্রেসের ইতিহাস বচনার কাজে হস্তক্ষেপ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বিলাতে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত উপাদানই ব্যবহার করেছেন—তাঁদের কেউ-ই আজ পর্যন্ত উৎসমুখে কোন অনুসন্ধান চালাননি। গ্রন্থকার মার্টিনের কৃতিত্ব এইখানেই।

১৮৮৫ সালে ভাবতীয জাতীয় মহাসভা বা ইণ্ডিযান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অভ্যুদয় ভারতবর্ষেব ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, দাদাভাই নৌরোজি থেকে শুরু কবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত ভারতে যত নেতাব আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের প্রত্যেকেবই রাজনৈতিক প্রতিভা এবং কর্মপ্রয়াস সবই বিকশিত ও আবর্তিত হয়েছে এই কংগ্রেসকে কেন্দ্র করেই। এক কথায় আধুনিক ভারতেব রাজনৈতিক চেতনাব প্রতীক এই কংগ্রেস। সকলের চেয়ে বড়ো কথা ভারতের জনমত গড়ে উঠেছে এই প্রাচীনতম বাজনৈতিক সংস্থাটিকে আশ্রয় করেই। আবার এ দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা কংগ্রেসকে ঘিরে যতখানি আবর্তিত হয়েছে, এমন দাবী ভারতেব আর অন্য কোন বাজনৈতিক দল কবতে পারে কিনা সন্দেহ। রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবেও কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠত্ব একদা বড়ো কম ছিল না। কারণ, শ্রেষ্ঠ নেতার শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা আমরা এখান থেকেই পেযেছি। ১৮৮৫ সাল থেকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্বে কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটেছে বহুবার, তথাপি জনচিত্তে এর স্থান যেমন ব্যাপক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। এ গৌরব ভারতের আর কোন রাজনৈতিক দলেব নেই। আবার অন্য দিকে দেখা যায় যে, সেই এর জন্মকাল থেকে স্বাধীনতালাভের সময় পর্যন্ত কংগ্রেসকে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন তাঁদের সমতুল্য নেতা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বিরল বললেই হয়। মহাত্মা গান্ধীর

নেতৃত্বের সময়েই কংগ্রেসের মধ্যাহ্নদীপ্তি সারা পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী মানুষের মনে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল তা তো ইতিহাস হয়ে আছে। তাই কংগ্রেস সম্পর্কে, বিশেষ করে এর জন্মের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের মনে একটা সঠিক ধারণা থাকা দরকার এবং পুরাতন ধারণার পরিবর্তনও বাঞ্ছনীয়।

এ্যালান অক্টেভিয়ান হিউমকে কংগ্রেসের জন্মদাতা বলা হয়ে থাকে। হিউমের জীবনীকার ওযেডারবার্ণ (যিনি নিজে ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা পরম্পরার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন) এই বিষয়ে যেসব তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন তার অনেকখানি বিচারসহ নয়, নির্ভরযোগ্য তো নযই। কংগ্রেসেব জন্মবৃত্তান্ত রচনা করতে গিয়ে অনেক ভারতীয় লেখক ওয়েডারবার্ণেব উপর নির্ভর করে থাকেন। ফলে একটি ভ্রান্ত ধারণা চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। আসল কথা এই যে, ব্রিটিশ সরকারী নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই সমগ্র বিষযটি আমাদের বুঝতে হবে। সিপাহী বিদ্রোহেব পর থেকেই ভারতের নবযুগের সূচনা। এই নবীন ভারতের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল একটি সর্বাঙ্গীন জাতীয় চেতনার বিকাশ এবং এরই পরিণতি ছিল জাতীয় কংগ্রেস। ভারতের ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত সম্প্রদাযকে সবকার উপেক্ষা করে আসছিলেন। সেই শিক্ষিত সম্প্রদাযকে ব্রিটিশ শাসনের অনুকূলে নিয়ে আসাব যৌক্তিকতা সর্বপ্রথম অনুধাবন করলেন রিপন। সরকারী নীতিতে একটা বড়ো রকমের পবিবর্তন পরিলক্ষিত হলো তখন থেকেই। লিটনের আমলে সরকাবী নীতির পরিবর্তন একটা বাস্তব রূপ নিতে চাইল। যে শিক্ষিত সম্প্রদাযকে 'বাবু' বলে পরিহাস করা হতো, লিটন তাঁর এক ডেসপ্যাচে অনুযোগ করলেন যে, ইংরেজরা নিজেরাই আধা বাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা লিখতে তাদের শিখিয়েছে। কিন্তু সরকারী চাকবী দিযে এদের মুখ বন্ধ করা যেতে পারে, প্রস্তাব করলেন লিটন। ডাফরিনের সমস্যাটা ছিল এই যে, এই শিক্ষিত সম্প্রদাযের সঙ্গে ঠিক কিরকম ব্যবহার করা যেতে পারে—রিপনের দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে, না লিটনের দৃষ্টিভঙ্গী দিযে অর্থাৎ উদার মনোভাব নিয়ে, না উদ্ধত ও উপেক্ষামূলক মনোভাব নিয়ে।

এই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কি সরকার উপেক্ষা করতে পারেন?—প্রশ্ন তুললেন ডাফরিন। সরকারী শাসন ব্যবস্থায় এদের প্রতিনিধিত্ব ও দাযিত্ব গ্রহণের চেষ্টা থেকে কি এদের পৃথক করে রাখা চলে? উত্তরটা দিলেন ভারত সচিব কিম্বার্লে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁর চক্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায় ঠিক একটি শ্রেণী নন, একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা কোটেরীভুক্ত দল; কণ্ঠস্বর ও সংখ্যায় এরা বাঙালি। ভারত সচিব তাই লিটনিয়ান নীতির পুনঃপ্রবর্তনের ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। রিপনের বলিষ্ঠ সতর্কতা অগ্রাহ্য করে তিনি একটি উপায় চিন্তা করলেন। রিপন বলেছিলেন তাঁর সমাধানের সূত্রকে একবার গ্রহণ করলে আর সরিয়ে রাখা চলবে না। প্রজাবৎসল রিপনের

নীতির উপর শিক্ষিত ভারতবাসীর আস্থা কতখানি ছিল তার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল রিপনের সম্মানে সেই সময় অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী অভিনন্দনের মধ্যে। ডাফরিন কিন্তু নতুন অবস্থার বাস্তবতা বুঝলেন না, অথবা তাঁর ভিতরকার ডিপ্লোম্যাটই তাঁকে অন্ধ করে রেখেছিল। তিনি লোকের কথায় খুব বিশ্বাস করতেন এবং তিনি তাই মনে করলেন যে তিনি সবাইকে খুশি করতে পারবেন। কিন্তু ডাফরিন বুঝতে পারেন নি যে, যিনি সকলকে খুশি করতে চান তিনি শেষ পর্যন্ত কাউকেই খুশি করতে পারেন না। তিনি একই সঙ্গে সকলের প্রতি নিরপেক্ষতা প্রদর্শনের নীতি ঘোষণা করলেন ও পিঠ চাপড়ালেন সুবিধাপ্রাপ্ত সেই সব উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে যাঁরা ছিলেন একান্ত অপরিহার্য।

ঠিক এই সময়েই দেখা গেল যে, ক্রমাগত সরকারী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে দেখা দিতে থাকে প্রতিক্রিয়া। তাঁদেরই কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল এই সতর্কবাণী: "যিনি সকলকে সন্তুষ্ট করতে চান তিনি কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারেন না এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে কর্তব্য ও ন্যায় বিচার থেকে অবশ্যই বিচ্যুত হতে হবে।" এর এক বছর পরেই, ১৮৮৫ সালে, দেখা গেল যে, অবস্থার চাপে পড়ে ডাফরিন মাঝ পথে থমকে দাঁড়ালেন ও গ্রহণ করলেন লিটনের পন্থা। ফলে, ব্রিটিশ শাসন ও শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে ব্যবধানের দূরত্ব আরো বৃদ্ধি পেলো। স্মরণ থাকতে পারে যে, উৎসাহের প্রাবল্যে এই শিক্ষিত সম্প্রদায় সেদিন রিপনকে গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী শাসকের কাছে তাই তাঁদের অনেক প্রত্যাশা ছিল। ১৮৮৫, ৩০শে জানুয়ারি ক্যালকাটা ট্রেডার্স ডিনার সভায় তাঁদের উৎকণ্ঠার নিরসন করে ডাফরিন ঘোষণা করলেন: "যে ন্যায়বিচার, কুসংস্কার অথবা স্বার্থপরতার দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং সকল ধর্মসম্প্রদায় ও জাতির প্রতি নিরপেক্ষতার যে নীতি সমালোচনা বা তোষামোদের ঊর্ধ্বে, আমি তারই পক্ষপাতী।"

কিন্তু এই প্রকাশ্য ঘোষণার অন্তরালে চলছিল আর একটা ব্যাপার। রাজভবনে বসে তিনি সরকারী নীতিতে জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনার কথা চিন্তা করছিলেন ও য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মনে যাতে বিরক্তির উদ্রেক না হয় তারও উপায় চিন্তা করছিলেন। আর এই দুটি কাজ করতে গেলে শিক্ষিত ভারতীয়দের অভিমতকে উপেক্ষা করতে হয়—উপেক্ষা করতে হয় তাঁদের সমস্ত দাবী ও অনুযোগ। এটা পরিষ্কার হলো যখন দেখা গেল যে, লণ্ডনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ বয়স নির্ধারণ করার জন্য রিপন যে প্রস্তাব করেছিলেন, ভারত সচিব তা অগ্রাহ্য করেন; কিম্বার্লের সিদ্ধান্তকেই ডাফরিন গ্রহণ করলেন। এ ছাড়া, আইন পরিষদের সংস্কার সম্পর্কে তাঁর প্রতিকূল মনোভাব থেকেও ডাফরিনের মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সুতরাং এই দুটি ব্যাপারে শিক্ষিত ভারতীয়দের

মনে একটা তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হলো এবং তাঁদের সঙ্গে ডাফরিনের সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে শিক্ষিত ভারতীয়গণ সরকারের আনুকূল্য ব্যতিরেকেই সর্ববাদী সম্মতভাবে জাতীয় রাজনৈতিক কর্মপন্থার সর্বোত্তম উপায় ও সম্ভাবনার কথা গভীর-ভাবেই চিন্তা করতে থাকেন। নরেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় এই সম্পর্কে একটি জাতীয় সংস্থা গঠনের জন্য পরিকল্পনাসমূহ প্রকাশিত হতে থাকে। এর প্রথম পদক্ষেপ ছিল বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এ্যাসোসিয়েশন; বোম্বাইয়ের প্রবীণ ও তরুণ নেতারা মিলে এটা শুরু করেছিলেন। দীর্ঘকাল যাবৎ অবলুপ্ত বোম্বাই এ্যাসোসিয়েশনের শূন্যস্থান এই নবগঠিত সংস্থাটির দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল। এছাড়, কলকাতায় অবস্থিত লণ্ডন 'টাইমস' পত্রিকার সংবাদদাতা ভারতের ক্রমবর্ধমান জনমত সম্পর্কে বিলাতে দুরভিসন্ধিমূলক ও বিকৃত যেসব সংবাদ প্রেরণ করছিলেন তার প্রতিকারের জন্য একটি টেলিগ্রাম ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্তও তাঁরা গ্রহণ করেন।

এইখানেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তথাকথিত জন্মদাতা, অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান এ্যালান অক্টেভিয়ান হিউমের কথা আসে। কংগ্রেস গঠনের উদ্যোগ-পর্বে হিউমের ভূমিকাটি সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা থাকা দরকার। তাঁর জীবনীকার ওয়েডারবার্ণ হিউম সম্পর্কে যেসব তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন তার নিরপেক্ষতা বা সত্যাসত্য বিচার্য। মার্টিনের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, হিউম মানুষটি ছিলেন ভাল-মন্দের সংমিশ্রণ। তিনি যতখানি মহৎ, ঠিক ততখানি নীচ প্রকৃতির ছিলেন। হিউমের সঙ্গে ডাফরিনের সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে মার্টিন লিখেছেন: "১৮৭৯ সালের পরবর্তী যে ছয়টি বৎসর, ভারতবর্ষের শাসন-তান্ত্রিক ইতিহাসে তা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এই কয় বছরের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি এই: শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে সরকারী শাসন নীতির ফলে সঞ্চারিত হয়েছে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য আর আমলাতন্ত্রের প্রতি তীব্র ক্ষোভ। এই পটভূমিকায় হিউমের মনে একটি চিন্তা জাগল: ভারতবাসীর ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একটি সংঘবদ্ধ রূপ দেওয়া যায় কিনা। ভারতবর্ষকে তিনি যেমন ভালবাসতেন, তেমনি তাঁর বিশ্বাস ছিল ব্রিটিশ শাসনের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার উপর।" তারপর ডাফরিনের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হয়।

প্রচলিত থিওরি হলো ডাফরিনের আশীর্বাদ নিয়েই হিউমের মধ্যস্থতায় কংগ্রেসের জন্ম। কিন্তু আসলে ডাফরিন যা চেয়েছিলেন তা বিলাতের সরকার বিরোধী দলের মতো একটি দল যার মাধ্যমে শিক্ষিত জনসাধারণের অভিমত জানা যাবে। কিন্তু হিউম বা ডাফরিন উপলক্ষ্য মাত্র ছিলেন, প্রকৃত সত্য এই যে, ইতিহাসের গতিপথেই

সেদিন কংগ্রেসের আবির্ভাব হয়েছিল। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কতকগুলি স্তর থাকে এবং সেই স্তরগুলির মধ্যে একটির সঙ্গে অপরটির নিগূঢ় সংযোগ বা পারম্পর্য থাকে—থাকে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা যা কার্য-কারণের ভিতর দিয়ে অবশেষে একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতি লাভ করে। ইংরেজের ভারতশাসন নীতির ক্রমবিবর্তন ও সেই সঙ্গে দুর্জ্ঞেয় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক বিবর্তনের পথ দিয়েই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই দেশে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল, কারণ এই সময়টাই ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্রম-বিকাশের সময়। ভারতের রাজনৈতিক চেতনার আকাশ তখন থেকেই একটি বিশেষ আদর্শে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে থাকে।

১৮৮১ থেকে ১৮৮৫—ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় চারটি বছর। কলকাতায় ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং তার পরের বছরেই এই মহানগরীতে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক মহামেলা, তারপরেই মাদ্রাজের মহাজন সভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সভা এবং ১৮৮৫ সালের প্রারম্ভেই ফিরোজ শা মেটা, ত্র্যম্বক তেলাঙ ও আব্বাস তায়েবজী প্রভৃতির নেতৃত্বে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা—এই কয়টি ঘটনা থেকেই সেদিন বোঝা গিয়েছিল যে, ভারতবর্ষ একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুখ, চঞ্চল। এই যে বিভিন্ন ঘটনা এবং ঐতিহাসিক কার্য-কারণের সমাবেশ, কংগ্রেসের জন্মের এইটাই তো ছিল প্রত্যক্ষ কারণ—ডাফরিনের প্রস্তাব বা হিউমের ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন স্থাপনের পরিকল্পনা উপলক্ষ্য মাত্র। উত্তরে ও দক্ষিণে, পূবে ও পশ্চিমে ভারতবর্ষের সর্বত্রই তখন যুগপৎ জেগে উঠেছিল ঐক্যের চেতনা, ঝঙ্কৃত হচ্ছিল ঐক্যের বেদনা শিক্ষিত জনসাধারণের মনে। সেই চেতনা আর বেদনার পথ দিয়েই কংগ্রেসের আবির্ভাব। ডাফরিনের কূটবুদ্ধি সেদিন এই আবির্ভাবকে ব্যাহত করতে পারে নি।

এইবার আমরা 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দের কংগ্রেসীয় নীতির আলোচনার ধারা অনুসরণ করব। এই প্রবন্ধগুলি তিনি যখন রচনা করেন তখন কংগ্রেসের বয়স আট বছর চলছে। "আমি তখন কংগ্রেসের প্রতি অনুরক্ত ছিলাম" —প্রথম প্রবন্ধের এই প্রারম্ভিক কথাটি থেকে আমরা জানতে পারি যে বিলাতে ছাত্রজীবনেই তিনি ভারতের জাতীয় মহাসভা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। শুধু অবহিত থাকা নয়, অনুরক্তও ছিলেন। তাঁর বিলাতপ্রবাসের শেষ দুই বছরে তাঁর মন কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠতে থাকে। তারপর বরোদায় আসার পর সহপাঠী দেশপাণ্ডের কাছ থেকে যখন অনুরোধ এলো তাঁর পত্রিকায় কিছু লিখবার জন্য, তখন তিনি কংগ্রেস-রাজনীতির সমালোচনা করতে লেখনী ধারণ করলেন।

তাঁর দৃষ্টিতে অষ্টম বর্ষীয় কংগ্রেসের যে চরিত্র ধরা পড়েছিল প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে তিনি তাই আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। তাঁর বিবেচনায়ঃ ১. কংগ্রেস নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলতে পারে না—শাসকগোষ্ঠীকে অসন্তুষ্ট করতে ভয় পায়। ২. ভারতে ইংরেজশাসনকে কংগ্রেস ঈশ্বরের দান বলে মনে করে। ৩. কংগ্রেস একটি সভা মাত্র, এই সভা দেশের জন্য কোন কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করতে অক্ষম। ৪. কংগ্রেস কাজ করে না, শুধু কথা বলে। ৫. কংগ্রেস শুধু মধ্যবিত্তদের নিয়ে গঠিত হয়েছে; জনসাধারণকে স্পর্শ করতে বা তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি। ৬. শাসকবর্গের বিরুদ্ধে কড়া কথা বলা নিরর্থক; দুর্বলতা আমাদের বাইরে নয়, ভিতরে। আমাদের মধ্যে রয়েছে শুধু কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা, আর ভণ্ডামী। ৭. ৮. কংগ্রেস একটি প্রতিষ্ঠান, কোন বিগ্রহ নয়—অতএব একে ফুলচন্দনে পূজা করার কোন অর্থ হয় না; এর রীতিমত সমালোচনা দরকার। ৯. কংগ্রেসের আদর্শ ভুল, কর্মপদ্ধতি ভুল, এমন কি, এর নেতারা পর্যন্ত নেতৃত্বের অযোগ্য। ১০. কংগ্রেসকে 'জাতীয়' আখ্যা দেওয়া চলে না; কারণ এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে ভারতের জনসাধারণ বা তাদের প্রতিনিধি নেই। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি দলের 'বাৎসরিক সভার অনুষ্ঠান' মাত্র। ১১. কংগ্রেসের নেতারা ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং সেই আদর্শ ভারতবাসীর সামনে রেখে তাঁরা কংগ্রেসকে পরিচালিত করতে ব্যগ্র। কংগ্রেস নেতাদের অধিকাংশেরই চিন্তাধারায় কোন গভীরতা নেই; মৌলিকতা তো দূরের কথা। ১২. মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিচালিত কংগ্রেসের সমগ্র জাতি যে একটি জীবন্ত সত্তা, এমন ধারণা নেই।...কংগ্রেসের এই ভুঁইফোড় মধ্যবিত্তেরা না জানে রাজ্য-শাসনের কৌশল, না জানে স্বৈরাচারী শাসনকে যথাযথরূপে বাধা দেবার কৌশল; সে ক্ষমতা এদের নেই। ১৩. কংগ্রেসের নেতারা সর্বহারা নিম্নশ্রেণীকে উপেক্ষা করেছেন—যেন তারা কেউই নয়, কিছুই নয়। তাঁদের কিন্তু বোঝা উচিত যে, এরাই সব, এরাই সবকিছু—এই নিম্নশ্রেণীর হাতেই রয়েছে আমাদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার চাবিকাঠি। ১৪. কংগ্রেস উপেক্ষিত ভারতের নিম্নস্তরেব ক্ষুধিত সর্বহারার দল একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে এমন বিপ্লবের সূত্রপাত করবে, যার ফলে কংগ্রেস ও তার মধ্যবিত্তেরা কোথায় ডুবে, ভেসে, মুছে যাবে, তার চিহ্নমাত্রও থাকবে না।

এই হলো 'নিউ ল্যাম্পস ফর দি ওল্ড' প্রবন্ধাবলীর মোটামুটি কথা।

অরবিন্দের বয়স তখন মাত্র বাইশ বছর যখন তিনি এইগুলি লেখেন।

যাঁরা গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁর এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করেছেন, তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন যে কি মৌলিক আর যুক্তিপূর্ণ এই সমালোচনা। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনীকার যথার্থই মন্তব্য করেছেনঃ "অরবিন্দের চিন্তাধারা বুঝিবার পক্ষে 'ইন্দুপ্রকাশের' প্রবন্ধগুলিই যথেষ্ট। তাঁহার মনের পরিচয় আমরা পাই

এখানে। তাঁহার মানসিক বিকাশের ইতিহাসে এই প্রবন্ধগুলিই পাদপীঠ বলিয়া ধরা যায়। বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই তিনি কংগ্রেস ও তাহার নেতাদের সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনা নূতন, মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ এবং দূরদর্শিতার পরিচায়ক। আবার অনেকের মতে, ইহা সম্পূর্ণ বাস্তবতাহীন এবং কল্পনাপ্রসূত বলিয়া প্রতিভাত হইবে।"

তথাপি এই সমালোচনা বিচার্য।

অরবিন্দ তখন সন্ত বিলাত থেকে ভারতে এসেছেন। তাঁর পক্ষে ঐ অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সকল তথ্য অবগত হওয়া সম্ভব ছিল না, অথবা তিনি তার কোনও চেষ্টাও করেন নি। কংগ্রেসের জন্ম রহস্যের মূলে হিউমের শুভ কামনাই থাক অথবা ডাফরিনের গোপন হস্তই থাক, এর পিছনে যে ইতিহাসের নেপথ্য বিধান ছিল এবং কংগ্রেসের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে রাজনৈতিক নব-জাগরণ দেখা দিয়েছিল তার যে একটা বুদ্ধিভিত্তিক পটভূমিকা ছিল, অরবিন্দ সেটি অনুভব করতে পারেন নি। পৃথিবীর সকল দেশের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে, কোন রাজনৈতিক চেতনার পিছনে বুদ্ধির খেলা থাকবেই অর্থাৎ তার একটা ইনটেলেকচুয়াল পটভূমি থাকা প্রয়োজন। ইংরেজ শাসনের আদিপর্ব থেকে যখন এদেশে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত তখন থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসার ফলেই এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ হতে দেখা যায়। গোটা উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের রাজনীতি ও সাহিত্যের উপর দিয়ে একটা উদারনৈতিক ভাবের প্রচণ্ড তরঙ্গ প্রবাহিত হতে দেখা যায়। ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের তটদেশে সেই তরঙ্গই তো এসে আঘাত করেছিল। কাজেই কংগ্রেসের প্রথম শিলান্যাস যাঁরা করেছিলেন তাঁদের চিন্তার মধ্যে বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। অতএব কংগ্রেসের আদর্শ ভুল, কর্মপদ্ধতি ভুল ও এর নেতারা অযোগ্য—এমন সমালোচনা আদৌ বিচারসহ নয়।

জন্মের পর প্রথম আট বছর এই প্রতিষ্ঠানকে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের যোগ্যতা অরবিন্দ কোন্ মাপকাঠি দিয়ে বিচার করেছিলেন জানি না, তবে এঁদের মধ্যে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায়, বুদ্ধিতে ও দেশপ্রেমে অনেকেই যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের কথাই আগে বলি। আনন্দমোহন বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, লালমোহন ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ—এঁদের দেশপ্রেমে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে কি? তবে একথা ঠিক যে, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা থাকায়, আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমেই স্বদেশবাসীর জন্য কিছু কিছু রাষ্ট্রিক অধিকার এবং তৎপরে

* অরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ: রায়চৌধুরী।

ধীরে ধীরে স্বায়ত্ত-শাসন আদায় করে নেবার চেষ্টাতেই কংগ্রেসের প্রায় সর্বশক্তি নিঃশেষিত হতে থাকে। তবে মাত্র অষ্টম বর্ষীয় একটি শিশু-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ ছাড়া তখন আর করবারই বা কি ছিল? কিন্তু কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের (এই অধিবেশন হয় কলকাতায়) পর থেকেই বোঝা গেল যে, এই নবজাত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সত্যিই একটি জাতীয় মহাসভার রূপ ধারণ করতে চলেছে। শুধু তাই নয়। এই অধিবেশনে প্রদত্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (ইনি ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান) অভিভাষণ ও গৃহীত প্রস্তাবগুলি পাঠ করবার সুযোগ যদি অরবিন্দের থাকত তাহলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, বিলাতি আদর্শে গঠিত হলেও অখণ্ড ভারতের একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানরূপে কংগ্রেসের পরিণতি অবধারিত ছিল। তখনকার কংগ্রেসের চেহারা দেখে অবশ্য বুঝবার উপায় ছিল না যে, অদূর ভবিষ্যতে ইহা স্বাধীনতাকামী প্রগতিশীল ভারতীয় রাজনৈতিক দলের গৌরব লাভ করবে। বীজের মধ্যেই তো নিহিত থাকে একটি মহীরুহের সম্ভাবনা—সেই বীজের অঙ্কুরোদ্গম থেকে শুরু করে তার পরিণতির ইতিহাসটা অরবিন্দ যদি একটু কল্পনা করতে পারতেন তাহলে, আমাদের বিশ্বাস, তিনি কখনই এই নবজাত প্রতিষ্ঠানকে 'বাৎসরিক সভার অনুষ্ঠান' মাত্র বলে পরিহাস করতেন না। এখানে তাঁর সমালোচনার মধ্যে দূরদর্শিতার অভাব সুস্পষ্ট।

কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হয় মাদ্রাজে। এইবার কংগ্রেস প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার পথে পদক্ষেপ করে। রাজা স্যর তাঞ্জোর মাধবরাও এই কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। তখনকার দিনে তাঁর মতো রাষ্ট্রপরিচালনে সুদক্ষ ব্যক্তি ভারতে বিরল ছিলেন বললেই হয়। এই অধিবেশনে প্রদত্ত মূল সভাপতির ভাষণ ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহের বিবরণ লর্ড ডাফরিনকে বিচলিত করে এবং তিনি কংগ্রেসকে আক্রমণ করে প্রকাশ্যে এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে কংগ্রেসের সমর্থকগণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকগণের মনোভাব জানতে পারেন ও তখন থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে আমলাতন্ত্রের বিচ্ছেদটা পুরাপুরি আত্মপ্রকাশ করে। কংগ্রেসের এই মাদ্রাজ অধিবেশনে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি ঘোষণা করেছিলেন: "সব রকম অন্যায়, অবিচার ও সরকারী নৃশংসতার বিরুদ্ধে দাঁড়ান অথবা ব্যষ্টির স্বাধীনতা ও সাধারণ অধিকারকে সংরক্ষণ করা যদি রাজদ্রোহ হয়, তবে আমি একজন রাজদ্রোহী বলে গণ্য হলে খুশিই হব।" মাত্র তিন বছর বয়স্ক কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে নির্ঘোষিত এই বক্তৃতার বিবরণ অরবিন্দ যদি অবগত হতেন তাহলে তিনি কংগ্রেস নেতাদের সরাসরি 'কাপুরুষ' আখ্যায় অভিহিত করতে ইতস্তত করতেন।

অরবিন্দ ইংল্যাণ্ডের আদর্শ ভারতবাসীর সম্মুখে রেখে কংগ্রেসকে পরিচালিত

করার বিরোধী। তিনি মনে করেন ইংল্যাণ্ডের ধারা ও পদ্ধতি ভারতবাসীদের উপযোগী হবে না। তাঁর এই মন্তব্যও আদৌ যুক্তিসিদ্ধ নয়। যুক্তিসিদ্ধ নয় এই জন্য যে, জাতীয় মহাসভার উৎপত্তি ও ক্রমপরিণতির ইতিহাস পাঠ করলে পরে দেখা যাবে তার মধ্যে ইংল্যাণ্ডের আদর্শ ভারতবাসীর সামনে রেখে কংগ্রেসকে পরিচালিত করার কোন চিত্রই আমরা পাই না। আর যদি বা তর্কের খাতিরে অরবিন্দের এই উক্তি স্বীকার করা যায়, তথাপি সেই আদর্শটা যে ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধের বিকাশের পরিপন্থী ছিল তা তো মনে হয় না, অন্তত ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয় না। তিনি নিজেই তো চোদ্দ বছর ঐদেশে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করে এসেছিলেন ও তাঁর মানসবিকাশের পক্ষে ঐ আদর্শ থেকে তিনি কি কিছুমাত্র উপাদান লাভ করেন নি ?

শিক্ষিত ব্যক্তিরা সেদিন কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং এঁদের সঙ্গে ভারতের জনসাধারণের কোন যোগ নেই বলে কংগ্রেস একটি গোষ্ঠীবিশেষের সভা (যাকে দেশবন্ধু 'মেটা মজলিস' বলে পরিহাস করতেন) বলে অরবিন্দ অনুযোগ করেছেন। তাঁর এই অনুযোগও যুক্তিসিদ্ধ নয়। কেন, তা বলছি। এই প্রসঙ্গে ১৮৯০ সালের কলকাতা কংগ্রেসের কথা আমাদের মনে পড়ে। ঐ অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন ফিরোজ শা মেটা। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন : "নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে যতদিন না রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয় ততদিন শিক্ষিত ব্যক্তিরাই তাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন—ইহাই ইতিহাসের শিক্ষা।" জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা একদিনে জাগ্রত হয় না, এজন্য সময় দরকার। এই সরল সত্যটি অনেকেই অনুধাবন করতে চান না বলে কংগ্রেসের শ্রেণী-চরিত্র সম্পর্কে অযথা বিরূপ মন্তব্য করে বসেন। অরবিন্দও তাই করেছেন। একটা পরাধীন জাতি একদিনেই স্বাধীনতা লাভ করে না, এর জনগণ একদিনেই রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে না। জাতি ধীরে ধীরেই উন্নতির পথে অগ্রসর হয় ও স্বাধীনতা লাভ করে। ইহাই ইতিহাসের চিরন্তন নিয়ম। অরবিন্দ স্বয়ং তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে এই নিয়মের ফল প্রত্যক্ষ করে গিয়েছেন। তেমনি 'ইংরেজ জাতির কোন উচ্চ আদর্শ নেই, কোন বৃহৎ কল্পনা নেই'—তাঁর এই উক্তিটিও আমরা গ্রহণ করতে অক্ষম। ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত অরবিন্দের লেখনী থেকে এই জাতীয় উক্তি আমরা কখনই প্রত্যাশা করি না। কংগ্রেসী নীতি সম্পর্কে তাঁর অন্যান্য অভিমতগুলি আমরা সমর্থন করি।

এইবার অন্য বিষয়ের অবতারণা করা যাক।

'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় একাদিক্রমে সাত মাস ধরে অরবিন্দ এই প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন। তাঁর এই প্রথম রাজনৈতিক রচনার মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক মতামত-

গুলি স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর না করে আত্মপ্রয়াস করা, সকল কাজে ঐকান্তিকতা আনা আর আভ্যন্তবিক শক্তি সঞ্চয় ও চরিত্রগঠনের দিকে তিনি খুব বেশি জোর দিয়েছেন। একদিকে ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার আর অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে নরমপন্থীদের পঙ্গু প্রযাস তাঁকে স্বভাবতই অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। তাই তিনি তাঁর যৌবনদৃপ্ত জ্বালাময়ী ও তীক্ষ্ণধার অপূর্ব বাক্যযোজনার দ্বারা চরমপন্থী দেশপ্রেমের প্রযোজনীযতার কথা এই প্রবন্ধগুলির মধ্যেই বলেছেন দেখা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে তখন তিনি বরোদা মহারাজের চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন বলে নিজের নামে প্রকাশ না করে বেনামীতেই প্রবন্ধগুলি 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় লিখেছিলেন। সেই অগ্নিগর্ভ লেখনীর কয়েকটি মাত্র প্রবন্ধেই চারদিকে একটা সাড়া পডে গেল। স্বনামধন্য মহাদেব গোবিন্দ র্যাণাডে তখন বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি। ইনি দেশপ্রেমিক ও গোখেলের দীক্ষাগুরু ছিলেন। পত্রিকা-সম্পাদকের কাছ থেকে র্যাণাডে যখন জানতে পারলেন এই প্রবন্ধগুলির লেখকের নাম, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করবার জন্য অরবিন্দকে অনুরোধ করেন। পরবর্তী কাহিনী শ্রীঅরবিন্দের জবানীতেই শোনা যাক:

"মনে পড়ে, আমি পনের বৎসর আগে বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া যখন বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায কংগ্রেসের নিবেদন-নীতির তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিযাছিলাম, তখন স্বর্গগত মহাদেব গোবিন্দ র্যাণাডে যুবকদের মনে এই প্রবন্ধগুলির ফল হইতেছে দেখিযা, তাহা রদ করিবার উদ্দেশ্যে, আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইবামাত্র আধ ঘণ্টা পর্যন্ত এই কার্য পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কোন কার্যভার গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। তিনি আমার উপর জেল-প্রণালী সংশোধনের ভার দিতে ইচ্ছুক হইযাছিলেন। র্যাণাডের অপ্রত্যাশিত উক্তিতে আমি আশ্চর্যান্বিত ও অসন্তুষ্ট হইযাছিলাম।"*

বোঝা গেল, কংগ্রেসী নীতির তীব্র সমালোচনাপূর্ণ অরবিন্দের এই প্রবন্ধগুলির ফল ফলেছিল ও বোম্বাইয়ের যুবকদলের মন ঐ অগ্নিগর্ভ রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর হয়ত আরো লিখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু র্যাণাডের কথায় তিনি মাঝপথে ঐ 'জ্বালাময়ী' লেখা বন্ধ করে দেন ও ঐ একই কাগজে বিষয়ান্তরে তাঁর লেখনী চালনা করতে থাকেন। তাঁর এই পর্যায়ের রচনার মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো 'বঙ্কিমচন্দ্র'। এটিও বেনামীতে প্রকাশিত হয় ধারাবাহিকভাবে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এইটির কথা আলোচনা করব।

---

* কারাকাহিনী: শ্রীঅরবিন্দ।

॥ এগারো ॥

'মরুতে ফুটাল কেবা রক্তিম গোলাপ,
গন্ধে কে শুনেছে এত মধুর আলাপ ?"

২৬শে চৈত্র, বাংলা ১৩০০ সন।

ইংরেজি ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪।

ঐদিন অপরাহ্ন বেলায় বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হলো।

বরোদায় বসে সেই সংবাদ শুনলেন অরবিন্দ। এর সপ্তাহকাল পরেই তাঁর লেখনী থেকে উৎসারিত হলো কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে বঙ্কিম-প্রতিভার মূল্যায়ন। এই প্রবন্ধ সাতটি প্রকাশিত হয় 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায়। লেখক তখন নিজের নামটি প্রকাশ করেন নি। অরবিন্দ চিরকালই এই রকম আত্মপ্রচার বিমুখ। তাঁর চিন্তায় ও চেতনায় বঙ্কিমচন্দ্র তখন কতখানি স্থান জুড়ে ছিলেন তারই সুস্পষ্ট নিদর্শন এই প্রবন্ধগুলি। এ কথা মিথ্যা নয় যে, দেশপ্রেমের সেই দিব্য মন্ত্রটি—'বন্দেমাতরম্'—তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার সময় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা কিছু পাঠ করেছিলেন বলে জানা যায়। পরে বরোদায় কর্মজীবনের অবসরে নতুন করে বাংলা ভাষা শিখবার কালে তিনি আরো অন্তরঙ্গভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি বঙ্কিমভাবের ভাবুক হয়ে উঠেছেন বলা যায়। এই প্রবন্ধ সাতটি ভিন্ন, বঙ্কিমের উপর লেখা তাঁর দুইটি সুন্দর কবিতাও আছে, প্রথমটি ছোট, দ্বিতীয়টি দীর্ঘ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবমূর্তির একটি মর্মস্পর্শী আলেখ্য পাই দ্বিতীয়টির মধ্যে, তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো :

প্রস্ফুটিত কণ্ঠে যার মূর্ত তব আত্মার আভাস,—
হারালে কেমনে তারে? পুষ্পধ্বজ ওগো মধুমাস।
তোমার প্রাণের নিধি,—কুহুধ্বনি মধুপ-গুঞ্জন,
কুসুমিত দ্রুম দল, স্নিগ্ধ হাওয়া জিনিয়া চন্দন,
সুজলা তটিনী আর সুফলন্ত ক্ষেত্র ঘনশ্যাম,
ভাষায় যে আঁকিয়াছে একে একে মূর্তি এ সবার,—
রচিয়াছে ভাবস্বর্গ মহীয়ান্ মধুর উদার,—

নরের হৃদ্গত যত গ্রন্থে যে রেখেছে গেঁথে গেঁথে,
নারীর মধুর দিঠি, ইন্দ্রজাল—মায়াজাল পেতে
মায়াবী সে মঞ্জুবাক্! গন্ধরাজ চম্পার সৌরভ
ছত্রে ছত্রে ছড়ায়েছে; ছত্রে ছত্রে হয় অনুভব
রমণীয়া রমণীর কঙ্কণের সুরম্য ঝঙ্কার;
পত্রে পত্রে চিত্রিয়াছে বাঙালির বিচিত্র সংসার
গৃহ-গৃহস্থালি-সুখ, যে দেখে সে মুগ্ধ হয় মনে,
গ্রীষ্ম, শীত, রাত্রি, দিবা—সব আছে এ নব সৃজনে।
বান্ধবী কল্পনা-ছবি বাস্তবেরে করেছে মলিন
আত্মীয়ের চেয়ে প্রিয় পুঁথির যে অক্ষরে নিলীন।

... ...

হে বঙ্গের জল স্থল! হে চির সুন্দর! সুশোভন!
মধুর তোমরা সবে; মধুময় দক্ষিণ পবন—
বঙ্গের নিকুঞ্জ বনে,—পিক কণ্ঠে আছে মধু, জানি,
তা হতে অধিক মধু মঞ্জুবাক্ বঙ্কিমের বাণী।
বঙ্কিমের হিয়া সে যে সুবিশাল বঙ্গেরি হৃদয়,
দেখেছে সে দেবীমূর্তি স্বদেশের অব্রণ অক্ষয়।
বঙ্গের বঙ্কিমচন্দ্র!—নৃমণি সে ছিল নরকুলে,
খড়্গ তার তীক্ষ্ণধার সাজাইয়া দিয়াছিল ফুলে
সৌন্দর্য দেবতা নিজে। জন্ম লভি শুষ্ক দুর্বৎসরে
নিরানন্দ ফিরেছে সে সৌম্য মূর্তি; মরুভূমি 'পরে—
হৃদি-পদ্ম জিনি' রাঙা ফুটায়েছে অজস্র গোলাপ,
গন্ধে অনবদ্য করি' সেতারে সে করেছে আলাপ।*

পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত কংগ্রেস সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে ছিল অরবিন্দের অন্তরের প্রোজ্জ্বল অগ্নির লেলিহান দীপ্তি, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে আমরা প্রজ্ঞা-ঋদ্ধ একটি অপূর্ব মানসের সাক্ষাৎ পাই। দুটি আলোচনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় পার্থক্য এই। বঙ্কিমের সমকালীন বাংলার মানসলোক সম্পর্কে অরবিন্দ যে কতখানি পরিচিত ছিলেন, তার প্রদীপ্ত স্বাক্ষর আছে এই প্রবন্ধ কয়টির মধ্যে। সাতটি প্রবন্ধে সমাপ্ত এই আলোচনার ক্রমটি ছিল এই রকম: ১. বাল্যকাল ও পাঠ্যজীবন। ২. বঙ্কিমের যুগের বাংলা। ৩. বঙ্কিমের চাকরি-জীবন। ৪.

---

* অনুবাদ: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বঙ্কিমের বহুমুখী প্রতিভা। ৫. বঙ্কিমের সাহিত্য জীবনের ইতিহাস। ৬. বাংলার জন্য বঙ্কিম কি করেছেন। ৭. আমাদের ভবিষ্যৎ আশা। 'জনৈক বাঙালি'—এই স্বাক্ষরে প্রবন্ধগুলি যখন 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন বাংলাদেশের খুব কম লোকই তার সন্ধান রাখত। কারণ ঐ পত্রিকাটির এই অঞ্চলে তেমন প্রচার ছিল না। তাছাড়া, বরোদার এই নিরীহ অধ্যাপক ও নির্বাক মানুষটি সম্পর্কে তাঁর স্বজাতির মনে তখনো পর্যন্ত তেমন কৌতূহল জাগ্রত হয় নি, বললেই হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'ইন্দুপ্রকাশের' প্রবন্ধগুলি সর্বপ্রথম সংগ্রহ করেন ক্ষিতীশচন্দ্র সেন, আই.সি.এস.। ইনি যখন বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন তখন অবলুপ্ত পত্রিকাটির পুরাতন ফাইল থেকে তিনি এই মূল্যবান রত্ন উদ্ধার করেছিলেন। এজন্য বাঙালিমাত্রেই তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যুর সাত বছর পরে পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে বাংলায় অনূদিত হয়ে 'বঙ্কিমচন্দ্র' এই নাম দিয়ে তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের এই রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আরো আলোচনা করেছেন, কিন্তু প্রাথমিক রচনা হিসাবে তাঁর এই প্রবন্ধগুলির একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। আলোচনার ক্রমগুলি লক্ষ্যণীয়। তিনি বঙ্কিম-জীবন, বঙ্কিম-যুগ ও বঙ্কিম-মানস—এই তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন অরবিন্দ এবং ঐ সাহিত্যের সমালোচনা-রীতির সঙ্গেও তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর এই আলোচনার মান যে উচ্চস্তরের, তা বলা বাহুল্য।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি থেকেই বক্তব্য শুরু করি।

অরবিন্দ লিখছেন: "যে সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে এসে বঙ্কিম মানুষ হয়ে উঠলেন, সে হলো উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের নব-জাগ্রত বাংলার নবযৌবনের অবস্থা, নতুনভাবে উদ্দীপিত, নতুন প্রেরণায় উল্লসিত; এমন একটা উৎসাহপূর্ণ যুগ ভারতে বোধ করি আর কখনো আসেনি। তখনকার ভারতে বাংলাই ছিল জাগরণ-বিকাশের প্রধান রঙ্গভূমি, পুনরভ্যুত্থানের ক্রিয়া এখানেই প্রথম স্বল্প-পরিধির মধ্যে তখন সবে শুরু হয়েছে।...প্রথমে রামমোহন আবির্ভূত হলেন তাঁর নতুন ধরণের ধর্মবার্তা নিয়ে, তারপরে সেই বার্তা আরো খরতরভাবে প্রচারিত হতে থাকল এমন সব ব্যক্তির দ্বারা, যাঁরা তাঁর চেয়ে কোন অংশে ছোট নন, যেমন রাজনারায়ণ বসু ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভাষার দিক দিয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ও মধুসূদন দত্ত, এঁরা দুজনে দুই দিক থেকে নতুন ধরণের গদ্য পদ্য রচনা করতে শুরু করলেন। তখন এলেন বিদ্যাসাগর, বিদ্যায় বুদ্ধিতে ও প্রজ্ঞায় যাঁকে বলতে হয় বাংলার ছত্রপতি, বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে আবার নতুন করে গড়বার জন্য যেন অসুরের মতো তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করলেন। এদিকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে এমন

বিরাট হয়ে উঠলেন যে, কোন তুলনাই তাঁর দেওয়া যায় না।…এঁদের প্রত্যেককেই বলা যেতে পারে প্রতিভার প্রতিমূর্তি।"

নবজাগরণের পুরোধাগণের উল্লেখ করলেন এখানে অরবিন্দ—এঁরা সবাই ছিলেন বঙ্কিমের পূর্বসূরী। বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের কোলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে যুগের পরিবেশ থেকে তিনি আলো ও উত্তাপ দুই-ই পেয়েছিলেন, সেই যুগের আদি নির্মাতাদের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করার পর সেই যুগের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখছেন: "ঐ সময়টিতে আরো দেখা গেল যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সঙ্গে এখানেও এক নবভাবের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা অঙ্কুরিত হচ্ছে। নবশক্তি স্ফুরণের এইসব নানা শাখার মধ্যে বাঙালির মন বিশেষ করে প্রবল বেগে ধাবিত হলো সাহিত্যের খাতে।… ভাষার দিকে ছিল তাদের একটা প্রকৃতিগত প্রাণের টান। এ ছাড়া আরো একটা কথা এখানে ভুলে গেলে চলবে না। আমাদের দেশে যে পুনরভ্যুত্থান দেখা গেল, তা এসেছিল ইউরোপের ইতিহাসের পুনরভ্যুত্থানের আদর্শ থেকে আগেকার যুগের যত গতানুগতিক নীতিকে নাকচ করে দিয়ে। সেই নিরীহ, নির্বিরোধ, ভক্তিবাদী ও কর্তব্যবাধ্য হিন্দু আদর্শকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বাঙালি যেন তার অনেক কালের মরচেপড়া লৌহনিগড় থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেল, তার বরফ-জমা রক্তধারা যেন আবার স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হতে শুরু করল, মুক্ত জগতের মুক্ত বায়ু সেবন করে তাই যেন সে নতুন করে নিজের প্রাণের স্বাভাবিক স্ফূর্তি ফিরে পেল। সেদিনের তরুণ বাঙালিরা দেখলে যে, জীবনকে আনন্দ দেবারও অনেক জিনিস আছে, বস্তুত জীবন হলো এক পরম সৌভাগ্য।"

বাংলা ও বাঙালি সম্বন্ধে অরবিন্দের মনের কথা জানবার পক্ষে এই কয়েক ছত্রই যথেষ্ট। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, বাল্যকাল থেকে যৌবনের উন্মেষকাল পর্যন্ত যিনি বিলাতে অতিবাহিত করেছেন, সেই মানুষটি তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে এতখানি ওয়াকিবহাল হলেন কি করে? দেশে থেকেও তো তাঁর স্বদেশবাসীর অনেকেই দেশকে এমনভাবে চিনতে বা বুঝতে পারেন নি। বাংলার নবজাগৃতির পাদপীঠ হিন্দু কলেজের উল্লেখও করেছেন অরবিন্দ, বলেছেন, হিন্দু কলেজ নবযুগের নার্সারী। চমৎকার উপমা। এই পরিবেশ থেকেই বঙ্কিম-প্রতিভা প্রাণরস আহরণ করে পরিপুষ্ট হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি যত্ন সহকারে পাঠ করলেই দেখা যাবে যে ঐ বয়সে বাংলা দেশকে অরবিন্দ কী অন্তরঙ্গভাবেই না জানতেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার এও একটা দিক।

চতুর্থ প্রবন্ধটিতে তিনি লোককান্ত সাহিত্য-স্রষ্টার সর্বতোমুখী প্রতিভার একটি

চমৎকার বিশ্লেষণ দিয়েছেন। বঙ্কিম সাহিত্য-নিয়ে উত্তরকালে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বহু বিদগ্ধ সমালোচক আলোচনা করেছেন, কিন্তু বঙ্কিমের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে একজন সদ্য বিলাতফেরৎ বাঙালি সন্তান যা লিখেছিলেন, আশ্চর্যের বিষয়, আজো তার মূল্য কিছুমাত্র হারায়নি। অরবিন্দ লিখছেন: "বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম, তাই তাঁর ছিল বহুমুখী প্রতিভা, তা সব দিক দিয়েই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশও পেয়েছিল। একটিমাত্র মগজের মধ্যে তাঁর প্রতিভার সকল গুণ এক-সঙ্গে ঠাসা ছিল, তাই একাধারে তিনি ছিলেন পণ্ডিত, কবি, প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, আইনজ্ঞ, সমালোচক, দক্ষ শাসক, ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও ধর্ম-সংস্কারক। · কিন্তু এমন বহুমুখী প্রতিভা থাকলে আমরা কি করতাম? তারই গর্বে বিস্ফারিত হয়ে আমরা সকল দিক দিযে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে কি অসঙ্কোচে সকল ব্যাপারেই বিদ্যা জাহির করতে যেতাম? তাতে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হতো বটে, কিন্তু সেটা নিতান্তই ভুল কাজ করা হতো। বঙ্কিম এতটা ভুল কাজ কিছু করেন নি। তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কেবল সাহিত্যে, একথা তিনি খুবই জানতেন। দর্শনতত্ত্বও তাঁর প্রিয় ছিল, কিন্তু তাই নিয়ে লিখেছেন তিনি মাত্র শেষ জীবনে। যা কিছু পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক জ্ঞান তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন সমস্তই কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁর অনুপম সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে, জগতের সকল শ্রেষ্ঠ লেখকই যা করে থাকেন।...তিনি আপন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই সবকিছুকে সীমাবদ্ধ রাখলেন। নিজের ভূমি ছেড়ে অন্য ভূমিতে বিচরণ করতে কথনই তিনি যান নি।"

বঙ্কিম-প্রতিভার এই যে বৈশিষ্ট্য—তিনি কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি—এই মূল্যায়ন, মনে হয়, অরবিন্দের পূর্বে আর কোন সমালোচক দিতে পারেন নি। বাঙালির সৌভাগ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র, সমকালীন ভারতের অন্য দু'একজন প্রতিভাবান লেখকদের মতো, অযথা তাঁর শক্তিক্ষয় করেন নি আর মাতৃভাষা ছিল তাঁর মাধ্যম আর তাঁর প্রতিভা নিয়োজিত হয়েছিল একমাত্র সাহিত্য সৃষ্টির দিকেই। সবশেষে অরবিন্দ লিখছেন: "বঙ্কিমের যে অসাধারণ মৌলিকত্ব ছিল তা যে কোন দিক দিয়েই হোক ফুটে বেরিয়ে আসত। তবে তাঁর জীবনে চাকরির বাধ্যতা না থেকে যদি তিনি নির্বিবাদে এই কাজ করে যাবার অবসর পেতেন, তাহ'লে এর চেয়েও আরো কত বহুমূল্য জিনিস তিনি যে আমাদের দিয়ে যেতে পারতেন সে কথা মনে করলে দুঃখ হয়। প্রায় চল্লিশটি বছরের সাহিত্যসেবার ফলে তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন দশখানি উপন্যাস, ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ-পুস্তক, এবং আরো কিছু অন্যান্য ধরণের সাহিত্য।

তাঁর এই অবদানগুলি সংখ্যায় কম হলেও ওজনে ভারী খাঁটি সোনা।...খাঁটি সোনা মেলে মাত্র বিশেষ বিশেষ জায়গাতে আর তাও অতি অল্প পরিমাণ।"

খাঁটি সোনা!

বঙ্কিম-প্রতিভার এমন বিশ্লেষণ আজ পর্যন্ত কয়জন সমালোচক করতে পেরেছেন, জানিনা। আর বঙ্কিম-সাহিত্যের সঙ্গে কতখানি অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকলে পরে সমালোচক এমন একটি সন্দেহাতীত স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, অরবিন্দের এই প্রবন্ধটি বোধ করি তার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অরবিন্দ-মানসে যে এই খাঁটি সোনার স্পর্শ লেগেছিল তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার মধ্যেই তো তার স্বাক্ষর আছে। এই হিসাবে অরবিন্দকে আমরা বঙ্কিম-চন্দ্রের দ্বিতীয় ভাবমূর্তি বলতে পারি। তাঁর মানস-জীবনে বঙ্কিম-প্রতিভার হীরক-দ্যুতি যে কতখানি জমাট বেঁধেছিল তা আমরা পরে দেখতে পাব।

পঞ্চম প্রবন্ধটিতে আছে সেই লোকোত্তর প্রতিভার পটভূমিকা।

এই পটভূমিকা অঙ্কনেও লেখক তাঁর সর্বাত্মক ধারণার একটি সুডৌল পরিচয় রেখেছেন। বঙ্কিমের সাহিত্য-জীবনের ইতিহাসের রূপ-রেখা আঁকতে গিয়ে অরবিন্দ লিখছেন যে, তাঁর ছাত্রাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন ঈশ্বর গুপ্তের কাগজে কবিতা লিখে হাত মক্স করলেন, তখন "তাঁর মৌলিক ধরনের রচনাদি দেখে সূক্ষ্মদর্শী ঈশ্বর গুপ্ত এই অপরিচিত ছাত্রটির মধ্যে প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় পেয়ে যান।" তারপর লেখক বলছেন: "মধুসূদন যে ভুল করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র গোড়ায় সেই একই ভুল করে-ছিলেন—ইংরেজি রচনার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পরে মধুসূদনের মতোই তিনি নিজের ভুল নিজে বুঝলেন। তিনি বুঝলেন, প্রত্যেকে যেমন কথা বলার বেলাতে স্বাভাবিকভাবে শেখা নিজের মাতৃভাষাতেই সবচেয়ে সহজে বলতে পারে, তেমনি লেখার বেলাতেও সেই ভাষাতেই সে নিজেকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারে, তাতেই সে পরিপূর্ণভাবে ও জোরের সঙ্গে নিজের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে পারে।...বঙ্কিম ও মধুসূদনের যথেষ্ট মৌলিকতা থাকা সত্ত্বেও ইংরেজিতে লিখতে যাওয়া যে ভুল—এ কথা দুজনই বুঝতে পেরেছিলেন।"

যিনি এই কথা বলছেন, আশ্চর্যের বিষয়, সেই অরবিন্দের বিপুল পরিমাণ সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে ও বহুবিধ রচনার মধ্যে, তাঁর মাতৃভাষায় লেখা রচনার পরিমাণ অতি সামান্য বললেই হয়। এ একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য। বাঙালি অরবিন্দ বাংলা ভাষায় তাঁর প্রতিভার উল্লেখযোগ্য কোন পরিচয়ই রেখে গেলেন না। তা যদি সম্ভব হতো, তাহলে, তাঁর নিজের কথাতেই বলি, "আমাদের কাছে তা এক অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকত।" বঙ্কিমের রচনার স্বল্পতার কথা এই প্রবন্ধেও তিনি দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন এবং পুনরায় তাঁর উপন্যাস দশটিকে দশটি অমূল্য রত্ন বলে স্বীকৃতি

দিয়েছেন এবং বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গেই সিদ্ধান্ত করেছেন এই বলে: "দশজন পৃথক পৃথক খ্যাতিমান পুরুষের সম্মিলিত খ্যাতির চেয়েও বঙ্কিমের একার খ্যাতি তাতেই অনেক বেশি, এবং সে খ্যাতি চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।"

এই প্রবন্ধের উপসংহারে বঙ্গিমের রচনাশৈলীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অরবিন্দ লিখেছেন যে, এই কাজটাকে তাঁর পক্ষে তিনি ধৃষ্টতা বলে মনে করেন। অতবড একজন সুপণ্ডিত ও সাহিত্যরসিক সমালোচকের পক্ষে এই উক্তি তাঁর মহত্ত্বেরই পরিচায়ক বলে আমরা মনে করি। বঙ্কিম-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সুষমার কথা আলোচনা করতে গিয়ে অরবিন্দ লিখছেন: "তাঁর লেখার ভিতরকার যে অনবদ্য সৌন্দর্য, তাঁর ভাষার ছন্দে একাধারে যে দৃপ্ত বীর্য ও পরিপাটি মাধুর্য, আমার লেখনীর ভাষা তার সম্যক পরিচয় দিতে সক্ষম নয়। কেবল এইটুকুই আমি বলতে পারি যে, বঙ্কিমের নিখুঁত গভীর সৌন্দর্যবোধই তাঁকে সকলের চেয়ে বড করে তুলেছে।...কল্পনার ফুল ফোটানোর দিক দিয়ে কিম্বা মানুষের হৃদয়-মাধুর্য প্রকাশের দিক দিয়ে তখনকার দিনেব 'শকুন্তলা' থেকে আমরা যতখানি আস্বাদ পেযেছি, এখনকার বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা' ও 'বিষবৃক্ষের' মধ্যে তার চেয়ে কিছু কম নেই।"

দেখা গেল সাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনার প্রয়োজন আছে। আরো দেখা গেল তিনি যেমন বঙ্কিম-সাহিত্যের একজন রসজ্ঞ পাঠক ছিলেন তেমনি অরবিন্দ তাঁর বরোদা-জীবনে ঐ সময়ের মধ্যেই মহাকবি কালিদাসের সৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গেও সুপরিচিত হয়েছেন। ভারতবর্ষে এসে তিনি যত্নের সঙ্গে বাংলা ভিন্ন মারাঠী, গুজরাটি প্রভৃতি যে কয়টি ভারতীয় ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেছিলেন সেগুলির মধ্যে মনে হয় প্রধান স্থান নিয়েছিল সংস্কৃত। কারণ ভারত-আত্মার মর্মের সন্ধান নিতে হলে এই সোনার চাবীকাঠিটি দরকার।

সাহিত্যের দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্তির কথা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করার পর ষষ্ঠ প্রবন্ধে অরবিন্দ সেই কীর্তির ঐতিহাসিক মূল্যের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। তাঁর মতে, বঙ্কিমের প্রভাবেই বাঙালির জাতীয় জীবনে অনেকখানি পরিবর্তন এসেছে। আর এই পরিবর্তনের ফলেই বাঙালি একটা সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত হতে চলেছে। সপ্তম প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়: 'আমাদের ভবিষ্যতের আশা।' অরবিন্দ বলেন, বঙ্কিম-সাহিত্যে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েছে—তিনিই নিয়ে এসেছেন বিদ্রোহের যুগ। বঙ্কিমের জীবিতকালেই এই বিদ্রোহের লক্ষণ বাংলার সমাজ-জীবনের একাধিক ক্ষেত্রেই অভিব্যক্ত হতে দেখা গিয়েছে। অরবিন্দ অতি সুন্দর তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা প্রতিপন্ন করেছেন যে, কেশবচন্দ্রের 'ইয়ং বেঙ্গল' বঙ্কিমের যুগে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। বঙ্কিম-যুগের তরুণ দল বঙ্কিম-প্রদর্শিত জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। এই তরুণদের উপরেই নির্ভর করছে বাংলার

ভবিষ্যৎ—এই ছিল সেদিন অরবিন্দের সুস্পষ্ট অভিমত। এইভাবেই সেদিন অরবিন্দ এই প্রবন্ধ সাতটির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রকে দ্রষ্টা ও জাতির স্রষ্টা এবং ভাব-বিপ্লবের ভগীরথ-রূপেই তাঁর স্বজাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন। এর একটা উদ্দেশ্যও ছিল।

অধ্যয়ন, অধ্যাপনা আর সাহিত্যকর্ম।

এই নিয়ে আছেন অরবিন্দ বরোদায়।

একটি বর্ণাঢ্য শতাব্দীব অন্তিম প্রহরে, বাংলা দেশ থেকে বহু দূরে একটি শিক্ষিত, প্রগতিশীল মনোভাবসম্পন্ন এক সামন্ত নৃপতির রাজ্যে নিভৃতে আপন ভাবময় জগতে বাস করছেন আগামী দিনের যুগমানব শ্রীঅরবিন্দ। বিলাত থেকে কি মন নিয়ে তিনি ভারতে ফিরেছেন তারই একটা প্রথম আভাস আমরা পেলাম 'কংগ্রেস' ও 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ দুটির মধ্যে। তাঁর এই রচনা দুটিকে আমরা অরবিন্দের একটি খণ্ড আত্মচরিতও বলতে পারি। অরবিন্দ, আমরা আগেই বলেছি, বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। বিচিত্রকর্মা বিধাতাপুরুষ যে কী দুর্লভ উপাদান দিয়ে গড়ে এই মানুষটিকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, তা আজো অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তাই বুঝি যুগমানবের সেই সতর্ক বাণী: "আমার জীবন মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়।" তবু চেষ্টা করতে হবে আমাদের চিন্তা বুদ্ধি ও অনুভূতির বলয়ের মধ্যে সেই জীবনকে রেখে তার মর্মবাণী বুঝবার। আমরা দেখলাম পিতার মতো অরবিন্দ বিলাত থেকে সম্পূর্ণ ইংরেজ হয়ে ফিরলেন না। ইংরেজি সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে চৌদ্দ বছর বাস করে ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-গরিমায় আপাদমস্তক বিভূষিত হয়েও তিনি ষোল আনা ভারতীয় রয়ে গেলেন, রয়ে গেলেন খাঁটি বাঙালি। দেখলাম তাঁর কেমব্রিজের সহপাঠী দেশপাণ্ডের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় কংগ্রেস ও বঙ্কিমচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করে অরবিন্দ যেন নিজেই নিজের জীবনের পরিচয়টা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন।

তাই তাঁর এই প্রবন্ধ দুটি সম্পর্কে আরো দু'একটি কথা বলার আছে।

অরবিন্দের সমগ্র সত্তা কি রকম উগ্র জাতীয়তাবোধে পরিপূর্ণ তা তিনি অনাবৃতভাবেই তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে তাঁর এই প্রবন্ধ দুটির মাধ্যমে, এইটিই এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তিনি দেখালেন কংগ্রেসের ন্যাশনালিজম্ আর বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যাশনালিজমের মধ্যে রয়েছে কতখানি সূক্ষ্ম পার্থক্য। তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব যে, বঙ্কিমের আদর্শকেই তিনি ও ও তাঁর সতীর্থগণ কংগ্রেসের উপর স্থাপন করতে অভিলাষী ছিলেন। অরবিন্দ সেই বয়সেই তাঁর দূরদৃষ্টিবলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার তরুণ দল নতুন স্বদেশপ্রেমে জেগে উঠবে,

এবং স্বদেশের অতীত ও বর্তমান গৌরবকে ভক্তি করতে ও ভালবাসতে শিখবে। এদেরই উপর নির্ভর করছে ভারতের ভবিষ্যৎ, কংগ্রেসের উপর নয়। আমরা তাই দেখতে পাই যে, বিলাত থেকে ফিরে এসেই অরবিন্দ নির্ভীক চিত্তে ঘোষণা করছেন—"আমি বঙ্কিমের একজন অতিশয় গুণমুগ্ধ ভক্ত।" তাঁর এই উক্তিটির মধ্যেই আভাষিত হয়েছে তাঁর বাঙালি-প্রীতি। "তিনি বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত বাংলার প্রাণের পক্ষপাতী। এবং বাঙালিকে তিনি খাঁটি বাঙালি হইতে পরামর্শ দিতেছেন। ইহাই তাঁহার চরিত্রের এক অতি গৌরবময় উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য।" এই আত্ম-পরিচয়টুকুই অরবিন্দ রেখেছেন তাঁর ১৮৯৩-৯৪ সালে রচিত তাঁর এই সুচিন্তিত এবং মূল্যবান প্রবন্ধ দুটির মধ্যে। তবে বঙ্কিমের প্রতিভাকে কেন্দ্র করে ঐ সাতটি প্রবন্ধে অরবিন্দ বাংলার মনের ইতিহাসের যে অভিনব ব্যাখ্যা করেছেন তারই মধ্যে আমরা পাই বাঙালির ইতিহাসের মর্মকথা।

॥ বারো ॥

ইতিহাসের মঞ্চে আমরা সময় সময় আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করি।

এমনি একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল অরবিন্দ যখন বরোদায় বসে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় কংগ্রেস নীতির তীব্র সমালোচনায় তাঁর লেখনী চালনা করছিলেন। সেই চমকপ্রদ ঘটনার কেন্দ্র-পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। আর সেই ঘটনাটি হলো শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় তাঁর যোগদান। এই ধর্ম-মহাসভায় তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি। পৃথিবীর মোট দশটি প্রধান ধর্মের সমাগত প্রতিনিধি-গণের মধ্যে এই তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসীই সেদিন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ সালে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই ধর্ম-মহাসভার মঞ্চে যখন এই সন্ন্যাসীর জয়ডঙ্কা বেজে উঠেছিল, তার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল ভারতে। বরোদায় বসে অরবিন্দ নিশ্চয়ই তা শুনে থাকবেন। শুধু শোনা নয়, শুনে যারপর নাই বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে থাকবেন। সেদিন আমেরিকায় শিকাগো শহরে এই হিন্দুসন্ন্যাসী হিন্দুধর্মের যে বিজয়ভেরী নিনাদিত করেছিলেন, বেদান্তের উদারবাণী কম্বুকণ্ঠে যেভাবে ঐ দেশে প্রচার করেছিলেন, তেমন একটি ঘটনা ইতিহাসের মঞ্চে খুব বেশি ঘটতে দেখা যায় না। অরবিন্দের জীবননাট্যে একে একে আমরা যতগুলি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, তাদের মধ্যে বিবেকানন্দ অন্যতম। এই সন্ন্যাসীর কথা অরবিন্দ-প্রসঙ্গে অনেকবার আসবে, তাই এখানে তার প্রারম্ভিক উল্লেখমাত্র করছি।

তার আগে এই দুই যুগমানব সম্পর্কে, শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে ভারতে এই দুই যুগন্ধর পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের মনে একটা সঠিক ধারণা থাকা দরকার। এই প্রসঙ্গে একজন মনীষী লেখকের একটি সুচিন্তিত অভিমত এখানে উদ্ধৃত হলো। তিনি লিখেছেন: "অরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের কর্মক্ষেত্র পৃথক। অরবিন্দ রাজনীতির ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন, আর স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। এই দুই ইতিহাস-বরেণ্য শক্তিশালী পুরুষ একই সময়ে, একজন রাজনীতি আর একজন ধর্মকে আশ্রয় করিয়া ইতিহাসের পথে প্রথম পদক্ষেপ করিলেন।...দেশে ফিরিবার পাঁচ মাস পরেই অরবিন্দের চক্ষু ও মনের সম্মুখে আমেরিকাতে স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট অভ্যুদয় এক অতি আশ্চর্য ঘটনা বলিয়া যে প্রতীয়মান হইবে, তাহাতে সন্দেহ

নাই। এবং এই আশ্চর্য ঘটনা হইতে তিনি যে তাঁহার তরুণ মনের খাদ্য সংগ্রহ করিবেন, তাহাও সুনিশ্চিত।"

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের পর থেকেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে পট-পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি তার মূল কথাটা ছিল হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান ও এ্যাগ্রেসিভ হিন্দুধর্মের অভিব্যক্তি। এর প্রথম সূত্রপাত অবশ্য করেছিলেন অরবিন্দেরই মাতামহ রাজনারায়ণ বসু যিনি তাঁর এই দৌহিত্র সন্তানটির জন্মের ঠিক পূর্ব বৎসরে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' সম্পর্কে বক্তৃতা দেন এবং বিলাত থেকে অরবিন্দের ফিরবার ঠিক চার বছর আগে 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' আরো প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর স্বজাতির সামনে তুলে ধরলেন। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের জন্য পরবর্তীকালে যে আন্দোলন আমরা প্রত্যক্ষ করি তার সূত্রপাত কি রাজনারায়ণ করে যান নি? নিশ্চয়ই করে গিয়েছিলেন। মহামনীষা সম্পন্ন এই বৃদ্ধ হিন্দুটির জীবনকথাও অতি বিচিত্র—কৌতূহলী পাঠক সেটা তাঁর আত্মচরিত পাঠ করলে জানতে পারবেন। বিবেকানন্দ বয়সে অরবিন্দের মাতামহ অপেক্ষা অনেক ছোট ছিলেন, তথাপি বিবেকানন্দ তাঁকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন, তেমনি তিনিও এই তরুণ সন্ন্যাসীর প্রতিভার দৈবী-দীপ্তি দেখে আর তাঁর কণ্ঠের কেশরী-হুঙ্কার শুনে (যার সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল ১৮৯৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর শিকাগো শহরে প্রায় দশহাজার শ্রোতার সম্মুখে প্রদত্ত স্বামীজির 'হিন্দুধর্মের সার' শীর্ষক সেই বক্তৃতাটি।) তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ কয়েক দিনের জন্য দেওঘরে এসে রাজনারায়ণ বসুর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল ১৮৯৯-এর জানুয়ারি মাসে। এর পূর্বেও উভয়ের মধ্যে আরো কয়েকবার দেওঘরে সাক্ষাৎ হয়ে থাকবে। রাজনারায়ণ শেষ জীবনে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে এখানেই বাস করতেন।

আমরা কল্পনা করতে পারি, বরোদা থেকে গ্রীষ্মাবকাশে বা পূজার ছুটিতে অরবিন্দ যখন দেওঘরে আসতেন তখন তাঁর বৃদ্ধ মাতামহের সঙ্গে বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি নিশ্চয়ই আলোচনা করতেন। শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় তাঁর সেই ভেরী নিনাদের বছর ছয় পরের ঘটনা। ১৮৯৯, এপ্রিল মাস।

অরবিন্দ এলেন দেওঘরে। তিনি একদিন তাঁর মাতামহকে জিজ্ঞাসা করলেন, হিন্দুধর্মের মর্মকথা কি? রাজনারায়ণ ঈশোপনিষদের সেই 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং' শ্লোকটি উদ্ধৃত করে দৌহিত্রকে বুঝালেন যে, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখাই হিন্দুধর্মের পরম সত্য। এ সত্য পৃথিবীর আর কোন ধর্মে নেই।

—ধর্মে নেই, তবে সাহিত্যে আছে।

---

* শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ: রায়চৌধুরী।

—কোথায়? কার লেখায়?

—মেতারলিঙ্কের রচনায় পড়েছি, কাউকে ভালবাসতে হলে প্রথমে দরকার ভালবাসবার জন্য দৃষ্টি।

—ঠিক কথাই তো। যার দৃষ্টি আছে, সে-ই শুধু ভালবাসতে জানে।

—আচ্ছা দাদু, বাংলা দেশে এমন কেউ আছেন যাঁর কাছে এই আদর্শ সবচেয়ে বড়ো।

—হ্যাঁ, আছেন বটেন একজন।

—কী নাম তাঁর?

—স্বামী বিবেকানন্দ। তিনিই তো সেদিন আমেরিকায় গিয়ে হিন্দুধর্মের জয়ডঙ্কা বাজিয়ে এলেন। পড়ো নি সেই বক্তৃতা? পড়ো নি তাঁর ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর বক্তৃতাগুলি? বক্তৃতা তো নয়, যেন আগুন। তাঁর অন্তর থেকে উৎসারিত হয় বলেই তো তাঁর কথায় প্রাণে দোলা লাগে, রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে।

—দাদু, আপনি এঁকে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, অনেকবার তিনি আমার এখানে এসেছেন। এই তো গেল বছর আমার এখানে এসেছিলেন। তিন দিন ছিলেন। বারান্দার ঐ কোণটায় থাকতেন, নিজের হাতেই রান্না করে খেতেন। সন্ন্যাসী মানুষ কিনা।

—আমার তাঁকে একবার দেখতে খুব ইচ্ছা করে।

—তাই নাকি? ভাগ্যে থাকে নিশ্চয়ই দেখবে। তখন দেখবে তিনি ঠিক সাধারণ মানুষ নন—যেন একটা তেজ, একটা জ্যোতি, একটা দিব্য শক্তি। আমার কী মনে হয় জানো ভাই, বাঙালির বহুজন্মের পুণ্যফল, ইতিহাসের বহু সাধনার ধন এই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

—দাদু, তাঁর সম্বন্ধে আমায় কিছু বলুন। আমি কিছু কিছু তাঁর লেখা পড়েছি।

রাজনারায়ণ বলতে লাগলেন।

অরবিন্দ এক মনে শুনতে লাগলেন।

ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত এই সন্ন্যাসী কেবল কবির ভাবাবেগ দিয়ে তাঁর স্বজাতিকে ভালবাসেন নি। ভারতের পুনরুত্থান সম্বন্ধে তাঁর মনে লেশমাত্র সংশয় নেই। সন্ন্যাসী হলেও তিনি বিশ্বাস করেন না যে একের সাধনায়, একের যোগবলে অনেকের উন্নতি সম্ভব। সমষ্টির দ্বারা সমষ্টির মুক্তি—এই তাঁর সাধনা। সমস্ত ভারতবর্ষ তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। দেখেছেন দীন দরিদ্র অন্ত্যজ ও অজ্ঞদের কিভাবে পদদলিত করে রেখেছে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। তাঁর সেই চাবুক-মারা বক্তৃতা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।

বলতে বলতে বৃদ্ধ রাজনারায়ণ নীরব হলেন।

কিছুক্ষণ পরে আবার শুরু করলেন।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই দেশকে ভাল করিয়াই দেখিয়াছি। যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার চক্ষে নিদ্রা নাই। কন্যাকুমারীর মন্দিরের পাদদেশে, ভারতবর্ষের সর্বশেষ প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া আমার মনে এক নতুন পরিকল্পনার উদয় হইল। আমরা লক্ষ লক্ষ সাধু-সন্ন্যাসী লোককে ধর্ম শিক্ষা দিয়া বেড়াই—নিছক পাগলামী! খালি পেটে ধর্ম হয় না। দেশের ধনী ও অভিজাতবর্গ, পুরোহিত ও নৃপতিরা দরিদ্রের জন্য কিছু চিন্তা করিয়াছেন? তাঁহারা ইঁহাদের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের উপর প্রভুত্ব ও আধিপত্যের সৌধ গড়িয়াছেন। এইসব পদদলিত দরিদ্রের উদ্ধারের কথা কে চিন্তা করে? কয়েক হাজার গ্র্যাজুয়েট লইয়া একটা নেশন তৈরি হয় না। এই যে দেশের শতকরা নব্বুইজন লোকের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, শিক্ষা নাই—কে ইহা চিন্তা করে? দেশপ্রেমিক বাবুর দল?"

অরবিন্দ নিস্তব্ধভাবে বসে এক মনে মাতামহের মুখে শুনলেন বিবেকানন্দের অগ্নিময় বাণী। ভাবলেন—বাংলার শতজন্মের পুণ্যফলই বটে।

—আচ্ছা দাদু, দেশের পক্ষে এখন কি দরকার, এই বিষয়ে তিনি কিছু বলেছেন?

—বলেছেন বৈ কি। তাঁর লেখা থেকেই পড়ে শোনাই: "চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভরতা, সেই অটল ধৈর্য, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা। চাই—সর্বদা পশ্চাৎদৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ। আজ যেন আমরা এই প্রার্থনা করিতে পারি—হে ওজঃস্বরূপ। আমাদিগকে ওজস্বী কর, হে বীর্যস্বরূপ। আমাদিগকে বীর্যবান কর, হে বলস্বরূপ। আমাদিগকে বলবান কর।"

বৃদ্ধ রাজনারায়ণ চুপ করলেন।

তারপর তাঁর নীরব শ্রোতাটির প্রশান্ত মুখের দিকে, চোখের পানে তাকালেন।

বৃদ্ধের চোখ দুটিও যেন কী এক অভাবনীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, লক্ষ্য করলেন তাঁর দৌহিত্রটি। তারপর তিনি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন: জানিস অরো, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই সভ্যতার তুলনামূলক বিচার রাজা রামমোহনের পরে এ যুগে বিবেকানন্দের মতো আর কেউই করেন নি। তিনিই বুঝেছেন ও আমাদের সবাইকে বুঝিয়েছেন যে সাধক, বিজ্ঞানের সাধক, শক্তির সাধক পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের ভাব ও আদর্শের আদান-প্রদান ছাড়া এই দেশের উন্নতি অসম্ভব।

দাদামশাই বাজে কথা বলার মানুষ নন। তাই তাঁর মুখে বিবেকানন্দ সম্পর্কে এইসব কথা শুনে অরবিন্দের মনে আজ এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, সত্যিই তিনি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁর অন্তরে আগ্রহ জেগে উঠল এই বীর সন্ন্যাসীকে

একটিবার দেখার জন্য, তাঁর সঙ্গে দুটি কথা বলার জন্য। কিন্তু তিনি তো এখন ভারতবর্ষের বাইরে। ফিরে আসুন, তখন তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই একবার সাক্ষাৎ করবেন তিনি—স্পর্শ করবেন তাঁর প্রাণের প্রদীপ্ত উত্তাপকে। এইরকম চিন্তায় বিভোর যখন অরবিন্দ তখন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ গাঢ় কণ্ঠস্বরে বলছেন তাঁর আদরের দৌহিত্রটিকে: একটা প্রাণের কথা বলি। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি এইবার ভারতে ফিরে কর্মক্লান্ত এই সন্ন্যাসী শীঘ্রই দেহভার রক্ষা করবেন। তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করবে কে? আমার মন বলছে সেই মানুষ তুই। বিবেকানন্দের উত্তরাধিকারী আমার সামনেই বসে। আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখছি, সামনে যে ভবিষ্যৎ আসছে, ভারতের ইতিহাসে তেমন দিন বুঝি অনেক কাল আসেনি। সেদিন আমি থাকব না। কিন্তু ভবিষ্যতের সেই ভারতবর্ষ জন্ম নেবে তোরই ধ্যানে, তোরই কর্মে—এ আমি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলাম।

—আমারও সময় সময় তাই মনে হয়, দাদু। মনে হয় একটা বিরাট ভবিষ্যতের দিকে ভারতবর্ষ ছুটে চলেছে। কিন্তু ইতিহাসের অন্ধকার পথে আলোকবর্তিকা দেখাবে কে?

বৃদ্ধ চুপ করে রইলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী এইভাবে বিংশ শতাব্দীকে স্পর্শ করে গেল শেষবারের মতো। এর পাঁচ মাস পরেই ১৮৯৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যু হলো। নব্য-বাংলার অন্যতম স্রষ্টা রাজনারায়ণের মৃত্যুতে তাঁর দৌহিত্র একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন। এই সনেটটির নাম: 'মৃত্যু নয়, প্রস্থান'। মাতামহের প্রতি অরবিন্দের কী গভীর শ্রদ্ধা ছিল তারই অকপট অভিব্যক্তি এই কবিতাটি। উনিশ শতকের বাংলার এক মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব রাজনারায়ণ বসু। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সমাজজীবনের দুই তট দিয়ে জাতীয়তাবোধের যে উদ্বেলিত তরঙ্গ আমরা প্রবাহিত হতে দেখি, তিনিই ছিলেন তার অন্যতম স্রষ্টা। তাঁর জীবনের সঙ্গে তাঁর এই দৌহিত্রটির জীবনধারা মিলিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাব যে, কি উপনিষদের আলোচনায়, কি বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টায় অরবিন্দের মধ্যে তাঁর মাতামহ জীবিত ছিলেন। অরবিন্দের মানস জীবন গঠনে ঋষিকল্প এই মহাপুরুষের জীবনের প্রভাব অনেক দিক দিয়ে পরিলক্ষিত হয়।

পরে আমরা দেখতে পাব যে, রাজনারায়ণ-বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দের ভাবধারাকে আত্মসাৎ করে, স্বদেশী আন্দোলনের সেই প্রজ্বলন্ত যজ্ঞানল থেকে কেমন করে অগ্নিকমল হয়ে ফুটলেন অরবিন্দ আর সেই বিপ্লবী অরবিন্দ উত্তরকালে কেমন করেই বা বিকশিত হলেন শতদলবিশিষ্ট একটি জ্যোতির্ময় স্বর্ণকমলরূপে।

॥ তেরো ॥

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তখন একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিরাজ করছিলেন।

তিনি লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক।

অরবিন্দের জীবন-নাট্যে টিলক আর একটি চরিত্র যাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন তাঁর বরোদায় আসার অল্পদিন পরেই। টিলকের অনেক অনুগামী ছিলেন অরবিন্দেরই ছাত্র। কংগ্রেসের ইতিহাসে টিলক-অরবিন্দ একটি বিশেষ অধ্যায়। অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনকে জানতে হলে এই অধ্যায়টি জানা দরকার। দেশের মুক্তিসাধনের জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করবেন—এই সংকল্প নিয়েই অরবিন্দ বিলাত থেকে ভারতবর্ষে ফিরেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন:

"ইংল্যাণ্ডে থাকবার সময়েই আমি ঠিক করেছিলাম যে দেশের কাজে এবং দেশের মুক্তির জন্য আমি আমার জীবন সমর্পণ করব। এখানে ফিরে এসেই তাই আমি ছদ্মনামে সংবাদপত্রে রাজনৈতিক বিষয়ে লিখতে আরম্ভ করি। ঐসব রচনার উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতের জন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু তখনকার নেতাদের আমার লেখাগুলি পছন্দ হয়নি এবং তাঁরা আমাকে যথেষ্ট বাধাও দিয়েছিলেন যাতে আমি ঐ ধরনের লেখা আর না লিখি। আমাকে তাই বিরত থাকতে হয়। কিন্তু তাই বলে আমি আমার আদর্শ পরিত্যাগ করিনি অথবা ফলপ্রসূ কাজের আশাও ছাড়িনি। এই সময়ে আমার কেমব্রিজের সহপাঠী কে. জি. দেশপাণ্ডের অনুরোধে তাঁর কাগজে লিখতে আরম্ভ করি। প্রথম দুটো রচনাতেই রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো, র‍্যাণাডে ভয় পেলেন, ভয় পেলেন কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারাও। র‍্যাণাডে কাগজের কর্তৃপক্ষকে ভয় দেখালেন যে এই রকম লেখা যদি ছাপান হতে থাকে তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হবে। কাজেই এই পর্যায়ের প্রবন্ধ লিখবার যে পরিকল্পনা আমার ছিল তা সম্পাদকের অনুরোধে বন্ধ করে দিতে হলো। তবে তিনি আমাকে বললেন, আমি যেন একটু নরম সুরে লেখা চালিয়ে যাই। অনিচ্ছাসহকারে রাজী হলাম, আমার কিন্তু আর তেমন উৎসাহ রইল না, এবং উপর্যুপরি না লিখে মাঝে মাঝে লিখতাম। অবশেষে একেবারেই বন্ধ করে দিলাম।*

এ কথা হলো তাঁর পূর্বোল্লিখিত কংগ্রেস সম্পর্কিত সেই প্রবন্ধাবলী নিয়ে, যাকে উপলক্ষ্য করে শ্রীঅরবিন্দ ভারতের রাজনীতিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করতে

* অন হিমসেলফ: শ্রীঅরবিন্দ।

চেয়েছিলেন। তাঁর এই প্রবন্ধগুলি সেদিন একজনকে বিশেষভাবেই আকৃষ্ট করেছিল। তিনি লোকমান্য টিলক। বলাবাহুল্য, কংগ্রেস সম্পর্কে তিনিও অনুরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তাই 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সঙ্গে তাঁর চিন্তা-ধারার আশ্চর্য মিল দেখে টিলক যে অরবিন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সেই সময়ে, আমাদের এ অনুমান অসঙ্গত নয়। অরবিন্দ অবশ্য বরোদায় এসে অবধি নানা সূত্রে লোকমান্যের কথা, তাঁর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের কথা ও সর্বোপরি তাঁর দেশপ্রেমের কথা শুনেছেন। শুধু শোনা নয়, তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় টিলকের রচনা পাঠ করে অরবিন্দও যারপর নাই মুগ্ধ হয়েছিলেন। কাজেই সমমর্মি এই দুই দেশপ্রেমিক যে অচিরেই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবেন এবং সেই মিলন যে চিরস্থায়ী হবে আর উভয়ের মিলনের ফলে কংগ্রেস রাজনীতির যে রূপান্তর সাধিত হবে—এ যেন ইতিহাসেরই একটি অবধারিত বিধান ছিল। এই যুগমানবের চরিতালোচনায় টিলকের কথা আমাদের অনেকবার বলতে হবে। তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী রাজনৈতিক জীবনে টিলককে বাদ দিয়ে অরবিন্দের কথা আদৌ বলা যায় না। আপাতত আমরা প্রারম্ভিক উল্লেখ করলাম।

বস্তুত যে বিরাট ব্যক্তিত্ব আমাদের এই আলোচনার নায়ক, সেই ব্যক্তিত্বের দাক্ষিণে ও বামে বহু চরিত্রের ভীড় দেখা যায়—তাঁদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর জীবনের কোন না কোন অধ্যায় সম্পৃক্ত, এমন কি ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। কাজেই এক মাত্র অরবিন্দের কথা বললে জীবনচরিতের ধর্ম থেকে আমরা বিচ্যুত হব। কোন মানুষের জীবনই এককভাবে দেখা চলে না, বিচার করা তো দূরের কথা। প্রতিভা কেবলমাত্র পরিবেশের আবেষ্টন থেকেই প্রাণরস আহরণ করে না—তার আশে-পাশে যাঁরা থাকেন, যাঁদের জীবনের সঙ্গে তার যোগসূত্র বিদ্যমান, তাঁদের বাদ দিয়ে এ ঘটনার রঙ্গমঞ্চ থেকে একপার্শ্বে সরিয়ে রেখে শুধু একজনের উপর আলোক-সম্পাত করলে ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না। আর তা না থাকলে কারো জীবনচর্চা নিছক স্তুতিনিবেদনেই পর্যবসিত হতে বাধ্য। কাজেই অরবিন্দকে কেন্দ্রে স্থাপন করে, ঘটনা ও অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

বরোদা-জীবন অরবিন্দের মহাপ্রস্তুতির জীবন।

সেই নিরীহ, মিতভাষী ও নির্বাক প্রকৃতির মানুষটিকে বাইরে থেকে বুঝবার সাধ্য ছিল না যে কী বিরাট ভবিষ্যতের জন্য তখন তিনি নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন একমনে। মহারাজা স্বয়ং যাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন এবং যাঁর অশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন, সেই অরবিন্দের মুখের একটি কথায় তাঁর জন্য তিনি কি না করতে পারতেন। বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যদি হতেন তিনি, তাহলে সেই রাজছত্রচ্ছায়াতলে বসে তিনি

অনায়াসেই ঐশ্বর্যের শিখরে উঠতে পারতেন। স্বীয় যোগ্যতা তো ছিলই, সেই সঙ্গে যেটি দুর্লভ, ভাগ্যক্রমে তাও তিনি লাভ করেছিলেন—গায়কোয়াড়ের বন্ধুত্ব। কর্ম-জীবনের শেষে বরোদাতেই তিনি কি ছোটখাটো একটা জায়গিরদার হয়ে, পুত্রকলত্র নিয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত করতে পারতেন না? নিশ্চয়ই পারতেন। কিন্তু যাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ এক সুমহান্ লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত, সেই অরবিন্দ সাধারণ মানুষ থেকে যে স্বতন্ত্র হবেন, তা বলা বাহুল্য। সরস্বতীর কমল বনে যেমন ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ, লক্ষ্মীর স্বর্ণভাণ্ডারে প্রবেশাধিকারও ঠিক সেদিন তেমনি ছিল তাঁর করায়ত্ত যেদিন লণ্ডনে বরোদার মহারাজা স্বয়ং তাঁকে নির্বাচন করলেন তাঁর কাজের জন্য। কিন্তু সেদিকে তাঁর মনই গেল না। মিথ্যা নয়, তাঁর অনেক রকম পাগলামির মধ্যে এটিও একটি পাগলামি। তারো আগে আমরা দেখেছি, লক্ষ্মীদেবী তাঁকে কম সাধেন নি যখন বার বার তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল রাইডিং টেস্ট দেবার জন্য। মধ্যবিত্ত বাঙালি-সন্তানের চির-আকাঙ্ক্ষিত দুর্লভ সিভিল সার্ভিসের চাকরি তো তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যেই এসে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি তা নিলেন না।

আশ্চর্য জটিল চরিত্রের মানুষ অরবিন্দ।

বস্তুত তাঁর চরিত্রের জটিলতাই তাঁকে দুর্বোধ্য করে তুলছে।

প্রথম থেকেই তাঁর জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। এর পর্বে পর্বে আছে চমক আর বিস্ময়।

বরোদায় তাঁর প্রধান কাজ ছিল ভারতীয় সভ্যতার মর্মানুধাবন করা। এ কাজটা বড় সহজ ছিল না। এতকাল যাঁর পায়ের তলার মাটি বলতে ছিল শুধু পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং য়ুরোপের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য, নিজের জাতির সভ্যতা সম্পর্কে যিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এমন কি নিজ মাতৃভাষায় যিনি কথা পর্যন্ত বলতে পারতেন না, সেই অরবিন্দ এখন প্রবেশ করতে চলেছেন আর্যসভ্যতার গভীরে। এ যেন উল্টো পথে যাত্রা শুরু করা। রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ—সকল মহাপুরুষের জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, এঁদের প্রত্যেকেই আগে আয়ত্ত করেছেন স্বজাতীয় সভ্যতা, তারপরে তাঁরা গ্রহণ করেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং তার সমন্বয় সাধনে প্রয়াস পেয়েছেন। এই ধারার একমাত্র ব্যতিক্রম শ্রীঅরবিন্দ। আমরা দেখেছি, কেমন করে তিনি বাধামুক্ত সর্বসংস্কারচিত্তে গ্রহণ করলেন পাশ্চাত্য সভ্যতা, আকণ্ঠ পান করলেন সেই সভ্যতার প্রাণরসধারা। কিন্তু তাঁর পিতার মতো নকল সাহেব সেজে ভারতে ফিরলেন না। পরিপূর্ণভাবে পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করেও তিনি মনে-প্রাণে রয়ে গেলেন খাঁটি ভারতীয়, খাঁটি আর্য। আবার অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই যে, তিনপুরুষের ব্রাহ্ম হয়েও অরবিন্দ ছিলেন একজন খাঁটি হিন্দু। বাঙালি তো বটেই।

বিষয়টা আরো পরিষ্কার করে বলি।

বরোদায় তিনি যখন অধ্যাপনার কর্মে নিযুক্ত, তখন "ভিতরে ভিতরে চলছিল তাঁর নিজের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির, তাঁর স্বভাবের ও স্বধর্মের ক্রিয়া। সে হলো সকল জিনিসেরই গূঢ় মর্ম অনুসন্ধানের জন্য এক গভীর ও অক্লান্ত পরিশ্রম। কোন জিনিসেরই বাইরের চেহারা দেখে, তার নাম শুনে বা আকৃতি দেখে বা বাহ্য অভি-ব্যক্তির বিচার করে তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন না। সকল জিনিসেবই অন্তিম মূল পর্যন্ত গিয়ে তাঁর দেখা চাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল পর্যন্ত গিয়ে তাকে ভাল করেই তিনি দেখে নিয়েছেন, আর তার যতখানি পর্যন্ত দৌড় তাও বুঝে নিয়েছেন। এবার তিনি চাইলেন ভারতেব জীবনধারা ও এব চিরায়ত সংস্কৃতির অতলের মধ্যে ডুবে আবিষ্কার করতে যে কোন্ চিরন্তনী প্রাণশক্তির জোরে তা এতকাল অম্লান ও অমর হয়ে টিঁকে আছে।"*

এরই জন্য অরবিন্দ সংস্কৃত শিখলেন।

তার আগে আয়ত্ত করেছেন মাতৃভাষা।

ভারতের আত্মাকে জানতে হলে এই দেবভাষার চর্চা করতেই হয় এবং তা তিনি করেন নিজের চেষ্টায়, এ কথা তিনি নিজেই বলেছেন। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তাঁর কোন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয়নি। যখন তিনি বুঝলেন যে, যেমন গ্রীক সাহিত্য না জানলে য়ুরোপের আত্মার সন্ধান মেলে না, তেমনি সংস্কৃত না শিখলে ভারতের মূল ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় না, অথবা এব দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষা সংস্কৃতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা কবা যায় না। আবার সেই ছাত্রজীবনের উদ্যম, অধ্যবসায় আর নিষ্ঠা নিয়ে অরবিন্দ ব্রতী হলেন সংস্কৃতচর্চায়। কঠিন কাজ, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর মতো প্রতিভাবান পুরুষের কাছে কঠিন বলে কিছু থাকতে পারে না। চললো অতন্দ্র অধ্যবসায়। ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন—একে একে সব পাঠ করলেন। মাইকেলের মতো অরবিন্দও ছিলেন ঐশী শক্তির অধিকারী, তাতে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের পর মাইকেল ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। এই দুজনের রচনাই তিনি বেশি পছন্দ করতেন। মাইকেলের কাব্যপাঠ করে মধু-প্রতিভারও প্রশস্তি তিনি রচনা করেছিলেন একটি সুন্দর সনেটে যার প্রথম ছত্র দুটি মনে পড়ছে :

> "ঐশী নিপুণতা নিয়ে ওগো বঙ্গকবি
> আঁকিতে শিখায়ে গেলে ত্রিদিবের ছবি।"

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, এই দেবভাষা আয়ত্ত করেই মাইকেল মহাকাব্যের অমর কবি হতে পেরেছিলেন আর বঙ্কিমচন্দ্র হতে পেরেছিলেন অদ্বিতীয় ঔপন্যাসিক।

---

* মহাযোগী : দিবাকর।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও একথা সত্য। কিন্তু যাক সে কথা। আমরা প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

একে একে আহরণ করলেন অরবিন্দ পৃথিবীর এই প্রাচীনতম ভাষা থেকে অমূল্য সম্পদ, বৃদ্ধি করলেন তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার। যে মনটি ছিল এতকাল গ্রীক সাহিত্যের ছাঁচে গড়া, ইংরেজি ও য়ুরোপের অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের রসে সমৃদ্ধ, এখন সেই মনের মধ্যে ছাপ পড়ল সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের। শাশ্বত হয়ে রইল সেই ছাপ অরবিন্দ-মানসে। এখন থেকে উপনিষদ আর গীতা নিত্য পাঠ্য হলো। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনারও পথ প্রদর্শক হলো এইসব মহাগ্রন্থ। গীতার মধ্যেই যেন অরবিন্দ বেশি করে ডুবে গেলেন। গীতার আলোয় তাঁর মানসজগৎ কতখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তাব পরিচয় তিনি রেখেছেন তাঁর প্রতিভার অন্যতম সৃষ্টি 'এসেজ অন দি গীতা' গ্রন্থে যা তিনি উত্তরকালে পণ্ডিচেরীর তপঃক্ষেত্রে বসে রচনা করেছিলেন। এক একখানা গ্রন্থ পড়েন আর অবাক বিস্ময়ে ভাবেন এসবের তুল্য পৃথিবীতে আর কোথাও আছে? অন্তর থেকে উত্তর আসে—না। রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য মহাকাব্য পৃথিবীতে আর কি রচিত হয়েছে? ব্যাস ও বাল্মীকির মতো প্রতিভা আর কোথাও কি দেখা গিয়েছে?

অরবিন্দের সংস্কৃত অধ্যয়ন ঠিক সাধারণ অধ্যযন ছিল না অথবা তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিধি বিস্তারের জন্য তিনি এই চর্চায় অমনভাবে মনোনিবেশ কবেন নি। এ ছিল তাঁর ভারত-আত্মার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ঐকান্তিক প্রয়াস। পড়লেন কালিদাস, পড়লেন ভবভূতি—মুগ্ধ হলেন অরবিন্দ। তাঁর কল্পনায় কবিতার নতুন জগৎ যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বেশি করে আকৃষ্ট হলেন তিনি কালিদাসের রচনাব প্রতি; কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, মেঘদূত—যতবার পড়েন, কবিতার নতুন আস্বাদে ভরে উঠতে থাকে তাঁর নিজের কবি-মন। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দের অন্যতম জীবনীকার শ্রীআর. আর. দিবাকর যথার্থই লিখেছেন: "সংস্কৃতে কেবল যে তিনি ধর্ম বিষয়ক ও দার্শনিক তত্ত্বের গ্রন্থগুলিই পাঠ করতেন তা নয়। বেদ, উপনিষদ, গীতা ও মনুসংহিতার সঙ্গে তিনি কালিদাস, ভবভূতি, রামায়ণ ও মহাভারত সমান যত্নের সঙ্গেই অধ্যয়ন করেছেন।"

একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

তা'নইলে অরবিন্দ হতেই পারতেন না ভারতীয় সংস্কৃতির অমন একজন নিপুণ ভাষ্যকার। ভারতের চিরন্তন ভাবধারার সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন কারো মুখে শুনে নয়, অথবা অন্য কোন ভাষায় লেখা ভারত-তত্ত্বের বই পড়ে নয়। একেবারে আর্যবিদ্যার আকর থেকেই তিনি এসব জিনিস আহরণ করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের ঋষিরা হোমহবি সুরভিত ও সামগান মুখরিত তপোবন

তরুচ্ছায়াতলে বসে যে দুর্লভ আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন অরবিন্দ তার নাগাল পেয়েছিলেন সোজাসুজি। তাঁদের নিজস্ব অনুপ্রেরণা, অনুভূতি আর অন্তর্জ্ঞান থেকে ঋষিরা যে সব কথা যে ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন সেই মৌলিক ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়ে অরবিন্দ সব কিছু জেনেছিলেন। তাঁর এক গীতার ভাষাই তার অভ্রান্ত নিদর্শন বহন করে। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য কত গভীর ছিল তা জানা যায় তাঁর এই সময়কার ও বরোদা-পরবর্তী সাহিত্যকর্ম থেকে। এইভাবে প্রাচীন যুগের ভারতীয় ভাবধারার মর্মভেদ করে তখনকারই-ভাবে ভাবিত হয়ে সেইসব অতুলনীয় ভারতীয় ভাব-সম্পদকে আধুনিক ইংরেজি ভাষার শব্দযোজনার দ্বারা অমন সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তোলার শক্তি আমরা আজ পর্যন্ত আর কোন ভারতীয় লেখকের মধ্যে দেখিনি। তাই বলছিলাম শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বরোদা-জীবনে শুধু সংস্কৃত পড়েন নি—তদ্গত চিত্তে অধ্যয়ন করেছিলেন যাবতীয় হিন্দুশাস্ত্র। আর এইটাই ছিল তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের মহাপ্রস্তুতি। এইভাবেই সেদিন তিনি নিজেকে পুনরায় ভারতীয় করে গড়ে তুলেছিলেন আর এইভাবেই তিনি সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। অরবিন্দের জীবনের এই রূপান্তর ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য কি রকম সৌভাগ্যের সূচনা করে দিয়েছিল, সে-কথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

প্রসঙ্গত এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ না করে পারি না। দেশে ফিরেই শ্রীঅরবিন্দ হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন, কিন্তু ইসলামের আলোচনা আদৌ করেছিলেন কি না তা জানা যায় না। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এইখানেই। আজীবন তিনি যেন হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনেক উদার ও ব্যাপক।

তাঁর বরোদা-জীবন অপরিমেয় সাহিত্যকর্ম দ্বারা চিহ্নিত।

ভারতে ফিরে এসে তিনি ভারতীয় বিষয় নিয়ে কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করতে থাকেন। বাংলা ভাষা শিখবার পর বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রমুখ প্রাচীন বাংলা কবিদের অনুপম পদাবলী তাঁকে মুগ্ধ করল আর সংস্কৃত শিক্ষা করে উপনিষদ ও গীতা ছাড়া প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যের রত্ন-ভাণ্ডার তাঁর কবি-কল্পনাকে করল নতুন ভাবে উদ্দীপিত। ভর্তৃহরির কবিতা, কালিদাসের নাটক ও কবিতা এবং সংস্কৃত ভাষার অন্যান্য ধ্রুপদী সাহিত্য তাঁকে নিয়ে এল এক নতুন অভিজ্ঞতার জগতে। এইবার আমরা দেখতে পাব, ইংল্যাণ্ডে থাকতে কবিকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে অরবিন্দ যেমন প্লেটো প্রমুখ গ্রীক লেখকদের রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, তেমনি এইবার তিনি বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত

ইংরেজি কবিতা রচনা শুরু করলেন। তাঁর এই পর্বের কবিকর্মের দুটি স্তর আছে—একটি অনুবাদ, অপরটি মূল রচনা। অনুবাদের কথাই আগে বলি।

ভর্তৃহরি দিয়েই তিনি অনুবাদ শুরু করেছিলেন বলে জানা যায়।

এই অনুবাদগুলি প্রথমে প্রকাশিত হয় বরোদা কলেজ ম্যাগাজিনে। কিন্তু সমগ্র 'নীতিশতক' ইংরেজিতে অনুবাদ করে তিনি 'দি সেঞ্চুরি অব লাইফ' এই নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ ছিল, যাকে বলে সচ্ছন্দ অনুবাদ, আক্ষরিক নয়, তথাপি মূলের ভাব ও সৌন্দর্য দুই-ই সুন্দরভাবেই ফুটে উঠেছে। অনেকের বিবেচনায় ভর্তৃহরির রচনার ইংরেজি অনুবাদে তিনি যে দক্ষতা ও শিল্পকুশলতা দেখিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সংস্কৃতের কঠিনতম কবি ভর্তৃহরি, তাঁর কবিতার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, ব্যঙ্গরসাত্মক ভাবকে ইংরেজিতে প্রকাশ করা বড়ো সহজ কথা নয়। ভর্তৃহরির 'নীতিশতক' ঠিক উচ্চাঙ্গের কবিতা নয়, বরং বলা যেতে পারে যে, এর মধ্যে আমরা পাই শুধু অভিজ্ঞতা আর সাংসারিক জ্ঞানের কথা, কবি-কল্পনার দীপ্তি এর মধ্যে সামান্যই। তথাপি এই কবিতাগুলি স্ফটিকের মতোই স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ। অরবিন্দ-কৃত অনুবাদের মধ্যে 'নীতিশতক'-এর স্বচ্ছতা ও বিশুদ্ধতা দুই-ই লক্ষ্যণীয়। নীতি কবিতার যা বৈশিষ্ট্য, 'দি সেঞ্চুরি অব লাইফ'-এর অন্তর্গত অনুবাদ কবিতাগুলির মধ্যে তা সম্পূর্ণভাবেই আস্বাদ করা যায়। এই জাতীয় কবিতার আবেদন হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে, তবে মাঝে মাঝে যে বিদ্যুৎচমক বা গভীরতা নেই, এমন নয়।

শোনা যায়, বরোদায় অবস্থানকালে তিনি 'মেঘদূত' কাব্যটির একটি সুন্দর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় অরবিন্দের হারিয়ে-যাওয়া বহু রচনার মধ্যে এটি একটি। এইভাবে তাঁর অনেক মূল ও অনুবাদ কবিতার (যা তিনি বরোদায় থাকতে রচনা করেছিলেন) সন্ধানই পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবির কিছু অনুবাদও করেন এই সময়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'রাধাস্ কমপ্লেন্ট ইন য়্যাবসেন্স' ও 'রাধাস্ য়্যাপিল' কবিতা দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে, মূলের অনুসরণে রচিত হলেও, এ দুটি কবিতা হিসাবে অতি মর্মস্পর্শী। ইংরেজি সাহিত্যে অসাধারণ অধিকার ছিল তাঁর এবং সেই কারণেই অরবিন্দের এই সময়কার অনুবাদ কবিতাগুলি মধুর ও সরল এবং যথার্থ কাব্যসুষমামণ্ডিত হয়ে উঠতে পেরেছে। বরোদায় তাঁর কবি-কর্মের একটি সুন্দর চিত্র পাই 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে। সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

"অধিক রাত্রি পর্যন্ত কাব্যালোচনায় রত থাকিতেন বলিয়া অরবিন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইতে একটু বেলা হইত। তিনি সকালে চা খাইয়া কবিতার খাতা

খুলিয়া বসিতেন। এই সময়ে* তিনি মহাভারতের অনুবাদ করিতেছিলেন। বাংলা ভাল বুঝিতে না পারিলেও, সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত তিনি সুন্দর বুঝিতে পারিতেন। তিনি ধারাবাহিকরূপে অনুবাদ করিতেন না। মহাভারতের এক-একটি উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিতেন। ছোট আকারের। গ্রে-গ্রানাইট রঙের চিঠি-লেখার কাগজে প্রথমে কবিতাগুলি লিখিতেন; প্রায়ই কাটাকুটি করিতেন না। লিখিবার পূর্বে সিগারেট টানিতে টানিতে খানিকটা ভাবিয়া লইতেন; তাহার পর তাঁহার লেখনীমুখে ভাবের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইত। তিনি দ্রুত লিখিতে পারিতেন না বটে কিন্তু লিখিতে আরম্ভ করিয়া লেখনীকে বিরাম দিতেন না।...যেদিন তাঁহার কবিতা মনের মতো সুন্দর হইত সেদিন তাঁহাকে প্রসন্ন দেখিতাম।"

এইভাবে ইংরেজিতে ভারতীয় বিষয় নিয়ে কবিতা লেখার একটা প্রত্যক্ষ ফল এই হলো যে, এর আগে তাঁর রচনার মধ্যে যে প্রাচীন গ্রীক লাতিনের প্রভাব এসে পড়ত তা ক্রমশ লোপ পেতে লাগল। এখন সংস্কৃত সাহিত্যেরই প্রভাব তাঁর লেখার মধ্যে দেখা যেতে লাগল। এই দেশের স্বাভাবিক পরিবেশের উপযোগী যে ধরনের কল্পনার চিত্র সংস্কৃতে ও অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে আকীর্ণ হয়ে আছে, অরবিন্দের এই পর্যায়ের কবিতা ও নাটকাবলীর মধ্যে তেমনি ধরনের চিত্রই ক্রমশ ফুটে উঠতে লাগল। মারাঠী ভাষা তিনি যে ভাল করেই শিখেছিলেন তাঁর 'বাজী-রাও' কবিতাটি তারই একটা নিদর্শন। কবিতাটি মারাঠার বীরত্বে উদ্ভাসিত। এই সময়েই তিনি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন; তবে, অনেকের মতে, এই অনুবাদ উচ্চাঙ্গের হয়নি, কারণ অনুবাদক তাঁর অনুবাদের মধ্যে কালিদাসের সূক্ষ্ম 'হিউমার' নিপুণ ও নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে আদৌ সক্ষম হননি। কিন্তু 'উর্বশী' নামে একটি পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে তিনি একটি মৌলিক কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাটি বিস্তৃত চারি সর্গে সমাপ্ত ও অনেকটা মিলটনী ছন্দে বিরচিত। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতাটি স্মর্তব্য। তুলনায় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' শ্রেষ্ঠ। এরপরেই মহাভারতের একটি সুন্দর প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে অরবিন্দ আখ্যানমূলক একটি কবিতা রচনা করেন। এর বিষয়-বস্তু রুরু ও প্রিয়ম্বদার প্রেম কাহিনী। এই কবিতার নাম: 'প্রেম ও মৃত্যু' ('লাভ য়্যাণ্ড ডেথ')। তেমনি মহাভারতের বিদুলা চরিত্রটিও নিয়ে একটি সুন্দর কবিতা রচনা করেন।

কবি অরবিন্দ সম্পর্কে পরে আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে

---

* ১৮৯৮ সাল। দীনেন্দ্রকুমার রায় অরবিন্দকে বাংলা শেখাবার জন্ত বরোদায় আসেন এই বছরের শেষ ভাগে এবং তাঁর সঙ্গে তিনি দু'বছরের কিছু বেশি সময় অতিবাহিত করেছিলেন।

তাঁর কবি-প্রতিভার একটা প্রাথমিক পরিচয় তুলে ধরলাম শুধু এইটুকু বুঝাবার জন্য যে, "বরোদায় অবস্থানকালে ১৮৯৫ হইতে ১৮৯৯—এই চারি বৎসরকাল মধ্যে অতি দ্রুত তিনি সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গ্রীক হইতে হিন্দু-সভ্যতার দিকে মুখ ফিরাইতেছেন।...কবি-জীবনের মধ্য দিয়া যে পরিবর্তন সূক্ষ্ম আকারে দেখা গেল—সমগ্র জীবনকে উত্তরোত্তর ইহা উদ্বেলিত করিয়া প্রবাহিত হইবে, তাহা ক্রমে দেখা যাইবে।" তাঁর অমন একাগ্রচিত্তে সংস্কৃত অধ্যয়নের ফলশ্রুতি ইহাই।

॥ চৌদ্দ ॥

সেকালে হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও যা করেছিলেন, একালে দেখা গেল অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষ ঠিক তাই-ই করলেন বরোদা রাজ কলেজে। ডিরোজিও সেদিন উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁর ছাত্রদের দেশপ্রেমের নবীন চেতনায়। বরোদা কলেজেও ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল—অধ্যাপক অরবিন্দও তাঁর ছাত্রদের মনে জাগিয়ে দিয়েছিলেন দেশপ্রেমের অগ্নিময় চেতনা। ডিরোজিও যেমন পেয়েছিলেন ছাত্র-সমাজের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা, বরোদার ছাত্রবৃন্দও ঠিক তেমনিভাবে শ্রদ্ধা, ভক্তি আর ভালবাসার অর্ঘ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নিবেদন করেছিল তাদের এই অধ্যাপকটিকে। শিক্ষক অরবিন্দকেও আমরা তাই বলতে পারি এ যুগের ডিরোজিও। হিন্দু কলেজের শিক্ষকটির সঙ্গে বরোদার এই অধ্যাপকটির মধ্যে আরো একটা আশ্চর্য মিল ছিল। দুজনেই কবি। অরবিন্দের বাংলা ভাষার শিক্ষক এই প্রসঙ্গে যথার্থই উল্লেখ করেছেন : "বরোদার শিক্ষিত সমাজ তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার সম্মান করিতেন। বরোদার ছাত্র-সমাজে অরবিন্দ দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ অপেক্ষা এই বাঙালি অধ্যাপক ছাত্র-সমাজের অধিকতর সম্মান ও বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনার প্রণালীতে তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল।"*

ছাত্রদের হৃদয়ে দেশপ্রেমের বীজ বপন করা তাঁর বরোদা-জীবনে একটা বড় কাজ ছিল অরবিন্দের আর এই কাজটা তিনি করেছিলেন নীরবে ও সার্থক-ভাবেই। তিনি জানতেন, দেশকে জাগ্রত করে তোলার জন্য এমন নমনীয় উপাদান আর নেই। তাই দেখা যায় যে, অধ্যাপনার ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর ছাত্রদের মনকে ভবিষ্যতের কাজের জন্য তৈরি করছিলেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, অরবিন্দের জীবনের এই অধ্যায়টি নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যে মহাপ্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে তা শুধু ভাষা শিক্ষা, সাহিত্যকর্ম বা অধ্যাপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ছাত্রদের মন তৈরি করার কথাটি তিনি যে গভীর ভাবেই চিন্তা করেছিলেন, এ অনুমান মাত্র নয়, অভ্রান্ত সত্য। তাঁর এই সময়কার বহু ছাত্রই এর সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষ

* অরবিন্দ-প্রসঙ্গ : দীনেন্দ্রকুমার রায়।

নিশ্চয়ই জানতেন যে, শস্তের সূক্ষ্ম বীজ পাথরের গর্তে পড়লেও, সুবিধার জলবায়ু পেয়ে, গাছ হয়, সহস্রগুণ ফল প্রসব করে। সত্য কাজের, সত্য কথার, খাঁটি জিনিসের মধ্যে এই অজেয় প্রাণশক্তি থাকে আর থাকে চিরন্তনী সজীবতা। বরোদার ছাত্রদের মনে অরবিন্দ সেই সত্যের বীজই বপন করেছিলেন।

দেশসেবা—এটাই ছিল তাঁর চিন্তার কেন্দ্র-বিন্দু।

অরবিন্দ-মানসের এটাই হলো নিগূঢ়তম সত্য।

এ ছাড়া অরবিন্দ-সত্তার আর কোন অর্থই হয় না।

তিনি তো নিজমুখেই বলেছেন: "চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল।" এই বীজ দেশসেবার বীজ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। ইংল্যাণ্ডে ছাত্রজীবনেই তাঁর মনের মধ্যে এই ধারণাটা যে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যিনি উত্তরকালে এই দেশসেবার একটা অভিনব আদর্শ তাঁর দেশবাসীর সামনে স্থাপন করবেন তারই আভাস আমরা দেখি তাঁর কংগ্রেস ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ দুটিতে, তার আভাস পাই ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের মধ্যে। আত্মত্যাগ, জ্ঞানসঞ্চয়, বিলাসিতা বর্জন, মিতাচার, স্বল্পাহার—এই সবের উপযোগিতার কথা তিনি যখন ক্লাসে তাঁর ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন, তখন তারা হয়ত জানত না যে, তাদের অধ্যাপক তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের স্বভাব ও চরিত্রকে কি জন্যই বা ঐভাবে গড়ে তুলছিলেন। শুধু মুখের কথা দিয়ে নয়, নিজে আচরণ করেই তা তিনি দেখিয়ে দিযেছিলেন বলেই না, অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষকে বরোদার ছাত্রবৃন্দ সেদিন দেবতার আসনে বসিয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, বরোদা কলেজে তিনি যা করেছিলেন, উত্তরকালে বাংলা দেশে এসে জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষরূপে অরবিন্দ ঠিক তাই-ই করেছিলেন—দেশসেবার মহান আদর্শে এখানকার ছাত্রদেরও তিনি অনুপ্রাণিত করে তুলেছিলেন। সে ইতিহাস পরে বলব। দেখা যাচ্ছে, শিক্ষক হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষভাবেই সচেতন ছিলেন।

ছাত্রদের কথা বললাম।

এবার দেখা যাক বরোদায় অবস্থানকালে কাদের অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে এসেছিলেন অরবিন্দ। এঁদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় কেশবরাও দেশপাণ্ডের কথা। ইনি কেমব্রিজেই তাঁর সহপাঠী ছিলেন ও পুণাতে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন, একথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় অরবিন্দের আত্মপ্রকাশের পথ সুগম করে দিয়ে দেশপাণ্ডে নিঃসন্দেহে একটা বড রকমের কাজ করেছিলেন। কারণ বাংলার সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ ছিল না, নিজের আত্মীয়-স্বজনের বাইরে বাংলা দেশের বিশেষ কারো সঙ্গে

তখন তাঁর তেমন পরিচয়ও গড়ে ওঠেনি। এ দেশের কোন পত্রিকা-সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর তেমন পরিচয়ও ছিল না আর তাঁর ঐ রকম নির্ভীক লেখা ছাপবেই বা কোন্ কাগজ? এমন অবস্থায় দেশপাণ্ডের সঙ্গে তাঁর পুনরায় সংযোগ স্থাপন একটা দৈবী ব্যাপার বললেই হয়। অরবিন্দের সমগ্র জীবনে এ রকম অজস্র দৈবী ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। মহাপুরুষদের জীবন মাত্রেই এইটা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন তাঁর নাম লেফ্‌টেনাণ্ট মাধবরাও যাদব। ইনি বরোদার সৈন্যবিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ইনি সকল বিষয়েই অরবিন্দের সহায়ক ছিলেন, এমন কি, ওখান থেকে কলকাতা চলে আসবার পরেও। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরোদার সৈন্য বিভাগে চাকরি দেবার ব্যাপারে অরবিন্দ এঁর কাছ থেকে অনেক সহায়তা পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। বরোদায় থাকতে অনেক বছর মাধবরাওর সঙ্গে একত্রেই বাস করতেন। এখানে একটি কথা উল্লেখ্য। যে তেরো-চৌদ্দ বছর অরবিন্দ বরোদায় বাস করেছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে তিনি বরাবর একই বাড়িতে থাকেন নি, তিন-চারবার বাড়ি বদল করেছেন। ওটা ছিল তাঁর স্বভাব। দীনেন্দ্রকুমার যখন তাঁকে বাংলা শেখাতে বরোদায় এসেছিলেন তখন যে বাংলোয় অরবিন্দ বাস করতেন তার চমৎকার বর্ণনা আছে 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' বইটিতে। বাংলোটির সব ঘরই ছিল খাপ্‌রার ঘর। বাংলোটি যেমন জীর্ণ ছিল, এর খাপ্‌রাগুলিও ছিল তেমনি পুরাতন। "গ্রীষ্মকালে দুঃসহ রৌদ্রে খাপ্‌রা তাতিয়া আগুনের মতো হইত। শীতকালে এমন কন্‌কনে শীত যে, যেন বুকের রক্ত পর্যন্ত জমিয়া যাইবার উপক্রম হইত। বর্ষাকালে খাপ্‌রার ভিতর দিয়া মেঝেতে টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িত।" আশ্চর্যের বিষয় সেই "কদর্য ও অসংস্কৃত বাংলোয় দিনে মাছি ও রাত্রে মশার উপদ্রব" সহ্য করে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা সকল ঋতুতে অরবিন্দ নির্বিকার চিত্তে বাস করতেন। এমন মানুষকে সন্ন্যাসী বলব না তো কী বলব?

তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন খাসেরাও যাদব, ফাড়কে এবং মঙ্গেশ কোলশকার। এঁরা সবাই মারাঠী ছিলেন ও কার্যসূত্রে বরোদায় বাস করতেন। এঁরা সবাই অরবিন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্যের জন্য যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি তাঁর সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা দেখে। বরোদা কলেজে তাঁর ছাত্রদের কাছ থেকেই টিলক অরবিন্দের কথা বেশি করে জেনেছিলেন; তেমনি অরবিন্দও টিলকের কথা তাঁর মারাঠী বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছিলেন। তবে 'কেশরী' পত্রিকাই টিলককে সমধিক পরিচিত করে তুলেছিল

অরবিন্দের কাছে, যেমন অরবিন্দকে প্রথম পরিচিত করে তুলেছিল টিলকের কাছে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সেই চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধাবলী। আরো গভীরভাবে দেখলে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হলো বাংলার সঙ্গে মারাঠার মিলন। সেদিন ইতিহাস-বিধাতার নেপথ্য বিধানেই তো সেই মিলনের সেতু হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। এই টিলক সম্পর্কেও 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখেছিলেন যেমন টিলক লিখেছিলেন অরবিন্দ সম্পর্কে তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায়। পরবর্তীকালে কংগ্রেস-রাজনীতিতে টিলক-অরবিন্দ মিলিত ভাবে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেন। সে চমকপ্রদ কাহিনী আমরা যথাস্থানে বলব।

এই সময়ে আরেকজন দেশপ্রেমিক মারাঠী তরুণের সঙ্গে অরবিন্দ পরিচিত হয়েছিলেন, তবে বরোদায় নয়, তাঁর মাতামহের দেওঘর ভবনে। ইনি সখারাম গণেশ দেউস্কর। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে এই মারাঠী-সন্তানের দান অবিস্মরণীয় হয়ে আছে—অবিস্মরণীয় হয়ে আছে দেশের জন্য এঁর অপরিসীম স্বার্থত্যাগ ও দুঃখকষ্ট ভোগ। পুজোর ছুটিতে অরবিন্দ যখন দেওঘরে আসতেন তখনই তিনি সখারামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সখারাম তখন এখানকার স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন ও প্রায়ই রাজনারায়ণের ভবনে এসে তাঁরই কাছ দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর দুজনে অন্তরঙ্গভাবে মিলিত হন স্বদেশী বাংলার সেই প্রজ্বলিত যজ্ঞকুণ্ডে। কাজেই তাঁর জীবননাট্যের অন্যতম চরিত্র হিসাবে মারাঠার এই বীরসন্তানের কথাও আমাদের উল্লেখ করতে হবে এবং আমরা তা করব যথাস্থানেই। শ্রীঅরবিন্দের আরেকজন মারাঠী ভক্ত ও শিষ্য—এ. বি. পুরানি—উত্তরকালে তাঁর একখানি সুন্দর জীবনচরিত রচনা করেছেন ইংরেজিতে। তথ্যের দিক দিয়ে পুরানি-বিরচিত 'লাইফ অব শ্রীঅরবিন্দ' খুবই মূল্যবান তাতে সন্দেহ নেই। ইনি তাঁর যৌবনকাল থেকেই পণ্ডিচেরী আশ্রমে বাস করে আসছেন। এইভাবে দেখা যাবে যে, মারাঠীরা শ্রীঅরবিন্দকে প্রাণ দিয়ে যতখানি গ্রহণ করেছে, দুঃখের বিষয়, তাঁর স্বজাতি তাঁকে ঠিক ততখানি গ্রহণ করতে পারে নি। এটা বাংলারই দুর্ভাগ্য বলতে হবে। তাই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্যতম ছাত্র, বাংলা সাপ্তাহিক 'আর্য' পত্রিকার যশস্বী সম্পাদক স্বর্গত বলাই দেবশর্মা মহাশয় একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন: "শ্রীঅরবিন্দ বাংলার হইয়াও বাঙালির নহেন, সেই ভাগবত মানবকে বাঙালি—আজিকার বাঙালি ভুলিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

অরবিন্দের বরোদা-জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার উল্লেখ করছি। যাঁকে উপলক্ষ্য করে এই ঘটনার সৃষ্টি তাঁর নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অরবিন্দ স্বয়ং লিখেছেন: "বাংলা দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন গঠনের জন্য বরোদা বা বোম্বাই থেকে আমার কোন বন্ধুকে আমি কখনো পাঠাই নি। আমার প্রথম দূত ছিলেন জনৈক তরুণ বাঙালি। ইঁহাকে আমি স্থানীয় বন্ধুদের সাহায্যে বরোদা সৈন্যদলের ঘোড়সওয়ার বিভাগে ভর্তি হতে সাহায্য করেছিলাম। তখন ভারতবর্ষের যে কোন স্থানের সৈন্যদলে বাঙালি যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিষেধাজ্ঞা ছিল। তা সত্ত্বেও আমি এটা করেছিলাম। এই বাঙালি তরুণটি খুবই উৎসাহী ছিলেন এবং অস্ত্রবিদ্যা শিখবার জন্য তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ইনি প্রচুর শারীরিক শক্তিরও অধিকারী ছিলেন। ইনিই কলকাতায় সর্বপ্রথম একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী গঠন করেছিলেন যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরে এর অনেকগুলি শাখাও স্থাপিত হয়েছিল। এই তরুণটি বরোদা থেকে কলকাতায় আসেন এবং এখানে তিনি পি. মিত্র ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। তারপরে বারীন এসে তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন।"

অরবিন্দ-বর্ণিত এই তরুণ বাঙালিটিই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বরোদায় দীনেন্দ্রকুমারের আগমনের পর ইনি আসেন; কারণ 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে এঁর উল্লেখ পাই। দীনেন্দ্রবাবু লিখেছেন: "একটি দীর্ঘকায় বলবান বাঙালি যুবক একটি লোটা ও লম্বা লাঠি সম্বল করিয়া বরোদা রাজ্যে আমাদের বাসায় উপস্থিত হয়। তাঁহার নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার বাড়ি কোথায়, সংসারে কে আছে, কি উদ্দেশ্যে সে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা আমাদের কাছে প্রকাশ করে নাই। প্রথমে সন্দেহ হইয়াছিল—লোকটা হয়তো গোয়েন্দা। তাহার অল্পদিন পূর্বে র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্টের হত্যাকাণ্ড লইয়া দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র ভয়ানক হৈ চৈ আরম্ভ হইয়াছিল; বিপ্লববাদীদের সন্ধানে চারিদিকে অসংখ্য গোয়েন্দা ঘুরিতেছিল।

"যতীন্দ্রনাথের সাহস, উদ্যম, উচ্চাভিলাষের পরিচয় পাইয়া অরবিন্দ বিস্মিত হইলেন এবং সে যাহাতে সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে পারে—সেজন্য যথেষ্ট আগ্রহও প্রকাশ করিলেন। ফৌজে বাঙালির প্রবেশ নিষেধ বলিয়া যতীন্দ্রনাথ স্বীয় বাঙালিত্ব গোপন করিয়া পুরুবিয়া ব্রাহ্মণ সাজিল এবং বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বন্দ্য'টুকু উহ্য রাখিয়া 'উপাধ্যায়' এই লাঙ্গুলটুকু নিজের নামে যোগ করিয়া অরবিন্দের বন্ধু লেফ্‌টেনান্ট মাধবরাও যাদবের শরণাপন্ন হইল যদি তিনি দয়া করিয়া তাহাকে সাধারণ পদাতিক সৈন্যরূপেও গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করেন।"

এই যতীন্দ্রনাথই উত্তরকালের নিরালম্ব স্বামী। তরুণ বয়সেই দেশকে স্বাধীন করার ইচ্ছাটা তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। বাঙালির ছেলে মসিজীবী হওয়ার

চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ না করে অসিজীবী হওয়ার আশায় সেদিন সারা ভারত চষে বেড়িয়েছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন কি ইংরেজের সৈন্যবিভাগে, কি সামন্ত রাজ্যের সৈন্যদলে সামান্য একজন পদাতিক হয়েও প্রবেশ করা বাঙালির পক্ষে একরকম অসম্ভব ছিল। যতীন্দ্রনাথের বরোদা আগমন ১৮৯৯ সালের কোন এক সময়ের ঘটনা হবে। এর পরে আমরা দেখতে পাব যে, বরোদায় অবস্থানকালে অরবিন্দ শুধু অধ্যয়ন, অধ্যাপনা আর সাহিত্য কর্ম নিয়েই দিনাতিপাত করেন নি। সেই দেশসেবার যে বীজটি তাঁর চৌদ্দ বছর বয়সের সময় তাঁর মনের মধ্যে উপ্ত হয়ে থাকবে, সকলের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে তারই অঙ্কুরোদ্গমের সময় এবার এসে পড়ল। ক্ষেত্র এবং পরিবেশ দুই-ই তখন এর অনুকূল ছিল। বাঙালি তরুণ যতীন্দ্রনাথকে তিনি যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েই বরোদা রাজ্যের সৈন্যদলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, তা বোধ করি বুঝিয়ে না বললেও চলে। চির-কালের মৌনী এই মানুষটির মনের অতলের তরঙ্গ-বিভঙ্গ তো তাঁর জীবনের উপর থেকে দেখে বুঝবার উপায় নেই।

তাঁর বরোদা-জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটির কথা বলে আমরা এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করব। এটি তাঁর বিয়ের কথা। তাঁর জীবনে তাঁর স্ত্রীর ভূমিকা নেই বললেই হয়, সম্ভবত সেই কারণে তিনি স্বয়ং এই সম্পর্কে বিশেষ কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যান নি। তবে বিবাহের পরে 'প্রিয়তমা মৃণালিনী'-কে তিনি যে কয়েকখানি পত্র লিখেছিলেন (বাংলাতেই সেগুলি নিজে লিখেছিলেন), সেই পত্রগুলি সত্যিই আশ্চর্য রকমের অসাধারণ। তাঁদের দাম্পত্যজীবনের নিগূঢ় সম্পর্কটি বুঝবার পক্ষে স্ত্রীকে লেখা অরবিন্দের এই পত্রকয়খানিই যথেষ্ট। অরবিন্দের বিবাহের একটি সুন্দর বিবরণ তাঁর মাস্টার মশাই দিয়েছেন। তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হলো:

"এই সময় অরবিন্দ বিবাহের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। এইরূপ উৎসুক হওয়ার ফলে তিনি খবরের কাগজে স্পষ্ট বিজ্ঞাপন দিলেন যে, তিনি বিবাহ করিবেন এবং সেজন্য পাত্রী চাই। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু অরবিন্দের শ্বশুরের খুব বন্ধু ছিলেন। তিনিই অগ্রবর্তী হইয়া ঘট্‌কালী করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় গিরিশবাবুর বাড়িতেই অরবিন্দ নিজে আসিয়া কনে দেখিয়া পছন্দ করিয়া গেলেন। বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেল। অরবিন্দ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত যুবক, অরবিন্দের শ্বশুর ভূপাল বসু বিলাত ফেরৎ হিন্দু। অরবিন্দ ও ভূপালবাবু, ভাবী জামাতা ও ভাবী শ্বশুর, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার হিন্দু হইলেন। কনের খুড়া কিম্বা জ্যাঠা কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কলিকাতা বৈঠকখানা রোডস্থিত কোন এক

ভাড়াটে বাড়িতে অরবিন্দের বিবাহ কার্য একেবারে নিখুঁত হিন্দুমতে সুসম্পন্ন হইল।"

এই বিয়ের তারিখ ১৯০১ সালের এপ্রিলের শেষ ভাগ।

বাংলা হিসাবে ১৬ই বৈশাখ, ১৩০৮।

অরবিন্দের বয়স তখন ত্রিশ বছরও পূর্ণ হয় নি।

স্ত্রী মৃণালিনী দেবী সবেমাত্র পনেরো বৎসরে পদার্পণ করেছেন।

অপর একটি বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বিবাহ-বাসরে উপস্থিত ছিলেন লর্ড সিংহ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, গিরিশ বসু, স্যর জগদীশ বসু প্রভৃতি। "বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁহার নব-পরিণীতা স্ত্রীকে লইয়া প্রথম দেওঘর গেলেন, পরে নৈনিতাল পাহাড়ে গেলেন এবং সেখান হইতে পুনরায় তাঁহার কর্মস্থল বরোদায় গেলেন।" অরবিন্দের মধ্যম অগ্রজ কিন্তু তিন-আইন মতে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত একটি অতি সুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরকাল যিনি বিলাতে কাটিয়ে এলেন সেই অরবিন্দকে তাই সেদিন প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দুমতে শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখে বিয়ে করতে দেখে অনেকে নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়ে থাকবেন—এ আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। অরবিন্দ-চরিত্রে যে জটিলতার কথা বলেছি, এটি তারই একটি নিদর্শন নয় কি?

শোনা যায়, মৃণালিনী ঘোষ দেখতে সুন্দরী ছিলেন। বিদুষীও। অমন একজন প্রতিভাবান পুরুষকে স্বামীরূপে পেয়ে তিনি নিজেকে নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবতী মনে করে থাকবেন, কিন্তু আজীবন তাঁকে কী কষ্টই না ভোগ করতে হয়েছে। ভূপাল বসুদের আদি নিবাস যশোহরে, তবে তিনি বাস করতেন রাঁচীতে। প্রাপ্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বিয়ের পরে দুজনের মধ্যে সম্প্রীতি যথেষ্টই হয়েছিল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্কের কথনো অভাব হয় নি যদিও ঠিকুজী অনুসারে অরবিন্দের ভাগ্যে গার্হস্থ্য সুখ ছিল না। কিন্তু মৃণালিনীর ভাগ্যে স্বামী সহবাস করা খুব অল্পই ঘটেছিল। আমরা একথা প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলতে পারি যে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অসাধারণ ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই—এর আভাসও আছে স্ত্রীকে লেখা তাঁর চিঠিগুলির মধ্যে। প্রায়ই মৃণালিনীকে এ বিষয়ে সব কথা জানিয়ে ও বুঝিয়ে চিঠি দিতেন আর সাধারণ দাম্পত্যজীবনের চেয়ে সহধর্মিণীকে তিনি এক মহত্তর জীবনের উপযোগী করে গড়ে তুলবার জন্য অনেক চেষ্টা করতেন। যতদূর জানা যায় তাতে বলা যায় যে, সেই 'পাগল' স্বামীর উপযুক্ত ভার্যা ছিলেন মৃণালিনী—যেমন উন্নতমনা তেমনি ভক্তিমতী। সহনশীলতা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। তাঁর অন্তরে তেজও কম ছিল না। স্বামী যখন প্রবাসে থাকতেন, মৃণালিনী পরের গলগ্রহ হওয়া তো দূরের কথা, পিতার

অন্নেও তিনি থাকতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনিও চেয়েছিলেন একটা উন্নত জীবনের পথে অগ্রসর হয়ে চলতে। বরোদায় স্বামীকে এই সময়ে লেখা পত্রের মধ্যে মৃণালিনীর যে পরিচয় আমরা পাই তার মধ্যেই আভাসিত হয়েছে একটি নারীর উন্নত হৃদয় আর মন। বরোদার পর তাঁর যে কর্মব্যস্ত জীবন, তার মধ্যে স্ত্রীর স্থান সামান্তই ছিল। তাই সেই সময়ে স্ত্রীকে ও ভগ্নী সরোজিনীকে অরবিন্দ হয় দেওঘরে নয়তো অন্যত্র রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর পারিবারিক জীবন আরম্ভ হয় ১৯০১ সালে, শেষ হয় ১৯১০ সালে যখন অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে চলে যান। তখন আর মৃণালিনীর তাঁর কাছে গিয়ে থাকবার প্রশ্নই ছিল না। স্বামীসঙ্গ না পাওয়ার বেদনা মৃণালিনী অকাতরেই সহ্য করে গেছেন চিরকাল। এবং সেটা করেই এই মহীয়সী নারী স্বামীর প্রতি তাঁর অকপট প্রেমের যে নিদর্শন দেখিয়ে গেছেন, তা শুধু হৃদয়-মন দিয়ে অনুভব করার জিনিস, নিছক আলোচনার বিষয় নয়।*

---

*শোনা যায় ১৯১৮ সালে স্ত্রীকে পণ্ডিচেরী যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। কিন্তু যাত্রা-পথে কলকাতা পর্যন্ত এসে মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

॥ পনেরো ॥

য়ুরোপের জ্ঞান-গরিমায় বিভূষিত হয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর অরবিন্দ বরোদায় একে একে দশটি বছর অতিবাহিত করলেন। এই অধ্যায়ে আমরা তাই দেখব এই দশ বছরের মধ্যে তাঁর চোখের উপর দিয়ে ইতিহাসের ধারায় কি কি ঘটনা ঘটে গেল এবং সেই সব ঘটনা তাঁর মনে কিরকম রেখাপাত করল বা কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। তিনি যে একটি বিশেষ মন নিয়েই তাঁর জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। "ইংল্যাণ্ডে থাকতেই আমি স্থির করেছিলাম যে আমি ভারতের মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ করব"—একথা অরবিন্দ নিজ মুখেই বলেছেন। আর তার জন্যেই তো তিনি বরোদায় বসে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন। এই দশ বছরের মধ্যে একটির পর একটি যেসব ঘটনা তাঁর চার পাশে ঘটে যাচ্ছিল, তিনি তার নীরব অথবা নিষ্ক্রিয় সাক্ষী মাত্র ছিলেন না, গভীরভাবে সেই সব ঘটনার গতিবিধি ও তাৎপর্য পর্যবেক্ষণ করছিলেন। পর্যবেক্ষণ করছিলেন আর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার কথা নিশ্চয়ই চিন্তা করছিলেন। ঘটনা ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কেও প্রাসঙ্গিক আলোচনা করতে হবে।

প্রথমেই কংগ্রেসেব কথা বলি।

আমরা জানি, ইংল্যাণ্ডে থাকতেই অরবিন্দ কংগ্রেস সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। কেমব্রিজে থাকতেই তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কার্যাবলী বিশেষ আগ্রহ ও ঔৎসুক্য নিয়েই নিরীক্ষণ করতেন। এর প্রমাণ কংগ্রেস রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর সেই প্রবন্ধাবলী যার ভিত্তি ছিল প্রধানত ১৮৯০ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত পর পর তিনটি কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ। ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দাদাভাই নৌরোজির সভাপতিত্বে লাহোরে কংগ্রেসের নবম অধিবেশন হয়। বিলাতে ছাত্রজীবনে নৌরোজি সাহেবের নির্বাচনে বন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে মিলিতভাবে অরবিন্দ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং বক্তৃতাও করেছিলেন। এবারকার সভাপতির অভিভাষণের প্রধান বক্তব্য ছিল দুটি। ১. ভারতের জাতীয়তার বনিয়াদ দৃঢ় করার জন্য সকলের আগে দরকার ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা বর্জনপূর্বক নিজেকে ভারতবাসী বলে পরিচয় দেওয়া; ২. ইংরেজের ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বাস রাখতে হবে আর অটল রাজভক্তি দেখাতে হবে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি। দ্বিতীয় কথাটি যে অরবিন্দের মনঃপূত হয় নি তা আমরা জানতে পারি তাঁর ঐ সময়কার

কংগ্রেস সম্পর্কিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে যার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছিল আবেদন-নিবেদন নীতির তীব্র প্রতিবাদ।

১৮৯৪। এবার কংগ্রেসের অধিবেশন বসল মাদ্রাজে। সভাপতি ছিলেন আলফ্রেড ওয়েব ; ইনি জাতিতে আইরিশ। ১৮৯৫। এবারকার কংগ্রেসের অধিবেশন হয় পুণায় ; সভাপতি : রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এটি একটি স্মরণীয় অধিবেশন ছিল। এই সুরেন্দ্রনাথই একদিন বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে বলেছিলেন : "মাতৃভূমির সেবা করাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম—ইহাই ঈশ্বরের প্রকৃত সেবা।" অরবিন্দের বহু আগে এই কথাটি ভারতবাসীকে দেশপ্রেমে কি রকম উদ্বুদ্ধ করেছিল সে-ইতিহাস আজ আমরা ভুলে গেছি—মনে রেখেছি শুধু মডারেট সুরেন্দ্রনাথকে, মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথকে। এই অধিবেশনে তিনি যে ভাষণ প্রদান করেন তা শুধু দীর্ঘতম অভিভাষণ নয়, অনেকের মতে, ভারতের রাজনীতিতে সর্বদা সঙ্গে রাখার উপযোগী তাঁর এই বক্তৃতা।* তিনিই সর্বপ্রথম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে 'জাতির বে-সরকারী পার্লামেন্ট' বলে অভিহিত করেছিলেন তাঁর এই স্মরণীয় ভাষণে। ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কলকাতায় ; সভাপতি : রহিমতুল্লা মহম্মদ সিয়ানী। মুসলমান ভাইরা কেন কংগ্রেসে যোগ দেয় না, না দেওয়ার কারণ কি কি—সভাপতির ভাষণে তার উল্লেখ ছিল। হিন্দুভাবে ভাবিত অরবিন্দের যে ইহা মনঃপূত হয় নি, সেটা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। কারণ, তাঁর এক জীবনীকারের মতে, "হিন্দু-মুসলমানের পৃথক পৃথক ধর্ম সত্ত্বেও, রাজনীতিক্ষেত্রে উভয়ের ঐক্যস্থাপন প্রয়াসে তাঁহাকে কোনদিন গলদঘর্ম হইতে দেখা যায় নাই।" ১৮৯৭ সালে অমরাবতীতে কংগ্রেস অধিবেশন হয় ; সভাপতি : শঙ্করণ নায়ার। এই অধিবেশনে টিলকের ও পুণার সংবাদপত্র-সম্পাদকদের কারাদণ্ডে সুরেন্দ্রনাথ যে বক্তৃতাটি করেছিলেন তা বিশেষভাবেই স্মর্তব্য। এবারকার অধিবেশনের প্রেক্ষাপট ছিল প্লেগ দমনকল্পে বোম্বাই গভর্নমেণ্টের অত্যাচার এবং টিলকের 'কেশরী' পত্রিকায় তার তীব্র সমালোচনা ও পরবর্তী ঘটনাবলী। সভাপতির ভাষণে এসবের উল্লেখ ছিল।

১৮৯৮। এবার কংগ্রেসের অধিবেশন বসল মাদ্রাজে ; সভাপতি : আনন্দমোহন বসু। তাঁর ভাষণের মধ্যেও সেই চিরন্তন 'আবেদন-নিবেদন-নীতির' প্রাচুর্য। ১৮৯৯। এই বছরে লক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি বিদ্যাবুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, দেশপ্রেম, কর্মক্ষমতা ও চরিত্রগৌরবে সমকালীন ভারতে একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বলে গণ্য হয়েছিলেন। ইনি স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত। বরোদার মহারাজা এঁকেই সাদরে আমন্ত্রণ করে

* *এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে লেখকের 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ' গ্রন্থে।*

এনে তাঁর রাজ্যের প্রধান অমাত্যের পদে স্থাপন করেছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তাঁর ভাষণটি সমসাময়িক পত্রিকার মন্তব্য অনুসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল।* ১৯০০ সালের কংগ্রেস অধিবেশন বসল লাহোরে, সভাপতি: নারায়ণ চন্দ্রাভর্ক। মামুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন ইনি। ১৯০১। এবারকার কংগ্রেস অধিবেশন কলকাতায়, সভাপতি: দীনশা ওয়াচা। এই কংগ্রেসে সরলা দেবীর সেই প্রসিদ্ধ সঙ্গীতটি—"অতীত গৌরবকাহিনী মম বাণী, গাহ আজি হিন্দুস্থান"—দিয়ে অধিবেশনের উদ্বোধন হয়েছিল। এই কংগ্রেসেই সদ্য আমেরিকা প্রত্যাগত বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন: "পরাধীন ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান কর্তব্য বিদেশে ধর্মপ্রচার নয়, দেশকে স্বাধীন করা।" রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন বিপিনচন্দ্র এবং অবিলম্বে 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে কংগ্রেস রাজনীতিতে তিনি একটা নতুন চিন্তাধারা প্রবর্তন করেন। এই কংগ্রেসেই দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসীদের প্রতি যে অবিচার চলছিল সেইদিকে কংগ্রেসের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য উপস্থিত ছিলেন আর একজন অপরিচিত ব্যক্তি। ইনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ১৯০২ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল আমেদাবাদে, সভাপতি: রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয়বার সভাপতিরূপে এইবার তিনি একটি স্মরণীয় ভাষণ প্রদান করেন যার মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম এক নতুন সুরেন্দ্রনাথকে। "সাম্রাজ্যবাদ আমাদের উন্নতির পথে বাধা। এই সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্য সকলের সঙ্গে আমাদের সমান অধিকার নেই। আমরা নিজের দেশে বিদেশী।" আমরা জানি না, মডারেট দলের নেতার মুখে এই কথা শুনে অরবিন্দের মনে কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তবে এইটুকু আমরা জানি যে, এই কংগ্রেসে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং এইখানেই টিলকের সঙ্গে অরবিন্দের প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, "টিলক শ্রীঅরবিন্দকে প্যাণ্ডেলের বাইরে নিয়ে গিয়ে ঘণ্টাখানেক আলোচনা করেন দেশের অবস্থা সম্বন্ধে। দেশের মহান দুই নেতার নিবিড় বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারে।" ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশন অরবিন্দ স্বচক্ষে সেই প্রথম দর্শন করেন—যে মহাসভার রাজনীতির একজন তীব্র সমালোচক হিসাবেই রাজনীতিতে ঘটেছিল তাঁর অভ্যুদয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, "যুবক অরবিন্দের মনের উপর জাতির বৃহত্তর জীবনের যে সকল ঘটনা আসিয়া আঘাত করিতেছে, সেই ঘাত-প্রতিঘাতের বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত রোশনাইতে অরবিন্দের জীবনের ক্রমবিকাশকে আলোকিত করিয়া

* লেখকের 'রমেশচন্দ্র' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

দেখিতে হইবে। নতুবা নানা জটিলতাপূর্ণ তাঁহার অতি অদ্ভুত জীবনকে বুঝিতে পারিব না।" কংগ্রেসের কথা বললাম। এইবার সংক্ষেপে অন্যান্য ঘটনাবলীর (যা এই দশ বছরের মধ্যে ঘটেছে) উল্লেখ করা যাক। বঙ্কিমচন্দ্র ও মাতামহ রাজনারায়ণের মৃত্যুর কথা উল্লিখিত হয়েছে। ১৮৯৬ সালের ১৭ই অক্টোবর লোকান্তরিত হন তাঁর পিতৃবন্ধু ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ। বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক করণের জন্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ইনি বিশেষ প্রয়াস পেয়েছিলেন। ১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে প্যারিসে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের জয়ডঙ্কা বেজে উঠল, ভারতে এলো তার প্রতিধ্বনি। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই বেলুড়মঠে দেহরক্ষা করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই বছরেই বাংলাদেশে বিপ্লবকর্মের সূত্রপাত হয় ও সখারাম গণেশ দেউস্কর কর্তৃক মারাঠার বীরপূজা বাংলাদশে প্রবর্তিত হয়। এই বছরেই মহা মনীষী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্থাপন করেন 'ডন সোসাইটি' যা হয়ে উঠেছিল স্বদেশীভাবধারা প্রচারের একটি সার্থক পাদপীঠ। এইগুলির প্রত্যেকটি সম্পর্কে পরে আমরা যথাযথ আলোচনা করব।

লোকমান্য টিলকের গ্রেপ্তার, বিচার ও কারাদণ্ড ১৮৯৬ সালের একটি স্মরণীয় ঘটনা। সমসাময়িক কালে এই ঘটনাটি ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে যে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তার তুলনা নেই, বললেই হয়। বরোদায় অরবিন্দের মনেও এই ঘটনাটি গভীর রেখাপাত করে থাকবে সেই সময়। তাই এই ঘটনাটির একটু বিস্তারিত বিবরণ এখানে উল্লেখ করা দরকার। সমকালীন রাজনৈতিক ভারতেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে ইতিহাসে গণ্য হয়েছে। ১৮৯৬ ও ১৮৯৭-এই দুই বছরেই বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়েছিল। ভারতের জাতীয় জীবনে তখন নতুন তরঙ্গ তুলেছেন লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক (১৮৫৬-১৯২০)। দেশের এই দুর্দিনে দুর্ভিক্ষের জন্য প্রথমে সরকারের দ্বারস্থ হয়ে ব্যর্থ মনস্কাম হবার পর টিলক নিজেই একটি রিলিফ সংগঠন করেন। পুণা শহরে যখন প্লেগ দেখা দিল, তখন তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে সেই প্লেগ নিবারণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তারপর সরকার স্বয়ং এই কাজে অগ্রসর হলেন ও এজন্য গোরা সৈন্য নিযুক্ত করা হয়। প্লেগের চেয়ে ভয়াবহ হয়ে উঠল প্লেগ দমনের জন্য সৈন্যদের অত্যাচার। সভ্রাতা নাটু সর্দারের নির্বাসন এবং ১৮৯৭ সালের জুন মাসে দামোদর ও চাপেকার নামক দুইজন মারাঠী যুবকের গুলির আঘাতে পথিমধ্যে র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্টের নিহত হওয়া এই সময়কার একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। র‍্যাণ্ড ছিলেন পুণার প্লেগ অফিসার।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করেই টিলক তাঁর সম্পাদিত 'মারাঠা' ও 'কেশরী' পত্রিকায় অগ্নিময়ী মন্তব্য প্রকাশ করলেন। সরকারের সমস্ত রাগ তখন গিয়ে পড়ল

টিলকের উপর। অতঃপর তাঁর গ্রেপ্তার, বিচার ও কারাদণ্ডের ভিতর দিয়ে দেশের মধ্যে যেন একটা বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি হলো। সারা ভারতের দৃষ্টি তখন তাঁর উপরে নিবদ্ধ হয়েছিল, বললেই হয়। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিই গুপ্ত হত্যার প্ররোচনা দিয়ে থাকে, এই রকম একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে সরকার নিয়ে এলেন সিডিশন বিল। রমেশচন্দ্র দত্ত তখন বিলাতে। সেখানে থেকেই সংবাদপত্র মারফৎ তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং ১৮৯৯ সাল কংগ্রেস সভাপতিরূপে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের মধ্যে সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে: "সভাসমিতিতে স্বাধীনভাবে আলোচনার পথ রুদ্ধ করা আর সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার অর্থ হলো রাজদ্রোহের সৃষ্টি করা।" সেদিন প্লেগ রোগীদের জন্য হাসপাতাল খুলে, অন্নসত্র খুলে, স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে রোগীদের তদারক করে মাহামতি টিলক কংগ্রেসের বাইরে যে মহৎ কর্ম সম্পন্ন করেছিলেন তারই মধ্য দিয়ে আভাসিত হয়েছে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমরা অনুমান করতে পারি বরোদায় বসে অরবিন্দ এসব ঘটনা নীরবে লক্ষ্য করেছিলেন।

১৮৯৫ সালের ঘটনাটির কথা উল্লেখ করা হয় নি। এই সময়ে টিলক সার্বজনিক গণপতি পূজা প্রবর্তন করে জাতীয়তার একটা নতুন ব্যঞ্জনা রাখলেন আমাদের সামনে। হিন্দুত্বের ছাপ লাগল জাতীয়তায়। তারপর লোকমান্য মহারাষ্ট্রে প্রবর্তন করলেন 'শিবাজী উৎসব'—সেই একই হিন্দুচেতনার অভিব্যক্তি। "মারাঠার নব-উন্মেষিত রাষ্ট্র চেতনার সহিত হিন্দুত্বের ধর্মবোধ ও মারাঠাজাতির অতীত গৌরব বাহিনী বাণী, একত্রে মিলিত হইয়া আর এক নব-উন্মাদনার সৃষ্টি করিল।" ভারতে চরমপন্থী রাজনীতির পূর্ব সূচনা এখান থেকেই। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, টিলকের দশ বছর আগে মারাঠা জাতির অতীত গৌরবের সঙ্গে বাঙালির প্রথম পরিচয় সাধন করিয়ে দিয়েছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' উপন্যাসখানির মাধ্যমে। যাই হোক, টিলকের এই প্রয়াসের ফল যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল এবং কংগ্রেসী রাজনীতিকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হয়েছিল, তা আমরা বুঝতে পারব বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলার চেহারা থেকে। সে কথা যথাস্থানেই বলব। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে, বরোদা থাকতেই অরবিন্দ সবচেয়ে বেশি করে আকৃষ্ট হয়েছিলেন মহারাষ্ট্র-কেশরী টিলকের প্রতি এবং তাঁর প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন চিরকাল। টিলক-অরবিন্দ-প্রসঙ্গে পরে আরো কিছু বলতে হবে।

কিন্তু বরোদায় অরবিন্দের অবস্থানকালের প্রথম দশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ঘটনা হলো—ভারতে বিবেকানন্দ। উনিশ শতকের শেষ পাদে স্বামী বিবেকানন্দ

যেদিন শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় দ্বাদশ সূর্যের প্রভা নিয়ে দাঁড়ালেন, সেদিন থেকেই শুরু হলো ভারতে বিবেকানন্দের যুগ, আর কারো নয়। তাঁর মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত এই যুগের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল ভারত-ইতিহাসের দিগন্ত। সেই সঙ্গে বরোদার সেই আত্মপ্রচারবিমুখ, নিরীহ-প্রকৃতি ও নির্বাক পুরুষ অরবিন্দের মনের দিগন্তও। সবচেয়ে বেশি আলো তাঁর মনের উপর এই দশ বছরের মধ্যে যদি কেউ ফেলে থাকেন তবে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া আর কেউ নন। কারণ তখন এই ভারতবর্ষের, শুধু ভারতবর্ষ বলি কেন, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পৃথিবীর দিকে দিকে বেজে উঠেছে এই বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসীর বিজয় দুন্দুভি। সে আওয়াজ, আমরা অনুমান করতে পারি, বরোদায় গিয়ে নিশ্চয়ই অরবিন্দের কানে প্রবেশ করেছিল। সমস্ত ভারত তখন বিবেকানন্দেব জয়গানে মুখর। আসমুদ্র হিমাচল এই বিশাল দেশের জনচিত্তে স্বল্পকাল মধ্যে তিনি যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন, আধুনিক-ভারতবর্ষের ইতিহাসে তা তুলনা রহিত বললেই হয়।*

যুরোপ ও আমেরিকায় সাড়ে তিন বছর বেদান্ত প্রচারের পর স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে ফিরলেন ১৮৯৭ সালের নব বৎসরের প্রথমেই। আর তিন বছর পরেই একটি শতাব্দী শেষ হয়ে আরম্ভ হবে একটি নতুন শতাব্দী। ভারতবর্ষের মাটিতে পদার্পণ করে সেই সন্ন্যাসী দৃপ্তকণ্ঠে বললেন আমাদের, "যদি হিন্দুজাতি জীবিত থাকিতে চায়, তবে ধর্মকেই তাহার জাতীয় মেরুদণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যতদিন না তোমরা প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক হইতেছ, ততদিন ভারতের উদ্ধার হইবে না।" এ ছাড়া, পাশ্চাত্য দেশের বর্তমান অবস্থা যা তিনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন, সে সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তির মধ্যে পাই: "পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত্তি পর্যন্ত আজ বিচলিত হইয়াছে। জড়বাদের শিথিল বালুকাভিত্তির উপর স্থাপিত এই সভ্যতা একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেই হইবে। এই বিষয়ে জগতের ইতিহাসই আমাদের উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য।" তখন সন্ন্যাসীর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতি। ভারতবাসীর ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন বিবেকানন্দ। তাই দেখা যায় যে তিনি বারবার বিদ্যুতের চাবুক হেনে বলেছেন: "তোমাদের পূর্বপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব কর—তোমরা মহিমময় ঋষির বংশধর বলে গর্ব অনুভব কর—আর পরানুকরণ করিও না। তোমাদেব ভিতরে যাহা আছে, নিজ শক্তিবলে তাহা প্রকাশ কর। সেই সঙ্গে অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও, শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে। নিজেব স্বাতন্ত্র্য হারাইও না। এই ভারতের জাতীয় জীবন হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া যাইও না।...কত সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই

* লেখকের 'সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

প্রবল জাতীয় জীবনস্রোত এক বিশেষ দিকে প্রবাহিত হইতেছে। তাহা অনুধাবনপূর্বক নিজের সর্ববিধ উন্নতিসাধন করিতে করিতে চরম লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া চল।"

ইহাই ভারতে বিবেকানন্দ।

এই ছিল সেদিন, শতাব্দীর অন্তিম প্রহরে, তাঁর ভারতচিন্তার মর্মকথা।

বরোদায় অরবিন্দের মনের মধ্যে বিবেকানন্দের এই চিন্তাধারা, এইসব বলিষ্ঠ বাণী কিরকম ভাব তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। অনুমান করতে পারি যে, তিনি স্বামীজির বাংলা প্রবন্ধগুলি পাঠে আনন্দ উপভোগ করতেন, চিন্তার খোরাক পেতেন। তখন থেকেই এই বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর প্রভাব অরবিন্দের জীবনে রেখাপাত করতে আরম্ভ করেছিল। অরবিন্দের জীবন-আলোচনায় বিবেকানন্দকে আনতেই হবে, তাঁব বিভিন্ন বক্তৃতার কথা উল্লেখ করতেই হবে। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর স্বজাতিকে চলবার পথে ভবিষ্যতের জন্য যেসব কর্মপন্থার কথা বিবেকানন্দ বজ্রনির্ঘোষে বলে চলছিলেন, তা অরবিন্দের তরুণ মনকে শুধু আঘাতই করে নি, আকৃষ্টও করেছিল। যদিও সন্ন্যাসীর জীবিতকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হবার সুযোগ হয় নি অরবিন্দের, কিন্তু সেই পরিচয়টা ঘটেছিল তাঁরই মানসকন্যা নিবেদিতার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে তাঁর 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য বিজয় সম্পর্কে তিনি কতখানি গর্ববোধ করেছিলেন সে কথা সুস্পষ্টভাবেই অরবিন্দ উল্লেখ করেছেন। পরে আমরা দেখতে পাব যে, বিবেকানন্দের সমস্ত প্রেরণাকে স্বদেশী যুগের বাংলায় ফুটিয়ে তুলবার জন্য একটা আন্তরিক প্রয়াস পেয়েছিলেন অরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতার ইঙ্গিতে।

ভারতে বিবেকানন্দ নব্য হিন্দুযুগের বার্তাবহ।

ভারতে বিবেকানন্দ এক নতুন স্বদেশপ্রেমের বহ্নিশিখা।

ভারতে বিবেকানন্দ স্বাজাত্যবোধের এক অগ্নিময় চেতনা।

বরোদায় অরবিন্দ ঠিক সেই একই ভাবে ভাবিত।

বরোদায় অরবিন্দ জাতীয় জীবনের নতুন আকাঙ্ক্ষা।

বরোদায় অরবিন্দ ভবিষ্যৎ দৃষ্টিসম্পন্ন এক যুগমানব।

১৮৯৮ সালের আর একটি ঘটনা ও চরিত্রের কথা উল্লেখ করি এইবার।

এই ইংরেজি নববর্ষের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করলেন ভগিনী নিবেদিতা।

ঐ বছরের ১১ই মার্চ তারিখে এক প্রকাশ্য সভায় তাঁকে আমরা প্রথম দেখলাম। স্বামীজি নিজে কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে নিবেদিতাকে

পরিচয় করিয়ে দিলেন। "অরবিন্দের জীবনচরিত আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা এক অতি স্মরণীয় ঘটনা। কেন না, ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বাংলায় গুপ্ত সমিতির প্রবর্তক, ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের অধ্যক্ষ, 'বন্দেমাতরম্' কাগজের সম্পাদক ও 'বন্দেমাতরম্' মোকদ্দমার আসামী, পরে আলিপুর বোমার মামলার প্রধান আসামী এবং পরিশেষে 'কর্মযোগিন্' ও 'ধর্ম' পত্রিকা'র সম্পাদকরূপে যে অরবিন্দকে আমরা একের পর আর, ইতিহাসে পাইয়া আসিয়াছি—সেই অরবিন্দের সহিত ভগিনী নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই যোগাযোগ বাংলার তৎকালীন চরমপন্থী রাজনীতির উপর প্রধানত প্রতিষ্ঠিত হইলেও, অন্য অনেক বিষয়েও অরবিন্দের সহিত ভগিনী নিবেদিতার চিন্তা-ভাবনার সাদৃশ্য, অর্থাৎ এক কথায় মনের মিল ছিল। সুতরাং এই বৎসরে ভগিনী নিবেদিতাব কলিকাতায় প্রথম আগমন অরবিন্দের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা।"*

স্মরণীয় এবং অবিস্মরণীয়—দুইই।

বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-নিবেদিত-জাতীয় জীবনের একটি অপূর্ব অধ্যায়।

এই তিনটি চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য আছে, বৈষম্যও আছে—তথাপি এই তিনটি মিলিয়া একটি অপূর্ব চিত্র। কালের পটে সেই চিত্র আজ হয়ত কিছুটা ম্লান, তাব বর্ণ ও রেখা হয়ত বা অস্পষ্ট, তথাপি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, নবীন জীবনচেতনায় প্রবুদ্ধ বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের সামনে এমন বর্ণাঢ্য চিত্র বুঝি আর দ্বিতীয়টি ছিল না সেদিন। বিবেকানন্দ-নিবেদিতার চিন্তাধারার ভিতর দিয়ে এই যুগের ভাব-বিপ্লবের ভগীরথ অরবিন্দকে দেখতে ও বুঝতে না পারলে তাঁর জীবনের এই অধ্যায়টি সম্পর্কে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ হবে না, স্পষ্ট হবে না। রাজদ্রোহী অরবিন্দের মানস গঠনে বিবেকানন্দ ও তাঁর শিষ্যা নিবেদিতাব চিন্তার প্রভাব সত্যিই লক্ষ্যণীয়। তাঁর জীবনে দেশপ্রেমের যে বীজটি তাঁর চৌদ্দ বছর বয়সের সময় অরবিন্দর মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ করেছিল বলে জানা যায়, উত্তরকালে তাই কি বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-নিবেদিতার ভাবধারার বারিসিঞ্চনে মহীরুহে পরিণত হয়েছিল? ইতিহাসের কালপুরুষই এর উত্তর দিয়েছেন।

তাঁর বরোদা-জীবনের এই পর্বের আর একটি ঘটনার উল্লেখ করে আমরা এই পরিক্রমার ইতিহাস আপাততঃ শেষ করব। অরবিন্দ তখন গুজরাটের গুপ্ত সমিতির প্রেসিডেন্ট। ১৯০২ সালে বাংলায় গুপ্ত সমিতি স্থাপনের কথা প্রথম চিন্তা করলেন অরবিন্দ। পাঠালেন যতীন্দ্রনাথকে বরোদা থেকে কলকাতায় সরলা দেবীর নামে একখানি চিঠি দিয়ে। তারপরই পাঠালেন অনুজ বারীন্দ্রকে বাংলাদেশে যতীন্দ্রের কাজে সহায়তা করবার জন্য। দুজনকেই অরবিন্দ রাজনৈতিক গুপ্ত-মন্ত্রে দীক্ষা

* শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশীযুগ : রায়চৌধুরী।

দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' গ্রন্থের লেখক বলেছেন, যতীন্দ্রনাথের সাহস, উদ্যম, উচ্চাভিলাষের পরিচয় পেয়ে অরবিন্দ বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর সেই বিস্ময়ের অন্তরালে ছিল তাঁর মনের একটি নিগূঢ় কথা: অরবিন্দ যেন তাঁর কাজের জন্য এইরকম একটি লোক মনে মনে খুঁজছিলেন। তারপর কনিষ্ঠকে গুপ্ত-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে বাংলাদেশে পাঠালেন অরবিন্দ। তখনো বরোদার চাকরি পরিত্যাগ করে বাংলাদেশে চলে আসতে অরবিন্দের আরো পাঁচটি বছর বিলম্ব ছিল। পরবর্তী একটি অধ্যায়ে অরবিন্দের বিপ্লবী জীবনের প্রাথমিক পর্বের একটি যথাযথ পরিচয় আমরা দেব। তাঁর বরোদা-জীবনের প্রথম দশটি বছরের ইতিহাস পরিক্রমা করে আমরা দেখলাম যে, অরবিন্দের দৃষ্টির সামনে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটির পর একটি যেসব ঘটনা ঘটেছে, একের পর এক যেসব চরিত্র এসে দাঁড়িয়েছে, তার সবগুলিই তাঁর জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত—শুধু সম্পৃক্ত নয়, ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত বললেই হয়। এইভাবেই তো সেদিন দলে দলে বিকশিত হচ্ছিল অরবিন্দের চিত্ত-শতদল। এক অখণ্ড, অবিশ্রান্ত জীবনপ্রবাহের মধ্যে দিয়েই দেখতে হবে, বুঝতে হবে এই যুগ মানবের মহাজীবনকে।

॥ ষোলো ॥

এইবার কাহিনী থেকে ইতিহাস।

জাতীয়তার ইতিহাস।

স্বদেশানুরাগ ও স্বাজাত্যবোধের ইতিহাস।

অরবিন্দের জীবন-কাহিনীর প্রেক্ষাপটেই পরিব্যাপ্ত রয়েছে এই ইতিহাস।

তাঁর মহিমান্বিত জীবন-কথার সঙ্গে স্বর্ণসূত্রে বিজড়িত এই ইতিহাস। তাই সে-ইতিহাসটা না জানলে অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের মর্ম অনুধাবন করা যাবে না। আপাততঃ তাঁকে বরোদায় তাঁর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজের মধ্যে রেখে আমরা বিহঙ্গাবলোকন করব ভারতে জাতীয়তাব উন্মেষের ইতিহাস। অরবিন্দেব জীবনে যেমন তেমনি তাঁর সমসকার রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা যাঁরা ছিলেন—সেই আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, অশ্বিনীকুমাব, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রভৃতি সকলের জীবনে এই ইতিহাসের অপরিসীম গুরুত্ব আছে। তাঁদের সকলের চিন্তা ও কর্মকে বহুলাংশেই উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবিত করেছে ভারতের জাতীয়তার ইতিহাস। এই ইতিহাসের উদয়াচলেই একদিন ফুটে উঠেছিল জাতীয়তার অরুণ আভা। জাতির মনেব আকাশে ছড়িয়ে গিয়েছিল তার রঙ। সেই রঙ আশা ও আশ্বাসের রঙ। কালক্রমে সেই রঙ যখন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হলো, তখনি জাতি লাভ করল তার ঈপ্সিত স্বাধীনতা।

এই ইতিহাসেব যবনিকা উঠবে ১৮৫৭ সালের বিক্ষুব্ধ ভারতে।

সাতান্ন'র সেই স্মরণীয় অভ্যুত্থানই ছিল জাতীয়তার প্রথম শঙ্খধ্বনি।

পলাশির যুদ্ধের পর একশো বছর ধরে ইংরেজ বণিক কোম্পানী অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রায় সমগ্র ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালনা করবার সুযোগ লাভ করেছিল। কোম্পানীর ইতিহাস শাসন ও শোষণের ইতিহাস। রমেশচন্দ্র দত্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই শাসনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন: "কোম্পানীর আমলে ভারতে শান্তি স্থাপিত হয়েছে সত্য, কিন্তু সমৃদ্ধি আসেনি।" ভারতের অর্থনৈতিক বনিয়াদের মূলে আঘাত করে দু'হাতে তারা দেশের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতে থাকে। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল ভারতবাসীর বিক্ষুব্ধ মনোভাব। বিক্ষোভ থেকে দেখা দিতে থাকে অসন্তোষ। এই ক্রমবর্ধমান

অসন্তোষের পথ দিয়েই সহসা একদিন ঘটল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। সেই বিস্ফোরণই ইতিহাসে সিপাহী যুদ্ধ নামে খ্যাত। আমরা কিন্তু বলি সিপাহী বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল লর্ড ড্যালহৌসির অনুমোদিত স্বত্বলোপ নীতি। এই নীতির দোহাই দিয়েই তিনি ভারতের বহু সামন্ত রাজ্য কোম্পানীর শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। এটাই ছিল সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান রাজনৈতিক কারণ।

ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ এখন সাতান্ন'র বিপ্লবকে জাতীয় অভ্যুত্থান বলেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। সমর-ব্যবসায়ী সিপাহী ও গদিচ্যুত সামন্ত নৃপতিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, এই অভ্যুত্থান সত্যিই জাতীয় বিপ্লবের আকার ধারণ করেছিল। ইতিহাসের গর্ভ থেকে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের সেই প্রথম উন্মেষ দেখা গিয়েছিল। জনসাধারণের নৈতিক সমর্থন এবং ক্ষেত্র বিশেষে সক্রিয় সহযোগিতা এই অভ্যুত্থানের প্রথম থেকেই ছিল। আর যাঁরা এই বিদ্রোহকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসাধন বা তাঁদের হৃত ক্ষমতার পুনরুদ্ধারের কথা চিন্তা করেছিলেন, তা নয়। তাঁদের সকলেই, এমন কি শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ পর্যন্ত—একটা বৃহত্তর, মহত্তর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সেদিন। মোট কথা, ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে এই সিপাহী বিদ্রোহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।* সিপাহী যুদ্ধের পর ভারতবাসীর মনে যে একটা নতুন ভাবের সঞ্চার হয়েছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমকালীন বাংলা সাহিত্যেও তার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল। কবি রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' কাব্যের সেই তূর্যধ্বনি: "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে, কে পরিবে পায়।"—আজো আমরা বিস্মৃত হইনি।

এ তো গেল একটা মহৎ ঘটনার কথা।

কিন্তু তার আগেই এসে গিয়েছিলেন একজন মহৎ ব্যক্তি যাঁকে বলা যেতে পারে জাতীয়তার বীজপ্রদ পিতা। তিনি রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। অসাধারণ প্রতিভাবান এই মানুষটিই সেদিন সর্বপ্রথম য়ুরোপীয় শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ বুঝে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের ঐক্যমুখী দার্শনিকতার সঙ্গে তিনি আধুনিক য়ুরোপের যুক্তিবাদকে মিলিয়ে দিয়ে স্বজাতির মনে একটা নতুন চেতনার সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাই তো উনিশ শতকের নবজাগরণের পথ সুগম করে দিয়েছিল। ভারতে জাতীয়তার বেদী

* লেখকের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তিনিই প্রথম রচনা করেন। রামমোহন শুধু জাতীয়তারই উদ্বোধন করে যান নি, বিশ্ববোধের উদার ভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি এক অখণ্ড মহাজাতীয়তার উদ্বোধন করে গেছেন। সবচেয়ে বড কথা, আপন ভাষায় বাঙালির আত্মপ্রকাশের উপাদান তিনিই তো প্রথম জুগিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে, নিজস্ব ভাষা ভিন্ন কোন জাতির অন্তরে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ আদৌ সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন: "বর্তমান বঙ্গসমাজে বিপ্লবের আগ্নেয়-উচ্ছ্বাস সর্বপ্রথমে রামমোহন রায় উৎসারিত করিয়া দিলেন।" এই আগ্নেয়-উচ্ছ্বাসই পরবর্তীকালে বাঙালীর মনে অপূর্ব বিভায় ফুটে উঠেছিল তার নব-জাগ্রত জাতীয়তাবোধের ভিতর দিয়ে। রামমোহনকেই আমরা তাই বলব জাতির জনক ও জাতীয়তার জনক। আধুনিক ভারতবর্ষে এই গৌরব একমাত্র তাঁরুই প্রাপ্য। আমাদের জাতীয়তার ইতিহাসে রামমোহনকে কেন্দ্র-পুরুষ বললেও অত্যুক্তি হয় না।*

য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও ইংরেজি শিক্ষা আমাদের জাতীয়তা-বোধের উন্মেষে অনেকখানি সহায়তা করেছিল, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। উনিশ শতকের বাংলায় আমরা যে জাতীয় জাগরণ প্রত্যক্ষ করি তার মূলে ছিল এই ইংরেজি শিক্ষা যাকে রামমোহন সাদরে বরণ করে এনেছিলেন এই দেশে অনেকের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতীয়দের মনকে সঞ্জীবিত করল ওদেশের প্রাণবান চিন্তায়। প্রসারিত হলো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমরা তখন থেকে নতুন পৃথিবী ও নতুন স্বর্গরাজের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠতে থাকলাম। এরই ফলে আমাদের মধ্যে কালক্রমে জাগ্রত হলো এমন একটা শক্তি ও চেতনা যা উত্তরকালে ইংরেজ রাজশক্তির বন্দুক ও বেয়নেট দাবিয়ে রাখতে সমর্থ হয় নি। বাংলা তথা ভারতে ইংরেজি শিক্ষার ইতিহাসটা যাঁদের জানা আছে, তাঁদের একথা নিশ্চয়ই জানা আছে যে, সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয়তার ইতিহাসে একটি বড় রকমের দিক্‌চিহ্ন। প্রথম যুগের ইংরেজি-শিক্ষিত ভারতীয়েরা, বিশেষ করে বাঙালিরা, তাঁদের অন্তরের মধ্যে জাতীয়তার যে আহিতাগ্নি চয়ন করেছিলেন তা আর কোন দিন নির্বাপিত হয় নি।

সাতান্ন'র ঐতিহাসিক জাতীয় অভ্যুত্থান ভারতের অপেক্ষাকৃত নিস্পন্দ জীবনে নব আলোড়নের সৃষ্টি করল। আপাতদৃষ্টিতে অভ্যুত্থানটি ব্যর্থ হয়ে গেলেও

* ভারত পথিক রামমোহন রায়: রবীন্দ্রনাথ।

ভারতবাসীর সামনে এই বিদ্রোহটি স্থাপন করল একটা নতুন আদর্শ। এরই প্রভাবে বাংলার কৃষকদের মনে হঠাৎ একদিন এক পরিবর্তন দেখা গেল। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন নিভতে না নিভতে বাংলায় নীলচাষীরা উত্তোলন করল বিদ্রোহের পতাকা। স্বীকার করতেই হবে যে, ১৮৬০ সালের নীলকর আন্দোলন পরোক্ষভাবে জাতীয়তা বিকাশে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে ধ্বনিত হলো বিদেশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাতির তীব্র বিদ্রোহ। নীলকর আন্দোলন বাঙালির একটি গৌরবের ইতিহাস। নবভাবের বন্যা এইসময় থেকেই প্রবাহিত হতে থাকে। নীল আন্দোলনে এদেশের তথাকথিত বুর্জোয়ারাও দেশের চাষীদিগের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। মোটকথা, এই আন্দোলনের ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, বলা চলে এবং জাতির চিত্ততটে প্রবলভাবেই আঘাত করেছিল। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন তা কোনদিনই ভুলবার নয়। তাঁরই অগ্নিগর্ভ লেখনীমুখে সেদিন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের বিদ্যুচ্ছটা।

আমাদের জাতীয় চেতনার বিকাশের ইতিহাসে এরই পরবর্তী স্তর ছিল 'হিন্দুমেলা'। এর উদ্ভব ১৮৬৭ সালে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা দেশে যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রবাহিত হতে থাকে, হিন্দুমেলা সেই স্রোতোধারাকে প্রবল হয়ে উঠতে কম সহায়তা করে নি। তাই হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলার ইতিহাসটা আমাদের ভাল করে জানা দরকার। অবশ্য এর পূর্ববর্তী যে আন্দোলন—ব্রাহ্ম আন্দোলন—জাতীয়তার উন্মেষের পক্ষে তারও গুরুত্ব বড় সামান্য ছিল না, যদিও শ্রীঅরবিন্দ সেটা স্বীকার করেন নি। মূলতঃ ধর্মসংস্কারমূলক আন্দোলন হলেও এর একটা রাজনৈতিক রূপও ছিল এবং সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ব্রাহ্মসমাজ যে স্বাদেশিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল তা ঐতিহাসিক সত্য।

এই ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতাদের উদ্যোগেই 'জাতীয় মেলা' বা 'হিন্দুমেলা' নামে স্বদেশী ভাবোদ্দীপক একটি অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয় সিপাহী বিদ্রোহের দশ বছরের মধ্যেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, হিন্দুমেলার কিছু আগে মেদিনীপুরে অরবিন্দের মাতামহ স্থাপন করেন 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা' (১৮৬১) এবং পরে তিনি কলকাতায় এসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্থাপন করেন 'স্বাদেশিকের সভা': বেশভূষায়, কাব্যে, গানে, চিত্রে, নাট্যে, ধর্মে, স্বাদেশিকতায়, সকল বিষয়েই তাঁদের মনে এই সময়ে একটা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জেগে উঠেছিল। বাংলা দেশে নব স্বাদেশিকতার সেই

প্রথম সূচনা। সহসা বাঙালির হৃদয়ে যেন জাতীয়তার বান ডেকে উঠল, দেখা যায়। এই স্বাদেশিকতাকে জাগাবার জন্য এগিয়ে এলেন নবগোপাল মিত্র। ইতিহাসে ইনি 'ন্যাশনাল মিত্র' নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি একে একে প্রতিষ্ঠা করলেন 'ন্যাশানাল পেপার', 'ন্যাশানাল প্রেস', 'ন্যাশান্যাল স্কুল' ও 'ন্যাশনাল জিমনাসিয়াম।'

এর পরেই নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ সালের চৈত্র সংক্রান্তির দিনে 'হিন্দুমেলা' বলে একটি স্বদেশী ভাবোদ্দীপক মেলার অনুষ্ঠান করেন। এর নেপথ্য প্রেরণা ছিলেন রাজনারায়ণ বসু এবং তাঁর এই উদ্যমে সহায়তা করেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অনেকেই। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, হিন্দুমেলার দ্বিতীয় বছরের অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'মিলে সব ভারত সন্তান' এই গানটি গাওয়া হয়েছিল। বাংলা দেশে এবং সম্ভবত ভারতবর্ষে এই প্রথম জাতীয় সঙ্গীত জনসভায় গাওয়া হলো। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে হিন্দু-মেলার কথা আছে, কৌতূহলী পাঠক তা পাঠ করতে পারেন। দেখা যাচ্ছে, এই আন্দোলনের মূলে ছিল অখণ্ড-ভারত-চেতনা। বাংলায় স্বদেশী গান ও কবিতার সূত্রপাতও এই মেলাতেই হয় এবং তখন থেকেই এর মাধ্যমে দেশে স্বাদেশিকতার বন্যা বয়ে যেতে থাকে। হিন্দুমেলার মঞ্চেই আমরা প্রথম শুনলাম মোহভঙ্গের সুর। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা রাজনারায়ণের লেখায় এই সুর খুব স্পষ্ট। উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর দৌহিত্র অরবিন্দের মনে আবাল্য কি এই ভাবটা ছিল? ছিল—কারণ, এই ভাব নিয়েই তাঁর জন্ম। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, দেশের অর্থনৈতিক পরাধীনতা সম্পর্কে চেতনা, ভারতের প্রাচীন শৌর্য ও বীর্য সম্পর্কে সচেতনতা—এসবই এসেছে হিন্দুমেলা থেকে। জ্বলে উঠল জাতীয়তার আদর্শের মশাল।

এর পরেই জাতীয়তার ইতিহাসে আমরা যাঁকে পাই তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–১৮৯৪)। অরবিন্দের জন্ম-বৎসরে তিনি স্থাপন করেন 'বঙ্গ-দর্শন' পত্রিকা এবং তাঁর এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল আর একটি নবীন গোষ্ঠী যাঁরা স্বাদেশিকতা ও সাম্যের বাণী প্রচারে অগ্রণী হলেন। মোহভঙ্গের সুরটা বঙ্কিমের লেখনীতে যেন আরো চড়া পর্দায় উঠল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যলিপ্সাকে তিনি জানালেন তাঁর তীব্র ধিক্কার। তাই বলে এই কথা মনে করবার কারণ নেই যে, বঙ্কিম য়ুরোপের প্রগতিশীল ঐতিহ্য থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বরং 'তিনি এই সময়ে ইতালী ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে যে সমন্বয়বাদ-বিরোধী জাতীয়তা-বাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে'

তাঁর 'ভারতে একতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি স্মর্তব্য। বঙ্কিম য়ুরোপের অন্ধ অনুকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি দেশবাসীকে দেশের মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে আহ্বান জানালেন। হিন্দু ন্যাশনালিজমের প্রবক্তা তিনিই। অরবিন্দের রাজনৈতিক চেতনা অনেকটা এই ধাঁচেই গড়ে উঠেছিল, বলা যায়। য়ুরোপীয় আদর্শে স্বদেশপ্রীতি ও সাম্যনীতিকেই বঙ্কিমচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করতেন। 'আনন্দমঠে' 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে এই স্বদেশ মন্ত্রেরই প্রথম প্রকাশ।

'আনন্দমঠ' স্বাদেশিকতা প্রচারের পুণ্যবেদী।

অরবিন্দ তাঁর স্বদেশ চিন্তাকে এই বেদীর উপরেই স্থাপন করে দেশোদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন।

স্বাদেশিকতার প্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল এই যুগে আরো একজনের প্রচারকর্ম। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। সকলেই জানেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রচারিত অধ্যাত্মবাদের পিছনে একটি উচ্চতর সামাজিক আদর্শ বর্তমান ছিল। ইংরেজি শিক্ষিত যুবক নরেন্দ্রনাথ দত্ত রামকৃষ্ণের এই উদারপন্থী ভাবধারার টানেই তো তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদ ও প্রতীচ্যের কর্মবাদের সমন্বয়-প্রচেষ্টা সবচেয়ে মূর্ত হয়ে উঠল বিবেকানন্দের চিন্তায় ও প্রচারকর্মে। "ভারতের ধর্মকে ভিত্তি করে তোমরা গড়ে তোলো একটা য়ুরোপীয় সমাজ"—এই কথা তিনি বলেছিলেন তাঁর স্বদেশবাসীকে উদ্দেশ করে। প্রগতিশীল পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি বিবেকানন্দের ছিল গভীর সহানুভূতি। কূপমণ্ডুকতার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি জনসাধারণের অধিকারের কথাও চিন্তা করেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতীয়তাবোধের আবেদন সৃষ্টি করার জন্য তিনি লিখলেন: "হে ভারত! এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, এই দাস-সুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহিয়া তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?" এমন উদার জাতীয়তাবাদী আদর্শে তাঁর স্বজাতিকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে আর কেউ পারেন নি যেমন পেরেছিলেন বিবেকানন্দ। বলা বাহুল্য, অরবিন্দের স্বদেশচিন্তা এই খাতেই প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন, বঙ্কিম-বিবেকানন্দ প্রচারিত স্বাদেশিকতার আদর্শই বাংলার জাতীয়তাবাদের তরঙ্গকে পরিপুষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। এই স্বাদেশিকতার আদর্শটিই স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। অরবিন্দের জীবনালোচনায় এই কথাটি ভুললে অন্যায় হবে।

ভারতের জাতীয়তার বিকাশে ভারতীয় সংবাদপত্রের অবদানের উল্লেখ

অপরিহার্য। ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের সবচেয়ে সুফল ছিল সংবাদপত্রের আবির্ভাব। কোম্পানির আমলে শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত সংবাদপত্রই ছিল জনমত প্রকাশের উপায়; কিন্তু ঐসব কাগজে দেশীয় অভিমত কোনদিনই ঠিকমতো প্রতিফলিত হয় নি। এক্ষেত্রেও রামমোহন ছিলেন পথিকৃৎ। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই দেশীয় সংবাদপত্রগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাগজের প্রভাবটা যে কী বস্তু তা প্রথম প্রমাণ করলেন স্বনামধন্য সংবাদিক হরিশচন্দ্র। তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তো একটি আন্দোলনকেই জন্ম দিয়েছিল—নীলকর আন্দোলন। হরিশ-চন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর 'পেট্রিয়ট' সম্পাদনের ভার যাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছিল, সেই কৃষ্ণদাস পালও সংবাদপত্রকে যথার্থ শক্তিশালী যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিলেন এবং তখন এই পত্রিকায় জনমত এমনভাবে প্রতিফলিত হতো যেজন্য শাসকবর্গ এই পত্রিকা থেকেই জনমত সংগ্রহ করতেন। ১৮৭৪ সালে এই পত্রিকায় 'হোমরুল ফর ইণ্ডিয়া' নামে যে সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয়েছিল তা স্মরণীয় হয়ে আছে। কংগ্রেসের জন্মের দশ বছর আগে কৃষ্ণদাস পাল শাসনতান্ত্রিক উপায়ে স্বায়ত্তশাসন লাভের দাবীর কথা তাঁর কাগজে প্রকাশ করেছিলেন।

'হিন্দু পেট্রিয়টের' পরে উল্লেখ্য হলো 'ইণ্ডিয়ান মিরর'। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৬১ সালে মনোমোহন ঘোষ এই পত্রিকাটি স্থাপন করেন। বিলাত যাবার প্রাক্কালে তিনি এই পত্রিকা সম্পাদনের দায়িত্ব ন্যস্ত করেন নরেন্দ্রনাথ সেনের উপর। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রচারেব মাধ্যম হিসাবে 'মিরর' সেদিন শক্তিশালী পত্রিকা বলে গণ্য হয়েছিল এবং জাতীয়তার আদর্শ প্রচারে খুব সহায়ক হয়েছিল। এরপরে আমরা পেলাম শিশিরকুমার ঘোষের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৮৬৮)। প্রথমে বাংলা সাপ্তাহিক হিসাবে আরম্ভ হয়ে, পরে ইহা আধা বাংলা ও আধা ইংরেজি এবং অবশেষে ইংরেজি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। তারপর বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে ইহা দৈনিকে রূপান্তরিত হয় (১৮৯১)। জনমত গঠনে ও জাতীয়তার প্রচারে 'পত্রিকা' তার সুদীর্ঘ জীবনে গৌরবময় স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে। টিলক স্বয়ং এই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় রচনার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

'বেঙ্গলি' পত্রিকার নামও উল্লেখযোগ্য। স্থাপিত হওয়ার প্রায় দুই দশক পরে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের হাতে 'বেঙ্গলি' সমগ্র ভারতবর্ষের সংবাদপত্রগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করতে সক্ষম হয়। সেদিন ভারতবর্ষের মুখপত্র হয়ে উঠেছিল এই কাগজখানি। জনমতকে যে কেমন করে জাগ্রত করা যায়, সংবাদপত্র যে কতখানি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হতে পারে তার নিদর্শন ছিল সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলি'। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক জীবনকে সেদিন এই একখানি পত্রিকা কিরকম উদ্দীপ্ত করে

রেখেছিল, সে-ইতিহাস আজ আমরা বিস্মৃত হয়েছি, বললেই হয়।* জাতীয়তার উদ্বোধক যেমন, জনমত গঠনেও তেমনি 'বেঙ্গলি' পত্রিকা এদেশে সাংবাদিকতার ইতিহাসে সত্যিই যুগান্তর এনেছিল সেদিন। দেশীয় সংবাদপত্রের, বিশেষ করে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখেই তো লর্ড লিটন ১৮৭৮ সালে প্রেস আইন পাশ করে জনমতের কণ্ঠরুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। উত্তরকালে রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে এই ধারাতেই জাতীয় দলের মুখপত্র হিসাবে অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা কী যুগান্তর এনেছিল, সে-কাহিনী আমরা যথাস্থানে বলব।

স্বাধীন সংবাদপত্রের পাশাপাশি জাতীয় সাহিত্যের উদ্ভবের ইতিহাসটাও আমাদের মনে রাখতে হবে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলাদেশে আমরা এর অভ্যুদয় লক্ষ্য করি। বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধ ছিল বাংলা সাহিত্যের নির্মাণকাল, যুক্তিবাদী ক্ল্যাসিক্যাল রচনার দ্বারা এই সময়কার সাহিত্য বিশেষভাবে চিহ্নিত। দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা সাহিত্য হলো রোমান্টিকতা ও জাতীয়তার দ্বারা চিহ্নিত। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র বাংলা কাব্যে নিয়ে এলেন দেশচেতনার নবীন বাণী। নবীন সেনের কাব্যে সেই বাণী আরো উচ্চগ্রামে উঠল। নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভা মহাভারত অবলম্বনে ত্রয়ী কাব্য ('রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস') রচনা করে আমাদের জাতীয়তাবোধের একটা নতুন ব্যঞ্জনা দিয়েছিল। কিন্তু একমাত্র বঙ্কিমের প্রতিভাই এই যুগের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের যে দীপক রাগিণী তুলেছিল, জাতীয়তার যে নবীন বাণীমূর্তি রচনা করেছিলেন তারই ফলে বাঙালির মনের দুই তট দিয়ে যেন কোটালের বান ডেকে গিয়েছিল সেদিন। জাতীয়তার উদ্বোধনে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য যে যুগান্তর এনে দিয়েছিল, তার তাৎপর্যটা বরোদায় বসে অরবিন্দ গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন।

এ ছাড়া আরো কতকগুলি ঘটনা আছে, যেমন ১. সুরেন্দ্রনাথের কর্মচ্যুতি, ২. ছাত্র সভা; ৩. সিভিল সার্ভিস আন্দোলন; ৪. রামকৃষ্ণের নব্য হিন্দুত্ব; ৫. ভারতের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ; ৬. লিটনের অস্ত্র আইন ও প্রেস আইন; ৭. সুরেন্দ্রনাথের আদালত অবমাননার মামলা; ৮. ইলবার্ট বিল আন্দোলন—একের পর এক এই ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জাতীয়তার বিকাশে সহায়তা করেছিল। ইলবার্ট বিল সম্পর্কিত আন্দোলনটাই (১৮৮৩) ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে একটা দিক্-পরিবর্তন সূচিত করে দিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোভাগে। এইসব ঘটনার ভিতর দিয়ে দেশব্যাপী যে আলোড়ন-বিলোড়ন দেখা দিয়েছিল তা বৃথা হয় নি। কারণ এরই

* লেখকের 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ' দ্রষ্টব্য।

মাধ্যমে অভিব্যক্ত হতে চাইল এক বিপুল ঐক্যবোধ। যে জাতীয়তাবোধে বাঙালির সমগ্র সত্তা সেদিন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল তা ভাবিত হয়েছিল তিনটি জিনিসের সমাবেশে—স্বধর্মপ্রেম, স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রেম। ভারতীয় জাতির যুগ-যুগবাহী জীবনধারাকে অবলম্বন করেই তো নির্মিত হয়েছিল আমাদের জাতীয়তাবোধের চালচিত্রটি। আমরা দেখতে পাব, নতুন শতাব্দীর প্রারম্ভে সেই চালচিত্রে নতুন রঙের বিন্যাস। তাব শিল্পী অরবিন্দ ঘোষ।

॥ সতেরো ॥

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

অরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর।

অগ্নিযুগের বাংলায় তাঁরো উল্লেখযোগ্য একটি ভূমিকা ছিল। তখন তাঁকে আমরা দেখেছি অগ্রজের দক্ষিণ হস্তরূপে। অত্যন্ত ভালবাসতেন অরবিন্দ তাঁর এই খাম-খেয়ালি অনুজটিকে। এতক্ষণ এঁর কথা কিছু বলা হয় নি। বরোদা থেকে বাংলা—অরবিন্দের জীবনের কাহিনীর সঙ্গে বারীন্দ্রের জীবনকথাও একসূত্রে গ্রথিত, বললেই হয়। এইবার তাই এঁর বিষয় কিছু বলব। পরে অবশ্য আরো বলতে হবে। সুখের বিষয়, বারীন্দ্র তাঁর একখানি আত্মচরিত রেখে গেছেন। তাঁর জীবনের ও তাঁর সেজদার জীবনের অনেক কথাই এর মধ্যে পাওয়া যায়—পাওয়া যায় তাঁদের পারিবারিক জীবনের কথা। আমাদের আলোচনার পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন, বারীন্দ্রের আত্মচরিত থেকে ঠিক ততটুকুই উদ্ধৃত করব।*

বারীন্দ্র অরবিন্দের চেয়ে বয়সে আট বছরের ছোট ছিলেন।

১৮৮০ সালের জানুয়ারি মাসে লণ্ডনের উপকণ্ঠে তাঁর জন্ম।

দেওঘরে মাতামহের বাড়িতেই তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। কখনো কখনো দুই ভাইবোন—বারীন্দ্র ও সরোজিনী—তাঁদের পিতার কর্মস্থল খুলনায় অথবা কলকাতার বাড়িতে থাকতেন। কিন্তু কৃষ্ণধনের মৃত্যুর পর বারীন্দ্রকুমার দেওঘরে তাঁর মাতামহের বাড়িতে এসে স্কুলে পড়তে আরম্ভ করেন। তাঁর আত্মকথায় বারীন্দ্র লিখছেন: "এই বৈদ্যনাথে ১৮৯৩ সাল থেকে আমার জীবনের পাঁচটি বছর কেটেছে।...পূজোর ছুটিতে সেজদাই বছর বছর আসতেন, আর আমাকে দেশপ্রীতি ও দেশসেবার সম্বন্ধে বোঝাতেন।" দেওঘর থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিলেন (১৯০০) এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তারপর তিনি পাটনায় গেলেন কলেজে পড়তে। "পাটনা কলেজে গিয়ে ভর্তি হলুম ফার্স্ট আর্টস ক্লাসে। এর ঠিক আগেই মেজদা মনোমোহন ঘোষ সেখানকার ইংরাজির প্রফেসর ছিলেন, সবেমাত্র বদলি হয়ে ঢাকা কলেজে গিয়েছেন।

"পাটনা কলেজে পড়েছিলুম বোধ হয় পাঁচ ছয় মাস। তারপর গ্রীষ্মের ছুটিতে দেওঘরে দিদিমার কাছে যখন আছি তখন সস্ত্রীক মেজদা ঢাকা থেকে প্রথম দেওঘরে

* বারীন্দ্রকুমার যখন 'বিজলী' পত্রিকা প্রকাশ করেন এই গ্রন্থের লেখক-তখন থেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর মুখে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে অনেক কথা জানার সুযোগ হয়।

এলেন। মেজবৌদির আমাকে দেখে এত ভাল লাগলো যে মেজদাকে বলে আমাকে একরকম অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রেপ্তার করে ঢাকা নিয়ে চললেন।" লেখককে তিনি বলেছিলেন যে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে তাঁর লেখাপড়া বিশেষ কিছুই হয় নি। কারণ, এই সময়টা তাঁকে 'কৃষির স্বপ্ন' পেয়ে বসেছিল। কিন্তু, অর্থাভাববশত তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে পারে নি। "মেজদা বলেছিলেন, কলকাতায় গিয়ে যোগাড়যন্ত্র কর টাকা আমিই না হয় দেব। আমি চলে এলাম কলকাতায়, মেজদাদা টাকা দিলেন না। কৃষির স্বপ্ন হাওয়ায় উড়ে গেল।" বারীন্দ্রকুমারের জীবনের ট্র্যাজেডি এই যে, তাঁর জীবনের অনেক স্বপ্নই এইভাবে হাওয়ায় উড়ে গিয়েছিল— তিনি তাঁর জীবনের স্থিতিভূমি কোনদিনই খুঁজে পান নি, যেমন পেয়েছিলেন তাঁর অগ্রজ তিনজন, বিশেষ করে তাঁর বিশ্ববরেণ্য তৃতীয় অগ্রজ শ্রীঅরবিন্দ।

মেজদাদার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ফলে বারীন্দ্রকে অগত্যা বাধ্য হয়ে কলকাতা থেকে আবার দেওঘরে চলে আসতে হয়েছিল। "তিনি আমাকে টাকা দেবার আশা দিয়ে দেশে পাঠালেন, কিন্তু পরে জানালেন, তিনি টাকা দিতে অসমর্থ, কারণ তাঁর ছেলেপুলে হচ্ছে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার দায় আছে, ভাবী কন্যাগুলির বিবাহাদির উপায় করতে হবে।" চির অস্থিরচিত্ত বারীন্দ্রের আত্মকথা পাঠে জানা যায় যে, তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার পর দেওঘর থেকে যাত্রা শুরু করে পাটনা-ঢাকা-কলকাতা ঘুরে আবার দেওঘরেই ফিরে এলেন। ইচ্ছা করলে তিনি ঢাকা অথবা বরোদায় থেকে লেখাপড়া করতে পারেন, কারণ এই স্থানেই তাঁর দুই অগ্রজ ছিলেন কলেজের অধ্যাপক। আসল কথা, তাঁর তখন লেখাপড়ায় আদৌ মন ছিল না। অতঃপর তিনি কি করলেন? আবার কলকাতায় এলেন, উঠলেন একটি মেসে টাকার যোগাড়যন্ত্র করবার জন্য। কৃষির স্বপ্নটা তখনো পর্যন্ত হাওয়ায় একেবারে উড়ে যায় নি।

"দু তিন মাসের টাকা মেসে দেনা জমে গেল, ম্যানেজার মুখ অন্ধকার করে তাগাদা জানাতে লাগলেন। কোন উপায় না দেখে আমি গেলুম উডল্যাণ্ডে কুচবিহার রাজবাড়িতে বড়দার কাছে। বড়দা আমার দুঃস্থ অবস্থার কথা শুনে বললেন, আচ্ছা অমুক দিন আসিস, যা পারি দেব। নির্দিষ্ট দিনে সকাল আটটায় গিয়ে দেখি দাদা ঘুমুচ্ছেন। আমাকে দেখে বালিসের তলায় হাত দিয়ে ত্রিশ না চল্লিশ টাকার নোট বার করে দিলেন, বললেন—এই নে, পরে আবার দেব।" টাকা চাই। উপায়ন্তর না দেখে, কলকাতায় তাঁর বাবার একখানি বাড়ি (যেটি কৃষ্ণধন তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীকে দিয়ে* গিয়েছিলেন) জলের দরে বিক্রী করে মেসের দেনা

* আত্মচরিতে বারীন্দ্র যাঁকে 'রাঙা মা' বলে উল্লেখ করেছেন, তিনিই কৃষ্ণধন ঘোষের দ্বিতীয়া স্ত্রী। এঁকে তিনি আইনসম্মতভাবে বিয়ে করেছিলেন কি না, তা সঠিক জানা যায় না। তবে উইলে এঁকে তিনি কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন।

মেটালেন। উদ্বৃত্ত যা ছিল তাই সম্বল করে বারীন্দ্র পাটনায় গিয়ে একটা চায়ের দোকান খুললেন। কৃষি-কর্মের সেই স্বপ্ন অবশেষে কিনা পরিণত হলো চায়ের দোকানে! "পাটনা কলেজের গেটের সামনে বাঁ দিকে রাতারাতি সাইনবোর্ড উঠলো: বি. ঘোষের চায়ের দোকান—এক পেয়ালা দুই পয়সা—স্বাদে উত্তম! রাঙা মাকেও কাছে এনেছি, একটা চাকর রেখেছি, আর চায়ের দোকান ফুলে ফেঁপে চপ-কাট্‌লেটের দোকানে পরিণত হয়েছে! ভিতর বাড়িতে মা রাঁধতেন মাংসের কারি, চপ্ ও কাট্‌লেট, আর আমি তা চায়ের মজলিসে বেচতুম মাখন, রুটি ও ডিমের সঙ্গে সঙ্গে।"

বি. ঘোষের চায়ের দোকানও বেশি দিন চলে নি। কোন এক বন্ধুর কাছ থেকে শ'খানেক টাকা ধার করেও শেষ রক্ষা হয় নি। দেখা যাচ্ছে, "কোন কিছুকেই গড়িয়া তুলিয়া তাহাকে সার্থকতার পথে লইয়া যাওয়ার প্রতিভা বারীন্দ্রকুমারের" মধ্যে আদৌ ছিল না। "একটা রঙীন নেশায় যে কাজ তিনি আরম্ভ করেন, তাহার শেষ রক্ষা করিতে পারেন না।" স্বদেশী যুগের বাংলায় সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিতে গিয়েও তিনি পুরোপুরি কৃতকার্য হতে পারেন নি। জীবনে কোন্ কাজটাতেই বা তিনি সফলতা অর্জন করতে পেরেছেন? পরবর্তী কাহিনী তাঁর নিজের মুখেই শোনা যাক।

"রাঙা মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি স্থির করলুম যে, বরোদায় সেজদা শ্রীঅরবিন্দের কাছে গিয়ে কিছু মূলধনের চেষ্টা করবো।...পরের দিন ভোরের ট্রেনে আমিও বাঁকিপুর ত্যাগ করলুম, আর বি. ঘোষের স্টলের চটকদার সাইনবোর্ডখানি হঠাৎ গেল উঠে। আমি যে মাণিকতলা বাগানের বোমারে বারীন ঘোষ হতে চলেছি তা তখন আমিই বা জানবো কি করে? সেজদা অরবিন্দ তখন বরোদা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল কি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি তা আমার স্মরণ নেই।" তারপর তিনি যখন বরোদায় এসে পৌছলেন তখন তাঁর অগ্রজ কনিষ্ঠকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মুখে চায়ের দোকানের ব্যবসার কথা শুনে ততোধিক বিস্মিত হয়ে থাকবেন অরবিন্দ। বারীন্দ্র বরোদা গিয়েছিলেন তাঁর সেজদার কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায়, লেখাপড়া করবার জন্য নয়। তারপর?

'সেজদাকে অনেক ইঙ্গিত ইসারা দিয়েও বাঁকিপুরের চায়ের দোকানের জন্য টাকা বের হলো না। তিনি স্পষ্ট হ্যাঁ-না, কিছুই না বলে—বোবার শত্রু নেই নীতিটি অনুসরণ করে যেতে লাগলেন। টাকার সম্বন্ধে সেজদার কস্মিন্‌কালে মায়া ছিল না। কিন্তু যেটা পছন্দ করতেন না সেটার সিদ্ধির উদ্দেশ্যে উপুড় হস্ত করবার পাত্র তিনি নন।" অরবিন্দের এই অনুজটি চিরকালই খেয়ালী প্রকৃতির মানুষ

ছিলেন। বাঁকিপুর থেকে সংবাদ এলো সেখানে ভীষণ প্লেগ আরম্ভ হয়েছে। রাঙা মার জন্য দুশ্চিন্তা হলো বারীন্দ্রের। তিনি পাটনায় ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু ভাড়ার টাকা পেলেন না সেজদার কাছ থেকে। অগত্যা সেখানেই রয়ে গেলেন এবং "নিশ্চিন্ত আলস্যে কবিতা লেখা, নভেল পড়া, সবজীবাগ আর শিকার" আরম্ভ করে দিলেন। দেখা যাচ্ছে, তখনো পর্যন্ত বারীন্দ্রের জীবনের ভবিষ্যৎ গতি একরকম অনিশ্চিত ছিল। তারপরে তিনি লিখছেন:

"তখন মহারাষ্ট্রের গুপ্ত-সমিতির নেতা ঠাকুর সাহেব জাপানে। গুজরাটের গুপ্ত-চক্রের দেশপতি (প্রেসিডেণ্ট) বরোদায়ই আছেন। তাঁর কাছে আদেশ পেয়ে বরোদা সেনা বিভাগের কাজ ছেড়ে দিয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় চলে গেছেন এবং সেখানে গুপ্ত-সমিতি গড়ে তুলেছেন। আমার ডাক পড়লো বাংলাদেশের তরুণদের ও ছাত্র সমাজের মনের ভূমিতে স্বাধীনতার বীজ বপন করবার জন্যে। যতীন দা' কয়েকজন মাতব্বর ধরে টাকারই নাকি ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, তরুণদের হৃদয় জয় করতে পারেন নি। আমাকে বাংলাদেশে গিয়ে সেইটি করতে হবে।"

অতঃপর অগ্রজ অরবিন্দের নিকট গুপ্ত-মন্ত্রের দীক্ষা পেয়ে যতীন্দ্রের পর বারীন্দ্র এলেন বাংলাদেশে গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য। এ ঘটনা ১৯০২ সালের। এবার নতুন ইতিহাস রচিত হবার শুভক্ষণ আসন্ন হয়ে এলো। এইখানে আবার একটু ইতিহাসের কথা উল্লেখ করতে হয় যেটা না জানলে এই গুপ্ত-সমিতির ব্যাপারটা পাঠকদের নিকট পরিষ্কার হবে না। শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব বক্তব্য এ-বিষয়ে কি আছে, সেটাই আগে দেখা যাক। তিনি লিখছেন: "উদয়পুর রাজ্যে ঠাকুর-পদবীধারী একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বোম্বাইতে যে গুপ্ত-সমিতি ছিল এই ঠাকুর সাহেব তার সভ্য ছিলেন না। তিনিই ছিলেন সমগ্র গুপ্ত আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। মহারাষ্ট্রে ও সেখানকার রাজ্যগুলিতে গুপ্ত-সমিতি গঠনের জন্য বোম্বাইয়ের গুপ্ত-সমিতি তাঁকে সর্বপ্রকার সহায়তা করত। তিনি প্রধানত ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে কাজ করতেন এবং এইভাবে তিনি দুই কি তিনটি সৈন্য দলের মধ্যে বিশ্বাস উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমি কয়েকবার মধ্য ভারতে গিয়ে এইরকম একটি সৈন্যদলের কয়েকজন ছোটখাটো অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম ও তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলাম।"*

তাঁর এক জীবনীকারের মতে, ১৯০২ সাল থেকেই অরবিন্দ রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে ঝাঁপ দেবার কথা চিন্তা করেছিলেন এবং সেই সময় যেসব গুপ্তচক্র ইংরেজ শাসনের কবল থেকে ভারতের মুক্তির জন্য গভীরভাবে সক্রিয়

* অন হিমসেলফ: শ্রীঅরবিন্দ।

হয়ে উঠেছিল। তাদের প্রয়াসের সঙ্গে তিনি তাঁর প্রয়াসও মিলিয়ে দিতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই কয়েকজন অগ্রবর্তী নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন গুপ্ত-সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে—যে সমিতি সময় উপস্থিত হলেই কাজে নেমে পড়বে। কিন্তু তখনো পর্যন্ত তাঁর পক্ষে প্রকাশ্যে এ বিষয়ে কিছু করার উপায় ছিল না। গুপ্ত-সমিতির কার্যসূচীর মধ্যে ছিল স্বরাজ, বয়কট ও স্বদেশী। স্বরাজ বলতে অরবিন্দ সামান্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বুঝতেন না,—তিনি বুঝতেন পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। দেখা যাচ্ছে, তাঁর বরোদা-জীবন কেবলমাত্র বিদ্যাচর্চা, বুদ্ধিচর্চা, পাণ্ডিত্য অর্জন বা আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সেই একই সময়ে নিজেকে বৈপ্লবিক প্রয়াসের কাজেও তিনি নিয়োজিত রেখেছিলেন। আইরিশ বিপ্লবী নেতা পার্নেলের ভাবধারায় নিষ্ণাত ছিল তাঁর হৃদয়-মন, তাঁর লণ্ডনের সেই ছাত্রজীবন থেকেই। তিনি আগাগোড়াই পার্নেলের গুণমুগ্ধ—এবং তাঁর দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত। বিবেকানন্দের শিষ্যা নিবেদিতা যখন মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল ছিলেন, তখন লণ্ডনে তিনি যেমন রুশীয় বিপ্লবী প্রিন্স ক্রোপট্‌কিনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, তেমনি দেখা যায় যে, কেমব্রিজে অধ্যয়নকালে অরবিন্দও আয়ার্ল্যাণ্ডের এই মহান্ নেতা পার্নেলের দ্বারা প্রায় একই সময়ে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। আবার উত্তরকালে ক্রোপট্‌কিন-প্রভাবিতা নিবেদিতার সঙ্গেই বাংলায় একই কর্মক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন পার্নেল-প্রভাবিত অরবিন্দ। ইতিহাসের এ এক বিচিত্র রহস্য।

তাঁর লণ্ডনের ছাত্রজীবনে সেই 'লোটাস য়্যাণ্ড ড্যাগার' গুপ্তসমিতির কথা আগেই বলেছি। ভারতে যে বিপ্লববাদ অরবিন্দ নিয়ে এসেছিলেন তার প্রথম বীজবপন ঐ গুপ্তসমিতিতেই হয়ে থাকবে যদিও সেই সমিতির অকালমৃত্যু ঘটেছিল। সেদিন প্রবাসে যাঁরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার পণ নিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, অরবিন্দ ছিলেন তাঁদেরই একজন। অন্যদের কথা জানি না, তবে অরবিন্দ যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন তা তিনি বিস্মৃত হন নি তো বটেই, বরং এই কথা বলা চলে যে, সেই প্রতিজ্ঞা তাঁর হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল। তাঁর স্বভাবের মধ্যে তরল ভাবালুতা কোনদিনই স্থান পায় নি। গুপ্তসমিতি বা বিপ্লবী গুপ্তচক্র ওদেশের পক্ষে নতুন জিনিস ছিল না। এই ধরনের সমিতি ছিল আয়ার্ল্যাণ্ডে, ছিল ইতালিতে, ছিল রাশিয়ায়। ইংল্যাণ্ডে অধ্যয়নরত ভারতীয় তরুণ যুবকদের কাছে এই ধরনের আদর্শ খুবই আকর্ষণীয় বলে মনে হলো। এই আকর্ষণেরই পরিণতি ছিল ভারতে বিপ্লববাদ যা সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল বাংলা দেশে ও মহারাষ্ট্রে। যে ব্রিটিশ শাসননীতির ফলে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল, ঠিক সেই একই শাসনের দমননীতির ফলে বিপ্লবের ক্ষেত্রটা আগে

থেকেই প্রস্তুত ছিল, প্রয়োজন যা ছিল তা হলো বীজবপন ও বারিসিঞ্চন। ইতিহাসের নেপথ্য বিধানে এই দুটি কাজ সম্পন্ন করার জন্যই প্রয়োজন ছিল একটি বিশেষ ব্যক্তির।

তিনিই অরবিন্দ ঘোষ।

নিজের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুযায়ী নিঃশব্দে ও অনাড়ম্বরেই তিনি বিপ্লবের প্রস্তুতি কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন: "শ্রীঅরবিন্দ নিজে কখনো প্রত্যক্ষভাবে অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া অথবা বোমা প্রস্তুত করা, অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা অথবা সামরিক আয়োজন করার দিক দিয়ে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি। তিনি করেছিলেন শুধু উৎসাহ জাগানোর কাজ, যারা ঐসব দলে যোগ দিত তাদের নৈতিক দিকটা যাতে সুদৃঢ় হয় সেই বিষয়েই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ১৯০১ সালের পরে যখন তাঁর ছোট ভাই বারীন্দ্র তাঁর কাছে এসে রইলেন, তখন থেকেই শ্রীঅরবিন্দ এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে শুরু করেন। কিন্তু ১৯০২ সাল পর্যন্ত বিশেষ কোন কাজ হয় নি, সংঘবদ্ধ করবার প্রকৃত চেষ্টা শুরু হয়েছিল তার পরে।"*

ঠিক এই সময়েই আমরা দেখতে পাই, ভারতের যৌবন শক্তিকে অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ—প্রবুদ্ধ করে তুলেছেন তাদের এক নতুন স্বদেশ চেতনায়। এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার অল্পকাল পূর্বে মেঘমন্দ্রিতস্বরে বাঙালি যুবকদের স্বামীজি বললেন—নির্বীর্যতা আধ্যাত্মিকতা নয়; বললেন, এখন থেকে আগামী পঞ্চাশ বছর কাল তোমার দেশই তোমার আরাধ্যা হোন। স্বদেশপ্রেমের এই যে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা সেদিন তরুণদের অন্তরে জ্বেলে দিয়েছিলেন তিনি, মনে রাখতে হবে, পরোক্ষভাবে তা আসন্ন বিপ্লবের ক্ষেত্রকে অনেকখানি প্রস্তুত করে দিয়েছিল। অরবিন্দের বিপ্লবচিন্তার মূলে স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশচেতনাকে আমরা যেন স্পষ্টভাবেই দেখতে পাই। তিনিও এই সময় পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, "সারা দেশময় বাছা উৎসাহী যুবকদের নিয়ে বিস্তর ছোট ছোট দল তৈরি করা হোক, যারা গোপনে কাজ করে যাবে আর দেশের জন্য যারা প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। তারা সব রকমের কষ্টই সহ্য করতে শিখবে, এবং অস্ত্রবিদ্যা ও সামরিক রীতিনীতিতে সুদক্ষ হবে।" এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অরবিন্দ ভিন্ন আরো দুজন ব্যক্তি এই সময় ভারতে এই রকম একটি বৈপ্লবিক সংগঠনের কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁরা হলেন লোকমান্য টিলক ও পাঞ্জাবকেশরী লাজপত রায়। এঁরাও অরবিন্দের মতো চরমপন্থী নেতা ছিলেন।

* মহাযোগী: দিবাকর।

যে বৈপ্লবিক সংগঠনের কথা অরবিন্দ চিন্তা করেছিলেন, যদিও তা শেষ পর্যন্ত নিছক সন্ত্রাসবাদ ও গুপ্তহত্যায় পর্যবসিত হয়েছিল, তার আসল লক্ষ্য ছিল প্রকাশ্যভাবে একদিন সশস্ত্র বিদ্রোহের অবতারণা করা। সেটা সম্ভব হলে তাতে ভারতীয় সেনাদলের যোগ দেওয়া অসম্ভব ছিল না, কারণ তাদেরও তলে তলে এইভাবে সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করে তোলা হবে। এই উদ্দেশ্যেই তো অরবিন্দ প্রথমে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্র অন্যভাবে অগ্রসর হয়ে প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং এই দলের সঙ্গে অরবিন্দের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কতখানি ছিল, কিংবা আদৌ ছিল কিনা, তা আজ অনুমান করা কঠিন। তবে একথা ঠিক, "যে সকল যুবক সুনিয়ন্ত্রিত বিপ্লব সৃষ্টির পূর্ব-পরিকল্পনাকে আঁকড়ে রইল, তাদেরই তিনি অনুপ্রেরণা দিতে থাকলেন। একথা আজ আমরা সুনিশ্চিত-ভাবেই অনুমান করতে পারি যে, বিপ্লবকে অরবিন্দ কোনদিনই লঘুভাবে দেখেন নি, তিনি সে প্রকৃতির মানুষই ছিলেন না—বরং এ সম্পর্কে তাঁর ছিল একটি সুবৃহৎ ও সুমহৎ পরিকল্পনা।

বাংলার রাজনৈতিক আবর্তে পুরোপুরি ঝাঁপ দেবার আগে অরবিন্দ গোপনে বাংলা দেশে কয়েকবার এসেছিলেন এবং সেই সময়ে তিনি এখানকার কয়েকজন বাছা বাছা বিপ্লবীদের সঙ্গে বাংলায় গুপ্তসমিতি গঠন সম্পর্কে যে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, এর প্রমাণ পাই হেমচন্দ্র কানুনগোর 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' শীর্ষক গ্রন্থে। সেই সময় অরবিন্দ, শুধু বাংলা দেশ বা কলকাতায় আসেন নি, তিনি ১৯০২ সালের প্রথম ও শেষভাগে মেদিনীপুরে হেমচন্দ্র কানুনগোর বাড়িতে দু-দুবার গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন তিনি খুলনা, ঢাকা, রংপুর এবং আরো কয়েকটি স্থানে। মনে হয়, বাংলা দেশে বিপ্লব সংগঠনের প্রাথমিক কাজটা তখন থেকেই রীতিমত শুরু হয়ে গিয়েছিল। অরবিন্দ নিজেও একবার উল্লেখ করেছেন "কতদূর কী করা যেতে পারে, সেটা দেখবার জন্যই আমি সেই সময় দু'একবার বাংলা দেশে গিয়েছিলাম। তবে তখনো পর্যন্ত আমি নেপথ্য থেকে নিঃশব্দেই কাজ করতাম। প্রকাশ্যে কাজ করার সময় তখনো পর্যন্ত আসে নি।"

তাঁর নিজস্ব বক্তব্য এখানে আরো একটু তুলে দেওয়া দরকার। অরবিন্দ লিখছেন: "বাংলা দেশে যে কয়টি গুপ্তচক্র ইতিমধ্যে গঠিত হয়েছিল তা স্বচক্ষে দেখবার জন্য আমি যুগান্তর দলে বারীনের সহকর্মী দেবব্রত বসুর সঙ্গে কয়েকটি স্থানে গিয়েছিলাম এবং সেই সময় কয়েকটি জেলায় নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমার এই পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল

দেশের মনোভাব আর বৈপ্লবিক আন্দোলনের সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণ করা। তখন আমার এই অভিজ্ঞতা হলো যে, দেশের মধ্যে যদি একটা ব্যাপক গণ আন্দোলন না হয় তা হলে এই জাতীয় গুপ্ত কাজকর্ম বা এর উদ্যোগ-আয়োজন কিছুই ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমি তখন সেই রকম একটি গণ আন্দোলনের কথাই চিন্তা করেছিলাম যার ফলে সৃষ্টি হবে একটি সর্বজনীন দেশাত্মবোধের উত্তেজনা এবং যার ফলে ভারতীয় রাজনীতির উদ্দেশ্য ও আদর্শ হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতার ভাবটাকে করে তুলবে জনপ্রিয়। এই বিশ্বাসই আমার পরবর্তী কার্যক্রমকে নির্ধারিত করে দিয়েছিল।"

এইবার অরবিন্দের এই বক্তব্যের সঙ্গে হেমচন্দ্র কানুনগোর বিবরণটা মিলিয়ে দেখা যাক; তাহলেই বাংলায় বিপ্লবের উদ্যোগপর্বটার একটি সঠিক চিত্র আমরা পাব। তিনি যা লিখেছেন তার সারমর্ম হলো এই: "গুপ্ত-সমিতির শাখাকেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তখন পরিকল্পনা রচিত হচ্ছিল। হেমচন্দ্রকে অরবিন্দ স্বয়ং গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে সমিতির সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন। এই দীক্ষা দেওয়া হতো দীক্ষার্থীকে 'সত্যপাঠ' পড়িয়ে। ১৯০২ সালের মাঝামাঝি অরবিন্দের কাছে হেমচন্দ্র প্রথম জানতে পারেন যে বাংলা দেশে গুপ্তসমিতি স্থাপনের চেষ্টা চলছে এবং বাংলা দেশ ছাড়া ভারতের সর্বত্র গুপ্তসমিতি স্থাপিত হয়ে গেছে। কলকাতায় অনেক বড় বড় লোক অরবিন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। কিছুদিন পরে হেমচন্দ্র জানতে পারেন যে সমস্ত ভারত ইংরেজ তাড়াবার জন্য তৈরি। করদরাজ্যগুলি এবং প্রত্যেক প্রদেশের লক্ষ লক্ষ সৈন্য তরবারি শানাচ্ছে। এমন কি পার্বত্যজাতিদেরও হাজার হাজার লোক তৈরি। খালি বাংলা দেশ তৈরি নয় বলে তারা প্রকাশ্যে কিছু করতে সক্ষম হচ্ছে না। এক বছরের মধ্যেই বাংলা দেশকে তৈরি করে ফেলতেই হবে। কামান, বন্দুক প্রভৃতি হাতিয়ারের জন্য চিন্তা করতে হবে না এতটুকু। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কাপ্তেন, জেনারেল প্রভৃতি সব তৈরি, কিন্তু বাঙালি কমাণ্ডার ও কাপ্তেন তো চাই। যে আগে যোগ দেবে তাকেই এইসব পদগুলি দেওয়া হবে। যতীন্দ্রের কাছে তখন অরবিন্দ বাবু সম্পর্কে এই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল যে, তিনি একজন অসাধারণ বিদ্বান ও রাজনীতিতে তিনি বিশেষজ্ঞ।"

বাংলার ভাবী বিপ্লবীরা তখন থেকেই নিশ্চয় করে বুঝে ফেলেছিলেন যে, একা অরবিন্দ ঘোষই একশো। তাঁদের আর কোন বিষয়ে মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না। শুধু আদেশের অপেক্ষা। সে আদেশ পালনে দ্বিধার কোন প্রশ্নই ছিল না কারো মনে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, হেমচন্দ্র প্রভৃতির মনে তখন থেকেই অরবিন্দ সম্পর্কে কী উচ্চ ধারণাই না সুদৃঢ় হয়েছিল। এইখানেই তো তাঁর বিচিত্র ব্যক্তিত্ব

আর দৈবী প্রতিভার কথা আমাদের মনের মধ্যে স্বতই জাগে। তাঁর নেতৃত্বের স্বাতন্ত্র্য তো এইখানেই। অরবিন্দকে তাঁর প্রথম দর্শনের কথা হেমচন্দ্র এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "একদিন বিকেলে দেখলাম জ্ঞানবাবু অরবিন্দবাবুকে আমাদের বাড়ি নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে ছিল আমাদের স্বনামধন্য বারীনদা। গুরুর প্রতি ভক্তি তো আগে থেকেই পুরোমাত্রায় গজিয়েছিল। অধিকন্তু আমার মেদিনীপুরের বাড়িতে তাঁর অযাচিত শুভাগমনটাই আমার কাছে একটা মস্ত জিনিস।"

আমরা দেখলাম, বিচিত্র তাঁর বরোদা-জীবন।

এই সুদীর্ঘ সময় অরবিন্দ শুধু অধ্যয়ন নিয়েই ছিলেন না।

ছিলেন না অধ্যাপনা আর সাহিত্যকর্ম নিয়ে।

এমন কি ছিলেন না তিনি সদ্য বিবাহিত জীবনের সুখ-স্বপ্ন নিয়ে।

বরোদা-জীবনের সপ্তম কি অষ্টম বৎসর থেকেই অরবিন্দ যে বাংলাদেশে সমিতি প্রতিষ্ঠাকল্পে গভীরভাবেই চিন্তা করছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়। তিনি যে আগুন নিয়ে খেলা করতে উদ্যত হয়েছেন, নব-পরিণীতা সহধর্মিণীকে ঘুণাক্ষরেও তা জানতে দেন নি। "অনেক চিন্তা করিয়াই তিনি স্ত্রীর নিকট গুপ্তসমিতির কথা গোপন করিয়াছেন। ইহাতে অরবিন্দের সংযম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।" মাত্র আর কয়েক বছর পরে কণ্টকময় পথে যিনি বিচরণ করবেন তাঁর কাছে এইটাই ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের আরো কিছু জানবার দরকার আছে। অরবিন্দের বিপ্লব-দর্শনের মূল কথা ছিল রক্ত ও অগ্নি স্নানের ভিতর দিয়ে জাতিকে পরিশুদ্ধ করা এবং দেশের জনসাধারণের মনে একটি প্রচণ্ড ইংরেজী-বিদ্বেষ জাগিয়ে দেওয়া। যাদের তিনি বিপ্লবের কর্মের জন্য নির্বাচিত করতেন, তাদের প্রত্যেককে অভিষিক্ত করবার সময় তিনি তাদের এক হাতে দিতেন গীতা, অন্য হাতে তলোয়ার। আর যে মন্ত্র পাঠ করিয়ে এই কাজটা সম্পন্ন করা হতো তার নাম ছিল 'সত্যপাঠ'। এটি অরবিন্দ স্বয়ং সংস্কৃতে রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। স্বপ্নদর্শী বিপ্লবী তিনি ছিলেন না, তাঁর কাছে বিপ্লব ছিল একটা জীবন্ত সত্য, একটা ধর্মবিশেষ। তিনি যাদের অভিষিক্ত করতেন তাঁদেরই একজনের মুখে লেখক এই কথা শুনেছিলেন। অরবিন্দের নিজের উক্তির মধ্যে আমরা আর একটি কথা পাই। তিনি একটি গণ আন্দোলনের প্রত্যাশা করছিলেন যার ফলে দেশের সর্বসাধারণের মনের মধ্যে জাগবে একটা সর্বাত্মক দেশপ্রেমের অনুভূতি এবং তার ফলেই সার্থক হবে বৈপ্লবিক প্রয়াস। তিনি যে একজন কতবড় দূরদর্শী ছিলেন তারই আভাস আমরা পাই এখানে। আর মাত্র কয়েক বছর পরেই স্বদেশী আন্দোলনের মতো একটা ব্যাপক গণ আন্দোলন যে বাংলাদেশে ঘটবেই, এটা কি তিনি তখন বুঝতে পেরেছিলেন? নিশ্চয়ই পেরেছিলেন।

এই সময়ে অরবিন্দ বাংলাদেশে এসে স্বয়ং যাদের বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা দান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্র, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, সত্যেন বসু (ইনি সম্পর্কে অরবিন্দের মাতুল), দেবব্রত বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর) এবং আড়বালিয়ার অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। এই শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত পার্শ্বচর ও দেহরক্ষী। বরোদার পর যে চার বছর অরবিন্দ কলকাতায় ছিলেন সেই সময়ে তাঁর তত্ত্বাবধানের সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ইনি। অরবিন্দ এঁকে 'অবি' বলে ডাকতেন। অরবিন্দের গ্রেপ্তারের সময় গুরু-শিষ্যের হাত দুখানি একই হাতকড়ায় আবদ্ধ করা হয়েছিল, অবিনাশচন্দ্রের মুখে লেখক এই কথা শুনেছিলেন। ইনিও তাঁর গুরুর মতো নির্বাক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। একজন জাপানী ভদ্রলোকও নাকি এই সময়ে অরবিন্দের নিকট বিপ্লবের দীক্ষা নিয়ে গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেছিলেন। এইভাবেই সেদিন তিনি মাত্র কয়েকজন অনুচর নিয়ে আরম্ভ করেছিলেন তাঁর গুপ্তসমিতির প্রথম পর্ব। এই যে বাংলাদেশের সূতিকাগারে ভূমিষ্ঠ হলো গুপ্তসমিতি এবং অন্ধকারময় গুপ্ত দ্বার পথে রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন অরবিন্দ এর দুটো ঐতিহাসিক কারণ ছিল।

আগেই বলা হয়েছে, ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করে অরবিন্দ সর্বপ্রথম আক্রমণ করলেন কংগ্রেস রাজনীতি যার অপর নাম ছিল ভিক্ষানীতি। এই ভিক্ষানীতির ব্যর্থতাই গুপ্তসমিতি সৃষ্টির একটা প্রধান কারণ। অরবিন্দ বুঝেছিলেন, কংগ্রেসী ভিক্ষানীতি দ্বারা প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করা যাবে না। অতএব অন্য উপায় প্রয়োজন। এর ঠিক আট বছর পরে আমরা দেখতে পাই যে, আমেরিকা থেকে সদ্য প্রত্যাগত বিপিনচন্দ্র পাল 'নিউ ইণ্ডিয়া' কাগজ প্রকাশ করলেন এবং তিনিও কংগ্রেসের ভিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করে লিখলেন: "এই ভিক্ষানীতিতে ভারত স্বাধীনতা পাবে না। কংগ্রেস একটি ভিক্ষুকের দল। কাজ মাত্র বক্তৃতা, যাকে বলা হয়—আন্দোলন।" 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় অরবিন্দের লেখা বিপিনচন্দ্র পাঠ করেছিলেন কি না তা সঠিক জানা যায় না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় বিপিনচন্দ্রের কংগ্রেস রাজনীতির সমালোচনা যেন আরো উঁচু পর্দায় উঠেছে। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, অরবিন্দের চিন্তাধারার সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের চিন্তধারা মিলিত হয়ে সেদিন বাংলাদেশে গুপ্তসমিতি গঠনের পথ অনেকখানি প্রশস্ত করে দিয়েছিল। দেবব্রত বসু তখন 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইতিহাসের প্রক্রিয়া এইভাবেই কাজ করে থাকে। 'নিউ ইণ্ডিয়া' বা 'নবীন ভারত' কথাটির মধ্যেও আভাসিত হয়েছে ইতিহাসের একটা নিগূঢ় সত্য।

কিন্তু বাংলাদেশে গুপ্তসমিতি সৃষ্টির মূলে আরো একটি প্রত্যক্ষ কারণ ছিল।

সেটি হলো স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু। তাঁর মহাপ্রয়াণের তিন মাস পরে, ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে ভগিনী নিবেদিতা এলেন বরোদায় অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তাঁদের উভয়ের জীবনেই এই সাক্ষাৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিবেকানন্দের মৃত্যু সংবাদ যখন বরোদায় অরবিন্দের কাছে পৌঁছলো, তখন আমরা অনুমান করতে পারি, তাঁর মনের মধ্যে কী চিন্তা জেগেছিল। তাঁর চক্ষে বিবেকানন্দ ছিলেন বাংলার শিয়রে একজন জাগ্রত প্রহরী, আর তাঁর কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। বাংলাকে এখন কে পথ দেখাবে? দেশাত্মবোধের এই জীবন্ত আদর্শকে বাঙালির সামনে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বিবেকানন্দ অরবিন্দের কতখানি প্রিয় আদর্শ ছিলেন তা তাঁর নিজের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে। উত্তরকালে তিনি লিখেছিলেন: "বিরাট প্রাণপুরুষ বলিয়া যদি কাহাকেও স্বীকার করা যায়, তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ—নর-কেশরী বিবেকানন্দ। তাঁহার প্রভাব আমাদের মধ্যে আজো প্রবলভাবে কাজ করিতেছে—করিবেও চিরকাল। সেই প্রভাব ভারতের আত্মাকে আলোড়িত করিয়াছে। তিনি এখনো বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার দেশজননীর আত্মায়, দেশজননীর সন্তানদের আত্মায়।"

নিবেদিতার কথাও অরবিন্দ তখন জানতেন।

জানতেন মূর্তিমতী এই অগ্নিশিখার বিচিত্র জীবন-কথা।

ওদিকে নিবেদিতাও দূর থেকে জানতেন অরবিন্দকে।

জানতেন তাঁর মনীষার কথা, আর দেশপ্রেমের কথা।

তাই ইতিহাস-বিধাতার নেপথ্য বিধানেই সেদিন বরোদায় নিবেদিতা মিলিত হলেন অরবিন্দের সঙ্গে। এ যেন শিখা আর অগ্নির মিলন—নিবেদিতার মাধ্যমে বিবেকানন্দের ভাবধারার সঙ্গে অরবিন্দের এই পরিচয় সাধন ইতিহাসের দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কথিত আছে যে, বরোদায় গিয়ে অরবিন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময়েই নিবেদিতা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন স্বামীজির একখণ্ড 'রাজযোগ'। আশ্চর্য নয় যে, "বিবেকানন্দের যোগ নিবেদিতার হাত দিয়া অরবিন্দে সংক্রামিত হয়।"

নিবেদিতার দুই চক্ষু যেন দশ চক্ষু হয়ে অরবিন্দকে দেখতে লাগল।

এই অরবিন্দ ঘোষ! স্বল্পভাষী, শান্ত প্রকৃতি ও কৃশতনু এই মানুষটি অরবিন্দ ঘোষ!

ইনি যে প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরি—নিবেদিতার মন বললো।

ইনি তো সাধারণ মানুষ নন—যুগে যুগে যাঁরা দূর প্রসারী জ্যোতির্ময় বার্তা নিয়ে আসেন, ইনি সেই রকম একটি জ্যোতিষ্ক। যেন স্বর্গের প্রদীপ। ইনি কেমব্রিজে-পড়া অরবিন্দ ঘোষ! ভারত-আত্মার এক জীবন্ত বিগ্রহকে নিবেদিতা দেখেছিলেন

তাঁর গুরুর মধ্যে, আজ আবার তাঁরই বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন ভারত-আত্মার আর একটি নবীন বিগ্রহ—নিবেদিতার মন বললে। কী যেন একটি অলৌকিক আলো আর আগুন এই মানুষটির চক্ষু দুটির মধ্যে। সে দৃষ্টি চলে যায় দূরের পারে। নিবেদিতার মনে হলো—আগামী দিনের ভারতের এবং পৃথিবীর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বহু দূর-প্রসারী আলোকরশ্মি যেন এই শান্ত, নিরীহ মানুষটি। অরবিন্দকে প্রথমবার দেখেই নিবেদিতার মন বলেছিল যে, তাঁর গুরুর ঈপ্সিত কাজের অনেকখানি বুঝি এঁরই সহায়তায় তিনি সম্পন্ন করতে পারবেন। বরোদায় আসা তাঁর সার্থক হলো।

গুরুর মহাপ্রয়াণের পর থেকেই হৃদয়ের বেদনা হৃদয়ে চেপে নিবেদিতা বেরিয়েছিলেন ভারত ভ্রমণে, গুরুর মহিমা প্রচার করতে নয়, তাঁর ভাবধারাকে প্রচার করতে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অন্তরে যে বিপ্লবী বিবেকানন্দ ছিল তারই সাম্যঘন আগ্নেয়রূপ তিনি বাঙালির সামনে, ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরবার জন্য যারপর নাই ব্যগ্র হয়েছিলেন। তিনি নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন যে বিংশ শতাব্দীকে স্পর্শ করে বিদায় নেবার পূর্বে স্বামীজি যেন বাংলাদেশে একটি নতুন যুগের প্রভাতকে আহ্বান করে গিয়েছেন। এখন তাঁর স্বদেশপ্রেমের জীবন্ত ভাবধারা জনসাধারণের কাছে প্রচারিত হওয়া দরকার। বিবেকানন্দের জীবনব্রতের উত্তরাধিকারিণী, তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতার সঙ্গে বরোদায় অরবিন্দের পরিচয় যে একটা নিছক ঘটনামাত্র ছিল না, বরং সেটি ছিল ইতিহাসেরই অভিপ্রেত একটি বিশেষ ঘটনা, তা আমরা শীঘ্রই দেখতে পাব।

॥ আঠারো ॥

চক্ষে উজ্জ্বল স্বপ্ন আর গভীর প্রত্যয় নিয়ে ভারতের জনসমাজের দ্বারে দ্বারে গুরুর স্বদেশপ্রেমের বাণী পৌঁছে দিতে দিতে অবশেষে নিবেদিতা বরোদায় এসে উপনীত হলেন। প্রথম সাক্ষাতেই অরবিন্দ নিবেদিতাকে প্রশ্ন করলেন : "আপনার জীবনের ব্রত কী?"

—এই জাতিকে জাগ্রত করা, এই-ই আমার জীবনের ব্রত।

—আপনার প্রবন্ধটা পড়লাম 'হিন্দু' পত্রিকায়*।

—কেমন পড়লেন? আমি ত এখন তাঁর কথাই প্রচার করছি।

—খুব ভাল কাজ করছেন। আপনি সর্বাংশে তার উপযুক্ত।

—উপযুক্ত কি না জানি না। কিন্তু আমার মন বলছে, আপনি আরো উপযুক্ত।

—আমি!

—হ্যাঁ, আপনি। বাংলাই আপনার উপযুক্ত স্থান।

—না, আমি অন্তরালে থাকব। আমার কাজ মানুষ তৈরি করা।

—বিপ্লব জন্ম নিতে চলেছে। বাংলাদেশে এর সূচনা দেখে এসেছি।

—আমিও তার কিছু কিছু সংবাদ রাখি।

—এখন দরকার একজন নেতার।

—তার সন্ধান পেয়েছেন?

—আপনিই তো সেই নেতা। গুরুজীর নামে শপথ করছি, আমি আপনার পাশেই দাঁড়াব। আপনি যা চান, আমিও ঠিক তাই-ই চাই।

—আমি কি আপনার ওপর নির্ভর করতে পারি?

—নিশ্চয়ই। আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন।

—নির্ভর করাটা বড় কথা নয়—

—ঠিক বলেছেন। আমাকে আপনার বন্ধু, সহকর্মী বলেই গ্রহণ করতে পারেন। মোট কথা, বাংলায় আপনাকে এইবার যেতে হবেই।

—বেশ, লক্ষ্য যখন আমাদের এক, তখন আজ থেকে আমরা পরস্পরের বন্ধু

* "জাতীয় জীবনে বিবেকানন্দ"—এই নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন নিবেদিতা মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায়। লেখকের 'সিষ্টার নিবেদিতা' ইংরেজি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

হলাম। আসুন, আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, আজ থেকে ভারতবর্ষকে ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত করাই হবে আমাদের কাজ।

—কাজ নয়, বলুন জীবনের ব্রত।

—ঠিক বলেছেন। এ কাজ তো ব্রতেরই সামিল।

—হ্যাঁ—আর সেই ব্রতাচরণ আমরা করব একত্রে—পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

নিবেদিতার সঙ্গে আলাপ হলো।

তীক্ষ্ণধী অরবিন্দ বুঝলেন, রামকৃষ্ণ যেমন বিবেকানন্দকে রেখে গিয়েছিলেন, স্বামীজি তেমনি রেখে গিয়েছেন নিবেদিতাকে। তাঁব সার্থক ও সুযোগ্য প্রতিনিধি তিনি—অরবিন্দের মনে এ বিষয়ে কোন সংশয় রইল না এখন। অতঃপর ইতিপূর্বে বাংলাদেশে গিয়ে গুপ্তসমিতির প্রথম পর্বের যে উদ্বোধন তিনি করে এসেছেন, সেসব বিবরণ জানালেন নিবেদিতাকে। এর কিছুকাল পরেই কলকাতায় ফিরে এসে তিনি এই সমিতিতে সম্পূর্ণভাবেই আত্মনিয়োগ করেন। বরোদায় এই স্মরণীয় সাক্ষাৎকারের তিন বছর পরেই বাংলাদেশে যে-বিপ্লব দেখা দিয়েছিল, আমরা পরে দেখতে পাব, তাতে এই দুজনেই একত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করবেন। অরবিন্দকে দেখব বিপ্লবের দীক্ষাগুরু হিসাবে আর নিবেদিতাকে শিক্ষা-গুরু হিসাবে। এইভাবেই নিবেদিতা-অরবিন্দের যুগ্ম-প্রচেষ্টায় রচিত হয়েছিল জাতীয় ইতিহাসের একটি রক্ত-রাঙা অধ্যায়।

বাংলাদেশে গুপ্ত-সমিতি সৃষ্টির পিছনে আরো একটি কারণের কথা উল্লেখ করতে হয়। আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'ডন' সোসাইটি নতুন শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালির জাতীয়তাবোধকে কী প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপিত করে তুলেছিল, সে-ইতিহাসটাও আমাদের জানা দরকার। বলেছি, অরবিন্দের জীবনের পটভূমি অতি সুবিস্তৃত এবং তাঁর জীবন নাট্যে একাধিক চরিত্রের সমাবেশ। সেই পটভূমি ও সেইসব চরিত্রের যথাযথ পরিচয় ব্যতিরেকে এই চরিতালোচনা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। ডন সোসাইটি স্থাপিত হয় ১৯০২ সালে। সেদিন ইহাই ছিল স্বদেশী-সেবার পাঠশালা। এর পাঁচ বছর আগে সতীশচন্দ্র 'ডন' নামে একখানি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে এই পত্রিকার দান অসামান্য। সে যুগের অন্যতম ধর্মগুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শক্তি তাঁর শিষ্য সতীশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ডন' পত্রিকার মাধ্যমে লোকশিক্ষায় ও জাতিগঠনের ক্ষেত্রে কিরকম ফলপ্রসূ হয়েছিল, সে-ইতিহাস অনেকেরই জানা নেই। সম-সাময়িককালে 'ডন' যেমন একটি বিশিষ্ট পত্রিকার গৌরব অর্জন করেছিল, তেমনি তাঁর ডন সোসাইটি প্রাক্-স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বদেশপ্রেমের বহ্নিশিখা বাংলার

তরুণ চিত্তে যেভাবে জ্বালিয়ে দিয়েছিল তা অরবিন্দের গুপ্তসমিতি স্থাপনের প্রয়াসকে যে অনেক পরিমাণে সুগম করে দিয়েছিল তা অনস্বীকার্য।

এই ডন সোসাইটির মঞ্চ থেকেই নিবেদিতা দিনের পর দিন বক্তৃতা করে আত্মদানে উন্মুখ বাঙালি তরুণের মনে কিভাবে তপস্যার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, সেই ইতিহাস সুপরিচিত।* এই সোসাইটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন আর একজন তেজস্বী দেশপ্রেমিক বাঙালি সন্তান। তাঁর নাম উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—স্বামী বিবেকানন্দের যৌবনকালের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এঁর কথা স্বতন্ত্রভাবে ও বিস্তারিত ভাবে আমাদের পরে বলতে হবে, কারণ অরবিন্দের বিপ্লব-প্রচেষ্টার তিনিই ছিলেন তত্ত্বধারক। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, "অরবিন্দ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে ভগিনী নিবেদিতা ডন সোসাইটির তরুণ যুবক দলের মধ্য দিয়া নূতন জাতীয়তাবোধের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবাত্মক রাজনীতি বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো প্রচার করিযা" বাংলার বিপ্লব-প্রয়াসকে অনেকখানি সার্থক করে তুলেছিলেন। এই ডন সোসাইটি বাংলাদেশে বিপ্লবের বেদী রচনা করেছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। পরে আমরা দেখতে পাব যে, নিবেদিতা-অরবিন্দের মিলিত বিপ্লবাত্মক আদর্শ এই শতাব্দীর প্রথম দশকেই কিভাবে বিস্ফোরণের কাজ করেছিল।

এই ১৯০২ সালেই আমরা দেখতে পাই যে, সখারাম গণেশ দেউস্কর মারাঠার বীরপূজা বাংলাদেশে প্রবর্তিত করে মারাঠী ও বাঙালির মধ্যে এক জাতীয়তা সূত্রের সখ্য-সম্বন্ধ দৃঢ়তর করেন। বিগত শতাব্দীর শেষ পাদে বোম্বাই প্রদেশে মারাঠা জাতির মধ্যে টিলক যে নতুন প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন তাই-ই 'শিবাজী উৎসবে'র মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল, একথা আগেই বলেছি। বাংলাদেশে সেই ভাব-তরঙ্গকে প্রবাহিত করে এনেছিলেন সখারাম। ১৯০২ সালে তিনি কলকাতায় প্রথম 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্তন করেন এবং তারপর পর পর কয়েক বছরই এই উৎসব কলকাতায় ও মফঃস্বলে সোৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়। টিলক স্বয়ং একবার এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মনে এই উৎসব কিরকম ভাবের সঞ্চার করেছিল তার নিদর্শন আমরা পাই কবির বিখ্যাত 'শিবাজী' কবিতাটির মধ্যে। এইভাবেই সেদিন মারাঠার প্রাণশক্তির উত্তাপ আমরা অনুভব করেছিলাম। এইখানেই স্মরণ করতে হয় রমেশচন্দ্র দত্তের অমর উপন্যাস 'মহারাষ্ট্রে জীবন-প্রভাত' যা তিনি রচনা করেছিলেন কংগ্রেসের জন্ম বৎসরে। তিনি কি সেদিন কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' প্রকাশিত হওয়ার পনের-ষোল বছরেই বাংলার জীবনে দেখা দেবে নতুন প্রভাত।

*লেখকের 'নিবেদিতা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বাংলায় গুপ্তসমিতি স্থাপনের প্রথম পর্বের ইতিহাসের এই পারিপার্শ্বিক মনে রাখলেই আমরা বুঝতে পারব যে, বিপ্লবের বীজ বপনের কাজটা যে শুধু একা অরবিন্দের দ্বারাই সাধিত হয়েছিল ঠিক তা নয়—বহু ও বিচিত্র ঘটনার ভিতর দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুইশতক থেকেই কর্ষণের প্রক্রিয়াটা চলে আসছিল সকলের অলক্ষ্যে। সেই কর্ষিত ক্ষেত্রেই যাঁরা বারিসিঞ্চন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিবেকানন্দ, উপাধ্যায়, নিবেদিতা ও অরবিন্দ। এই প্রসঙ্গে আরো একজনের নাম স্মর্তব্য। তিনি ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র, বা পি. মিত্র। এই মিত্তির সাহেবের নাম এখনকার বাঙালিসন্তানের নিকট তেমন পরিচিত নয় বলেই আমার ধারণা। কিন্তু এঁরই অনুশীলন সমিতি যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে যুবকদের মধ্যে শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে দেশে শক্তিচর্চার সূচনা করেছিল এবং সেই সঙ্গে পরোক্ষভাবে রচনা করে দিয়েছিল বিপ্লবের বেদী, তা একটি ঐতিহাসিক সত্য। ইনিও ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য; তবে টিলকের মতো ইনিও রাজনীতিতে ধর্ম আমদানী করার বিরোধী ছিলেন। অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল এইখানেই। অনেক স্বদেশভক্তই সেদিন এঁর কাছ থেকে বৈপ্লবিক জীবনের প্রেরণা লাভ করেছে। হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর বইতে এঁর কথা উল্লেখ মাত্র করেছেন, কিন্তু পুলিন দাসই তাঁর আত্মচরিতে পি. মিত্রের বিস্তারিত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বই থেকে তাঁর সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"পি. মিত্রের সম্পূর্ণ নাম প্রমথনাথ মিত্র। নৈহাটি গঙ্গার ধারে তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল। হুগলী স্কুল হইতে এনট্রান্স ও হুগলী কলেজ হইতে এম. এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া উচ্চশিক্ষা হেতু ইংল্যাণ্ড গমন করেন। ইংল্যাণ্ডে থাকিতেই তিনি সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা কিজন্য তাহা বিশেষভাবে অবগত হন। মাত্র উনবিংশ বৎসর বয়সে পি. মিত্র ব্যারিস্টার হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইংল্যাণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি রিপণ কলেজে যোগদান করিলেন ও সেই সঙ্গে হাইকোর্টে প্র্যাকটিসও করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ও 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রবন্ধাদিও লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে আইন ব্যবসাতেই আত্মনিয়োগ করেন। যৌবন-কালে পি. মিত্র প্রথমে কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন ও তোষণ নীতিকে তিনি একেবারেই সমর্থন করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দেশকে প্রকৃত স্বাধীন কিংবা প্রকৃত শক্তিশালী করা সামরিক শক্তি বিবর্জিত কংগ্রেসের পক্ষে কদাচ সম্ভবপর হইবে না। তাই তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া সামরিক শক্তির

পরিকল্পনা লইয়াই অনুশীলন সমিতিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিবার ইচ্ছায় সৰতোভাবে মনোনিবেশ কবিয়াছিলেন।

"বিভিন্ন ঘটনাচক্রে তৎকালীন জেনাবেল এসেম্বলী কলেজের সংশ্লিষ্ট ব্যায়ামাগারের এক বিশিষ্ট কর্মী সতীশচন্দ্র বসুর তত্ত্বাবধানে পি. মিত্র ১৯০২ সালে দোল পূর্ণিমার দিন ২১নং মদন মিত্রের গলিতে অনুশীলন সমিতি স্থাপন করিলেন।" এই অনুশীলন সমিতিই অরবিন্দেব গুপ্তসমিতির সঙ্গে পবে সংযুক্ত হয়েছিল এবং সর্বসম্মতিক্রমে অধিনায়ক পি. মিত্রই ছিলেন, একথা হেমচন্দ্রও তাঁব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অনুশীলন সমিতিব সূচনাকাল থেকেই এব সঙ্গে যাঁরা সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমাব দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতিব নাম বিশেষ-ভাবেই উল্লেখযোগ্য। সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ অবশ্য এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, তাঁদেব থাকবাব কথাও নয়। অনুশীলনের কংগ্রেস বিরোধী মনোভাবই তাঁদের দূরে রেখেছিল এই সমিতি থেকে।

পি. মিত্রের প্রসঙ্গে আরেকজন ভারতপ্রেমিক বিদেশীর কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়। ইনি হলেন প্রখ্যাত জাপানী শিল্প-সমালোচক কাকুজো ওকাকুরা। আদর্শবাদী ও আদর্শ-সন্ধানী এই জাপানী ভদ্রলোক স্বামী বিবেকানন্দেব সঙ্গে এই দেশে আসেন। 'এশিযা এক'—এই ছিল এঁব আদর্শ; তিনি বিশ্বাস কবতেন যে, উদ্ধত পাশ্চাত্য জাতিব কাছ থেকে শ্রদ্ধা পেতে হলে সমগ্র এশিযাকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। এই শতকেব গোড়ায় বাঙালির নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ ওকাকুবাকে গভীরভাবেই এই দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আকর্ষণ করেছিল, এঁদেব মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অবনীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা প্রভৃতি। কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি পি. মিত্রের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। "একদিন ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে এক আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ তীব্রতার সহিত সেই জাপানী ভদ্রলোক বলেন যে, তোমরা এত বড় একটা শিক্ষিত জাতি, কেন ইংরেজেব পদানত হইয়া থাকিবে? স্বাধীনতার জন্য প্রকাশ্য কিংবা গুপ্তভাবেই হউক বিভিন্নরূপে প্রচেষ্টা আরম্ভ কব, জাপান তোমাদিগকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবে।"* অরবিন্দ বরোদায় বসে এই ওকাকুরার কথা নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। ওকাকুবা ১৯০২ সালেব শেষভাগে ভারত ত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পর বৎসর ওকাকুরার 'প্রাচ্যের আদর্শ' ('আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট') গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়; নিবেদিতা এই গ্রন্থেব একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। শিক্ষিত বাঙালির কাছে বইটি বিশেষ

* আত্ম কথা: পুলিন দাস।

সমাদর লাভ করেছিল। বাংলা দেশে স্বদেশী যুগের দেশপ্রীতি ওকাকুরার এই বইটি থেকে যে প্রেরণা পেয়েছে, তার ইতিহাসও আমরা বিস্মৃত হয়েছি।

আর একটি ঘটনার কথা বলি।

১৯০২ সালের যে অক্টোবর মাসে আমরা নিবেদিতাকে বরোদায় অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেখি, সেই অক্টোবর মাসেই আমরা আর একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। ১৯০২, ৫ই জুলাই, অপরাহ্ন বেলায় বেলুড়ে গঙ্গাতীরে যখন বিবেকানন্দের চিতার আগুন নিভে গেল, তখন প্রজ্জলিত সেই চিতাগ্নির নিকট থেকে একই সঙ্গে প্রেরণা পেলেন দুজন—নিবেদিতা ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। নিস্তব্ধ হৃদয়ে সেই গগনস্পর্শী চিতার আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী উপাধ্যায় অনুভব করলেন, বিবেকানন্দের 'ফিরিঙ্গি-জয় ব্রত' তাঁকে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর যে কথা সেই কাজ। সেই অক্টোবর মাসেই তিনি বিলাত যাত্রা করেন একরকম কপর্দকশূন্য ভাবেই। সেইখানে তিনি অকস্‌ফোর্ড কলেজে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তিনটি বক্তৃতা করেন। তারপর কেমব্রিজে আরো কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। বিলাতে অবস্থান কালেই উপাধ্যায় 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় কয়েকখানি পত্র প্রকাশ করেছিলেন। হিন্দুধর্ম, হিন্দুদর্শন ও হিন্দু সমাজের জয়ধ্বনি বেজে উঠছিল সেদিন সাগরপারে উপাধ্যায়ের বক্তৃতাগুলির মধ্যে আর এদেশে 'বঙ্গবাসী'-তে প্রকাশিত তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে। বরোদায় বসে অরবিন্দ নিশ্চয়ই এই সংবাদ পেয়ে থাকবেন। উপাধ্যায়ের প্রতি তখন থেকেই তিনি আকৃষ্ট হতে থাকেন এবং এর তিন বছর পরে স্বদেশী বাংলার প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে সেই দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীর জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখে যারপর নাই বিস্মিত হয়েছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়েই আমরা এঁর জীবন কথা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করব।

আমরা দেখতে পাচ্ছি বাঙালির জাতীয় জীবনে ১৯০২ সালটি একটি সাধারণ বৎসর ছিল না—এটা ছিল প্রকৃত পক্ষে আলো ও উত্তাপপূর্ণ একটি অবিস্মরণীয় বৎসর। অনেক শিখা পুড়ে পুড়ে প্রদীপ যেমন নিষ্কম্প ও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে, ১৯০২ সালে বাঙালির জাতীয় জীবনের প্রদীপটাও যেন ঠিক সেইভাবে, শিখার পর শিখা দগ্ধ হয়ে, জ্বলে উঠেছিল এবং তারই আভায় রাঙিয়ে গিয়েছিল স্বদেশীযুগের বাংলার আকাশ। নানা ঘটনার স্রোত, একের পর এক তরঙ্গ তুলে বাঙালির মনের তটে সেই স্মরণীয় ১৯০২ সালটিতে যে অভিঘাত করেছিল তাই-ই অল্প কিছুকাল পরে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যে তার ঐতিহাসিক পরিণতি লাভ করেছিল। সেই বিচিত্র স্রোতোধারা এক লক্ষ্যে ধাবিত হতে হতে যে আবর্তের সৃষ্টি করেছিল, তারই দুকূলপ্লাবী রূপ আমরা দেখলাম স্বদেশীযুগের বাংলায়। খরস্রোতা ও বহুমুখী সেই জীবন প্রবাহকে সেদিন যাঁরা পথ

দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদেরই সম্মিলিত ত্যাগ, দুর্জয় মনোবল, নিখাদ স্বদেশপ্রেম আর সর্বোপরি বেদাগ ইস্পাতের মতো নিষ্কলঙ্ক চরিত্র জাতীয় জীবনের সকল ক্লীবতা ও পঙ্গুত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে সৃষ্টি করেছিল এক নতুন জীবন চেতনা, এক নতুন জাগরণ মন্ত্রের যার মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতীয়তাবোধ দ্বাদশ-সূর্যের দীপ্তি নিয়ে নূতন শতাব্দীর প্রভাতে অভিব্যক্ত হয়েছিল। সেদিন বাংলার প্রত্যাসন্ন ইতিহাসের নিস্তরঙ্গ বুকে বিপ্লবের যে তরঙ্গ উঠেছিল, সেই তরঙ্গের চূড়ায় শান্তভাবে এসে দাঁড়ালেন একজন।

তিনি অরবিন্দ ঘোষ।

॥ উনিশ ॥

এইবার স্বদেশী বাউল ব্রহ্মবান্ধবের কথা কিছু বলব।

"মানুষ নন, যেন একটি জলন্ত পাবক শিখা।"

উপাধ্যায় সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের এই উক্তিটির মধ্যেই আভাসিত হয়েছে তাঁর জীবন-মহিমা।

স্বদেশীযুগে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের বিশেষ যোগাযোগ ছিল।

চিন্তাধারাতেও দুজনের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

দুজনেই দৃঢ়কণ্ঠে বলতেন যে, ভারতবর্ষকে জাগাতে হলে শক্তির উপাসনা করতে হবে ও সনাতন ভারতীয় হিন্দু আদর্শের আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে জাতীয়তাভাবে উদ্বুদ্ধ করে দেশকে জাগাতে হবে। দুজনেই দেশের সুপ্ত শ্রদ্ধাবুদ্ধির উদ্রেক করতে ব্যগ্র ছিলেন।

দুজনেই বিশ্বাস করতেন যে, ভারতবর্ষ একদিন সারা বিশ্ববাসীকে দেবে সত্য পথের সন্ধান। তাই দুজনেই ডাক দিয়েছিলেন, ভারতবাসীকে তামসিকতা পরিত্যাগ করে জগৎ জয় করতে প্রস্তুত হবার জন্য। নিষেধ করেছিলেন নিজের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকতে।

"হ্যাঁ, উপাধ্যায় একটি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন।"

দৃঢ়ভাব সঙ্গেই শ্রীঅরবিন্দ বলতেন এই কথা।

"তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী। অপর পক্ষে বৈদান্তিক, তেজস্বী নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।...বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে।"

এই কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।*

"আমাদের বর্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ কতটা পরিমাণে যে আমরা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি, দেশের লোক যেন ক্রমশ সে কথা ভুলিয়া যাইতেছে।"

---

* চার অধ্যায় (১ম সং): ভূমিকা।

স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন এই কথা।

"উপাধ্যায় দেশপ্রেমে মজিয়া গিয়াছিলেন। দেশকে এমন করিয়া ভালবাসা আর দেখি নাই এবং সেই ভালবাসার বলেই ভারতের সভ্যতা ও সাধনার মর্ম তিনি যেমন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তেমনটি আর দেখা যায় না। তাঁহার দেশপ্রীতি অলীক বস্তু ছিল না, তিনি আমাদের মন ভুলাইতে যে দেশের গুণগান করিতেন এবং উহা যে তাঁহার নিছক কল্পনাপ্রসূত তাহাও নহে। তিনি দেশের সত্যকার সত্তাকেই লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবান্ধবের নির্দেশিত রাস্তায় চলিলে আমাদের উদ্ধার অবশ্যম্ভাবী।"

এই কথা বলেছিলেন জাতীয় শিক্ষাপরিষদের শিক্ষক অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ।

সত্যি, ভাবলেও বেদনা বোধহয়—আজ সেই পুরুষসিংহকে, স্বদেশের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সেই 'সদানন্দ'-সদৃশ সন্ন্যাসীকে বাঙালি ভুলেছে। সংক্ষেপে তাঁর জীবনকথা এই: পূর্ব-নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হুগলী জেলার খন্যান গ্রামে ১৮৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি কেশবচন্দ্রের শিষ্য হয়ে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। পরে সিন্ধুপ্রদেশে গিয়ে প্রথমে প্রোটেষ্ট্যান্ট ও পরে রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। সিন্ধুপ্রদেশে তাঁহার বহু শিষ্য হয়, তাহার মধ্যে সাধু টি. এল. ভাসওয়ানী ও অনিমানন্দ অন্যতম। তিনি 'টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি', 'সোফিয়া' প্রভৃতি কয়েকখানি পত্রিকার সম্পাদনা করেন যার খ্যাতি ভারতের বাইরে প্রসারিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন বাংলাদেশে। কয়েকটি ছাত্র নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন কলকাতার সিমলা স্ট্রীটে একটি আবাসিক বিদ্যালয়। নাম দিলেন: সারস্বত আয়তন। উদ্দেশ্য: বৈদিক আদর্শে শিক্ষা প্রদান ও ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের দ্বারা চরিত্র গঠন। এই বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হবার অল্পদিন পরেই উপাধ্যায় ঐ ছাত্রগুলিকে নিয়ে বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হন। কবি ও সন্ন্যাসীর সমবেত চেষ্টায় শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাচীন বৈদিক আদর্শে একটি বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়ই আজ বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

ব্রহ্মবান্ধবের ইচ্ছা ছিল নর্মদাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করে সেই নিভৃতস্থানে ধ্যান-ধারণায় জীবন অতিবাহিত করবেন। কিন্তু তারপরেই, প্রাণে প্রাণে তিনি কি এক কথা শুনলেন—ভারত আবার স্বাধীন হবে—এখন নির্জন ধ্যান-ধারণার সময় নয়। ঠিক সেই সময়ে, ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের লোকান্তর ঘটল। অমনি তাঁর জীবনের গতিপথ পরিবর্তিত হলো। এর অব্যবহিত পরে বেদান্ত প্রচারের

উদ্দেশ্যে মাত্র ত্রিশটি টাকা সম্বল করে উপাধ্যায় বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংল্যাণ্ডের বহু মনীষী তাঁর বক্তৃতা শুনে হিন্দু বেদান্তের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বেদান্তের অধ্যাপক হিসাবে পেতে চাইল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে স্বদেশে ফিরে আসেন ও ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এই সময় তিনি 'সন্ধ্যা' নামে একটি দৈনিকপত্র প্রকাশ করেন। তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনীনিঃসৃত অগ্নিগর্ভ রচনা সারা বাংলাদেশকে মাতিয়ে তোলে। অত্যন্ত সরস ও সরল মেঠো চলতি ভাষায় তিনি যেসব প্রবন্ধ লিখে গিয়েছেন এখন পর্যন্ত সে ভাষার তুলনা পাওয়া যায় না। কী বিচিত্র শিরোনামা সেসব প্রবন্ধের, যেমন— 'ছিদিশনের হুড়ুম দুড়ুম, ফিরিঙ্গিদের আক্কেল গুড়ুম', 'গোদা পায়ে ভোঁতা লাথি,' 'দুশো মজা তিলাই খাজা', 'কালীঘাটের জোড়া পাঁঠা, একটি কালো, একটি সাদা', 'ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে'—এমনি আরো কত রকম নামের শিরোনামা-শোভিত প্রবন্ধ বেরুত তাঁর কাগজে।

উপাধ্যায় ও তাঁর 'সন্ধ্যা'—এক ও অভিন্ন। দেশের জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় 'সন্ধ্যা' পত্রিকার মতো প্রভাবশালী বাংলা পত্রিকা সেকালে এদেশে ছিল না; পরেও আর হয় নি। 'সন্ধ্যা'র লেখা পাঠ করে সেকালে দোকানের দোকান-পশারী, জমিদারের সরকার, গোমস্তা, পাঠশালার গুরুশিষ্য, রাস্তার মুটে, গাড়োয়ান সকলে হাসত কাঁদত। জমিদার গৃহস্থ, দরিদ্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত পুরনারী বালক-বালিকা যুবকবৃদ্ধ সকলেই কখনো আনন্দে বিভোর হয়ে পড়ত, কখনো বা রাগে ফেটে পড়ত। কখন 'সন্ধ্যা' আসবে, আজ 'সন্ধ্যায়' কি লিখল এই জানবার জন্য সকলে ব্যাকুল হয়ে থাকত।

পুরাতন মডারেটপন্থীদের কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে বাংলাদেশে যে নব্য জাতীয়তা-বাদী দল গড়ে ওঠে তাতে বিপিনচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবও পুরোধা ছিলেন ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ছিলেন। জাতীয়দলের ইংরেজি দৈনিকপত্র 'বন্দেমাতরম' প্রকাশে ব্রহ্মবান্ধব উদ্যোগী হন এবং গোড়ার দিকে এর মুদ্রণের দায়িত্বও নিয়েছিলেন। এই যুগান্তকারী পত্রিকার জন্ম-ইতিহাসে উপাধ্যায়ের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

১৯০৬ সালে পান্তির মাঠে যে শিবাজী উৎসব ও স্বদেশী শিল্পমেলা হয় তার সংগঠন ও পরিচালনায় উপাধ্যায় ছিলেন প্রাণস্বরূপ। ১৯০৭ সালে তিনি 'স্বরাজ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে 'সন্ধ্যা'য় রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ মামলায় তিনি একটি লিখিত বিবৃতি পেশ করে বলেন যে, "এই বিচারে আমি কোনরূপ

অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই। বিধাতা নির্দিষ্ট স্বরাজব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আমি বিদেশী জাতির কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই।"

এমন সাহসিক এমন স্পষ্ট ও মর্যাদাপূর্ণ বিবৃতি ভারতবর্ষে ইংরেজ আমলের আর কোন রাজনৈতিক মামলায় দাখিল করা হয় নি। এ বিবৃতি উপাধ্যায়েরই উপযুক্ত। মামলা চলবার কালে তিনি বলেছিলেন, "ফিরিঙ্গির কোন জেলখানায় আমায় আটকে ধরে রাখতে পারবে না। আমি কলা দেখিয়ে চলে যাব।" হলোও তাই। মামলার মধ্যেই তাঁর হার্ণিয়া রোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁকে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে* স্থানান্তরিত করা হয় ও সেইখানেই অস্ত্রচিকিৎসার পর ১৯০৭ সালের ২৭শে অক্টোবর তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর তিরোধানের পরদিবস 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী 'এ ন্যাশনালিসটস এনড' শীর্ষক যে অপূর্ব সম্পাদকীয়টি লিখেছিলেন তাতে ব্রহ্মবান্ধবকে একজন অপরাজেয় জাতীয়তাবাদী নেতা বলে উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয়, কি জীবনে, কি মৃত্যুতে তিনি ছিলেন অজেয়। তাঁর জীবনেতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে উপাধ্যায় কালীঘাটে কালীমন্দিরে জগজ্জননীর প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বলেছিলেন: "মা, আবার আসিব, আবার তোর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিব।"

কিন্তু এ তো হলো তাঁর বহিরঙ্গ জীবন।

সেই বিরাট জীবনের মর্মকথাটা কী?

সেই সর্বত্যাগী, নির্ভীক স্বদেশপ্রাণ বৈদান্তিক যোদ্ধা সন্ন্যাসীর জীবনের দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে পাই? দেখতে পাই যেন একটি জ্যোতির পুঞ্জ লক্ষ লক্ষ গ্রহ-তারকার কক্ষপথ পরিক্রমা করতে করতে সহসা একদিন আমাদের এই বাংলাদেশের একটি ছায়াসুনিবিড় গ্রামের মাটিতে নেমে এলো। তার প্রভায় চারদিক আলোকিত হলো—আলো আর তেজ এই দুইয়ের সমাবেশে গঠিত ছিল সেই জ্যোতির পুঞ্জ। তারপর নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল অন্তে তা আবার নিজলোকেই প্রত্যাবর্তন করল। পিছনে থাকল শুধু একটি নাম—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এই নামটির মধ্যেই মিলিয়ে মিশে আছেন বাঙালীর স্বদেশী ও স্বাদেশিকতার প্রাণপুরুষ।

বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা ছিলেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দের পর আত্মবিস্মৃত পরানুকরণপ্রিয় বাঙালীকে আত্মমুখীন করতে বোধ করি আর কেউ তেমন সক্ষম হন নি যেমন হয়েছিলেন উপাধ্যায়। তাঁর লেখনী-নিঃসৃত বিদ্যুৎ প্রবাহে সেদিন আমরা বিদেশী শাসকশ্রেণীকে রীতিমত সন্ত্রস্ত হতে দেখেছি। তেমন প্রাণচঞ্চল মানুষ আর দেখা গেল না। তাঁরই শিষ্য বিখ্যাত অধ্যাপক (পরবর্তী জীবনে 'সাধু') ভাসওয়ানি বলেছেন: "উপাধ্যায়

* বর্তমান নাম এন. আর. সরকার হাসপাতাল।

খ্রীস্টান হলেও হিন্দু সন্ন্যাসীরই আচার পালন করতেন। তাঁর স্বাদেশিকতাই তাঁকে ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবেশে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা তাঁকে খাঁটি স্বদেশ-প্রেমিক এবং ভারতের স্বাধীনতাকামী বলেই জেনেছিলাম। তিনি ছিলেন বাংলার এবং ভারতের একজন মহান পুরুষ।"

তরুণজীবনে ধ্রুবপ্রেরণার ধ্রুবতারা ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব।

তাঁর জীবনকেন্দ্রে ছিল জ্যোতি, রস ও অগ্নিবীর্য।

অপরিমেয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন তিনি।

তিনি তথাকথিত বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি বোমা বা রাজনৈতিক ডাকাতি অথবা গুপ্তসমিতিতে কখনো যোগদান করেন নি। তবুও তিনি বিপ্লবী—বর্তমান ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন সর্বপ্রকার মুক্তির উপাসক—রাষ্ট্র-দাসত্ব এবং ভাব-দাসত্ব সব থেকে মুক্ত হয়ে যে স্বরাজ্যসিদ্ধি, তিনি তাই-ই চেয়েছিলেন। তাঁর কথাই ছিল, আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠিত অনুরাগ না থাকলে বিপ্লব সম্ভব হয় না; কেননা তা না হলে আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা জাগে না। স্বদেশীযুগে এই তন্ত্রটাই তিনি একান্তমনে প্রচার করে গেছেন। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন একজন প্রকৃত ভাব-বিপ্লবী। তিনি বুঝেছিলেন এবং তাঁর স্বজাতিকেও বুঝিয়ে-ছিলেন—ফেরঙ্গ সভ্যতার কাছে যদি আমরা অবনত থাকি, তবে ভারতের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। স্বামী বিবেকানন্দের মতো তিনিও ভারত-সভ্যতার গর্বিত সন্তান ছিলেন এবং স্বামীজি যেমন করেছিলেন, ব্রহ্মবান্ধবও ঠিক তেমনি বিলাতে গিয়ে ভারত-সভ্যতার মহিমা ঘোষণা করে এসেছিলেন। বিবেকানন্দের পরিত্যক্ত পতাকা তুলে নিয়েই তো তিনি ছুটেছিলেন বিলাতে তাঁর অসমাপ্ত ব্রত সিদ্ধ করতে। এদিক দিয়ে তিনি স্বামীজির যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন বলতে হবে।

সন্ন্যাসী, সুপণ্ডিত ও ব্রহ্মবিজ্ঞানী ব্রহ্মবান্ধব।

কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন ভারত-ধর্মের একনিষ্ঠ পূজারী।

সেটা আবার কী বস্তু?

ভারতের কল্যাণ;

ভারতের স্বারাজ্য-সিদ্ধি,

ভারতের স্বাধীনতা—এই হলো নব-ভারতের নবীন ধর্ম।

এরই নাম ভারত-ধর্ম।

বিবেকানন্দ থেকে অরবিন্দ, সকলেই ছিলেন এই ধর্মেরই একনিষ্ঠ সাধক। উপাধ্যায়ও ছিলেন কিশোরকাল থেকেই ভারত-ধর্মের একনিষ্ঠ পূজারী। তাইতো দেখতে পাই চৌদ্দ বছরের ছেলে ভারত উদ্ধারের জন্য গোয়ালিয়রে গিয়েছিলেন যুদ্ধ শিখতে এবং যৌবনে মাত্র ত্রিশ টাকা সম্বল করে বিলাত যাত্রা করেছিলেন।

ইংরেজের সাংস্কৃতিক বিজয়কে তিনি ভারত-ধর্মের দ্বারাই পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সনাতন সভ্যতার মর্মোপলব্ধি ভিন্ন ভারত-ধর্মের ধারণা সম্ভব নয়। তাঁর বিশ্বাস ছিল নবীন ভারতের জয়যাত্রা এই ধর্মকেই অবলম্বন করে সার্থক হবে, নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত স্বদেশবাসীকে তিনি ভারত-সভ্যতার প্রকৃষ্ট রূপটি দেখাতে চেয়েছিলেন।

ন্যাশনালিজম্ বা জাতীয়তা জিনিসটা তিনি কোনদিন লঘুভাবে দেখেন নি, এবং অন্যকে সেইভাবে দেখাতেও চান নি। তাঁর মত এ বিষয়ে তথাকথিত ন্যাশনালিস্টদের মত থেকে একটু স্বতন্ত্র ছিল। তিনি বলতেন, স্বধর্মের ভিত্তিভূমির উপরেই ভারতের জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা। জাতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যই প্রকৃত স্বাধীনতা। মনে পড়ে তাঁর সেই 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' প্রবন্ধটির কথা। ভারতের নিজস্ব জাতীয়তা যে কী তা তিনি এই প্রবন্ধে আমাদের বুঝিয়েছেন। অরবিন্দের জীবনের দিকে তাকিয়ে আমরা সেই একই জিনিস দেখতে পাই—তাঁরও শিক্ষা, সাধনা ও আদর্শ ভারত-সভ্যতাকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। তাই তো আসামীর কাঠগড়ায় আমরা যে বিপ্লবী অরবিন্দকে দেখেছিলাম, তারই মধ্যে দেখেছিলাম যোগসাধনায় সমাহিত একটি মানুষকে।

নবভারতের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার একজন অগ্রণী যোদ্ধা উপাধ্যায়।

'সন্ধ্যা'র আসরে তিনি বলতেন: জাতীয়তা আত্মবিলোপ নয়; পরন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠা। আত্মমহিমায় ও গরিমায় জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা। তাঁর স্বদেশচিন্তার স্বাতন্ত্র্য এইখানেই। সেইজন্যই বুঝি এই জন্মবিপ্লবী, ভারত-সভ্যতার বিজয়াভিযানের বিধাতৃনির্দিষ্ট সেনানায়কের গৌরব লাভ করেছেন আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে।

অরবিন্দের মতো ব্রহ্মবান্ধবও ছিলেন বঙ্কিমভাবের ভাবুক।

বঙ্কিমের মৃত্যুতে বরোদায় বসে বঙ্কিম-তর্পণ করলেন অরবিন্দ।

তারপর দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত হলো একটি দশক। বাঙালির স্মৃতিপটে ম্লান হয়ে এলো তাঁর মূর্তি। আমাদের জাতীয় জীবনের এই শোচনীয় অবক্ষয়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর স্বজাতির এই ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে ব্যথিত হলেন উপাধ্যায়। বাঙালির সামনে, সেই যুগসন্ধিক্ষণে, বঙ্কিমের চিন্তা-ভাবনাকে নতুন করে তুলে ধরবার কথা চিন্তা করলেন সন্ন্যাসী। একাই তিনি বঙ্কিমপূজার আয়োজন করলেন। টাকার দরকার। একদিন সকালে কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটেই তিনি চললেন পাইকপাড়ায়। এসে দাঁড়ালেন পাইকপাড়ার রাজবাড়ির প্রাসাদের দরজার সামনে। সংবাদ পেয়ে মহারাজা নেমে এলেন নীচেয়। দেখলেন তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তেজঃপুঞ্জ কলেবর, মুণ্ডিতমস্তক, গৈরিক পরিহিত শালপ্রাংশুমহাভুজ এক সন্ন্যাসী।

—আমি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। মহারাজার কাছে এসেছি বিশেষ একটি প্রয়োজনে।

—হুকুম করুন।

—আমি বঙ্কিম-পূজা করব, কিছু অর্থ সাহায্য করুন।

মহারাজা দ্বিরুক্তি করলেন না। তাঁর হস্তে অর্পণ করলেন একহাজার টাকা। —এই নিন, বঙ্কিম-পূজার জন্য আমার যৎসামান্য অর্ঘ্য। কিন্তু আপনি সন্ন্যাসী, আপনার পূজার জন্যও কিছু দিতে চাই। এই বলে তাঁর পায়ের তলায় রাখলেন আরো পাঁচশত টাকা। পাইকপাড়ার রাজবংশের ঐশ্বর্যের কথা শুনেছেন ব্রহ্মবান্ধব, কিন্তু আজ তিনি প্রত্যক্ষ করলেন সেই বংশের এক সুযোগ্য সন্তানের ঔদার্য। তিনি মুগ্ধচিত্তে সেই টাকা নিয়ে তেমনি ধূলিধূসরিত চরণে ফিরে এলেন কলকাতায়। এখান থেকে আবার তিনি চললেন বঙ্কিমের জন্মস্থান কাঁঠালপাড়ায়। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, সেদিন একা এই সন্ন্যাসী যেভাবে বঙ্কিম-উৎসব পালন করে তাঁর ভাবধারাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন তার তুলনা নেই। সেদিন তিনি যা করেছিলেন তা পাশ্চাত্য প্রথায় অনুষ্ঠিত 'এ্যানিভার্সারি' নয়, তা ছিল ভারতীয় পদ্ধতির পূজা ও পার্বণের মতো। "বাঙালির জীবনের চৈত্যপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি মাতৃপূজার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। বাঙালির চিন্তার জগৎ আবার বঙ্কিমময় হয়ে উঠুক—এই আমার প্রার্থনা।"—কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্রের এক স্মৃতিসভায় এই কথা বলেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব। স্বদেশী যুগের ঠিক অব্যবহিত কাল আগে তাঁর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সার্বজনীন বঙ্কিম-উৎসব বাঙালিকে এক নতুন প্রেরণায় সঞ্জীবিত করে তুলেছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অরবিন্দের বঙ্কিম-তর্পণ আর উপাধ্যায়ের বঙ্কিম-পূজা পরোক্ষভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে শুধু ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকেই প্রতিষ্ঠিত করে নি, সেইসঙ্গে আমাদের কর্মে ও চিন্তায়, মনে ও মননে বিদ্যুৎসঞ্চারী একটা নতুন চেতনারও স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছিল।

'সন্ধ্যা'র কথা না বললে উপাধ্যায়ের জীবনের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি তাঁর স্বজাতিকে জাতীয়তায় ও স্বধর্মনিষ্ঠায় দীক্ষা দিয়ে গেছেন।

'সন্ধ্যা'য় উদ্গীত হয়েছিল আত্ম-উদ্বোধনের সিদ্ধমন্ত্র।

ঘেঁটু মনসা, তুলসী, দোল, দুর্গোৎসব, ষষ্ঠীবাটা, পিঠেপুলি, রথযাত্রা, কোজাগরী, দোলযাত্রা প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছিলেন ভারতীয় সভ্যতা কী মহিমা ও মাধুর্যমণ্ডিত। তিনি ছিলেন অদ্বৈতবিজ্ঞানী সন্ন্যাসী; তবু যে তিনি জামাইষষ্ঠী, ষষ্ঠীবাটার মঙ্গল-মহিমার রস উপলব্ধি করে বিভোর হতেন, তার কারণ আমাদের

শ্রদ্ধাহীন বুদ্ধিকে আবার নিষ্ঠাবান করা। 'সন্ধ্যা'র একদিকে থাকত ইংরেজ শাসনের ওপর শ্লেষের তীব্র কষাঘাত, অন্যদিকে দোলযাত্রার লীলামাধুর্য। আমাদের রাজনীতি যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বারদেশে করযোড়ে দণ্ডায়মান, উপাধ্যায় তখন তাঁর 'সন্ধ্যা' পত্রিকার মাধ্যমে লিখলেন: "আমি শুনেছি মুক্তির সংবাদ। ভারত আবার স্বাধীন হবে।" দেশে কেউ যখন স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার কথা বলেও নি বা শোনেও নি, তখন ঐ দিব্যবাণী উচ্চারণ করেছিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। 'সন্ধ্যা'র দিব্যারতির শঙ্খঘণ্টানাদে তিনি ঘোষণা করলেন: "ভারত আবার স্বাধীন হবে।" এর অনেক পরে অরবিন্দ লিখেছিলেন: "আমরা চাই পরশাসনমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধিকার।"

"আমি চন্দ্র দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমি ঐ মুক্তির সমাচার প্রাণে প্রাণে শুনিয়াছি। মলয় পবন স্পর্শে যেমন শীতার্ত তরুর প্রাণে নবরাগের সঞ্চার হয়, প্রিয়জন সমাগমে যেমন বিরহীর প্রাণে আনন্দ লহরী উথলিয়া উঠে, রণভেরী শুনিলে যেমন বীর হৃদয় তালে তালে নাচিয়া উঠে—ঐ স্বাধীনতার সংবাদ শুনিয়া আমারও প্রাণে কি নূতন সাড়া পড়িয়া গেল।"

'সন্ধ্যা'র পৃষ্ঠায় এই যে নব-ভারতের নব জন্মের সুসমাচার ঘোষণা, এ কী কেবল নিছক রাজনৈতিকের স্ফীত বাক্‌চাতুর্য? না, আদৌ তা নয়। এই ছিল সেই সন্ন্যাসীর সত্যবাক্। আসল কথা, স্বদেশের ইতিহাসে আলো না পেলে, খাঁটি দেশ-প্রীতির উদ্ভব হয় না, দেশচর্যার মধ্যেও শ্রদ্ধার ভাব জাগে না। এই তত্ত্বটাকেই নিবিড়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব। তাই তো তিনি 'সন্ধ্যা'র মাধ্যমে বস্তুতান্ত্রিক দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে তোলার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দেশ যাই-ই হোক, তবু আমার দেশ। আমার দেশের যা কিছু সেই সর্বস্বকে গ্রহণ করেই চরিতার্থ হবে আমার দেশপ্রীতি—এই হলো তাঁর সকল কথার সার কথা। এই তাঁর জীবনের তত্ত্ব। এই হলেন স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। 'সন্ধ্যা'র স্তম্ভে স্বদেশপ্রেমের যে অপূর্ব তন্ত্র তিনি রচনা করেছিলেন, সে বিষয়ে পরে আবার আলোচনা করব।

॥ কুড়ি ॥

স্বদেশী বাংলার আভ্যুদয়িক রচনা করেছিলেন আরেকজন দেশপ্রেমিক।

তিনি মহারাষ্ট্রের বীর সন্তান সখারাম গণেশ দেউস্কর।

মারাঠার এই সন্তান ছিলেন বাংলারই একজন।

অরবিন্দের জীবন-নাট্যে ইনিও একটি বিশিষ্ট চরিত্র। এই অধ্যায়ে তাই সংক্ষেপে সখারামের জীবন কথাটা আলোচনা করব। কারণ এঁকেও আজকের বাঙালি বিস্মৃত হয়েছে। ১৯০২ সালে তিনি বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মারাঠার বীরপূজা—শিবাজী উৎসব—বাংলাদেশে প্রবর্তন করে। বিগত শতাব্দীর শেষপাদে টিলক-প্রবর্তিত 'শিবাজী-উৎসবের' তরঙ্গকে তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে প্রবাহিত করে নিয়ে আসেন। মারাঠার সঙ্গে বাংলার রাখীবন্ধন সূচিত হয়েছিল এইভাবেই। সুতরাং বাংলার নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের ইতিহাসে সখারাখের যে একটি গৌরবময় স্থান আছে, তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। তিনিই 'স্বরাজ' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন।

"দেউস্করের দেশপ্রেম যেন খাঁটি সোনা।"

এই উক্তিটি করেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ।

এই বাংলাদেশকে তিনি ভালবেসেছিলেন। আচারে, ব্যবহারে, শিক্ষায়-দীক্ষায় সখারাম সত্যই বাঙালি জাতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করে তিনি দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। দারিদ্র্য অথবা রাজরোষ তাঁকে দেশসেবার কণ্টকময় পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে নি।

মারাঠী সখারাম বাঙালি সখারামে পরিণত হয়েছিলেন মুখ্যত দুইজনের প্রভাবে। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, আর অপরজন যোগীন্দ্রনাথ বসু। ঋষি রাজনারায়ণই কিশোর সখারামের অন্তরে দেশপ্রেমের বীজ বপন করেন আর তাঁকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী করে তোলেন যোগীন্দ্রনাথ বসু।

সখারামের পিতামহ বহুকাল আগে দেওঘরের একটি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের আদিনিবাস ছিল বোম্বাইয়ের রত্নগিরি জেলার দেউসগ্রামে। এই দেওঘরেই ১৮৬৯ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে সখারাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবন কোনদিনই সুখে-স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হয় নি; সারা জীবনটাই তাঁকে প্রতিকূল

অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। কিন্তু মারাঠার অনমনীয় তেজ ও সাহসকে দমিত করতে পারে নি সেই সংগ্রাম।

দেওঘর উচ্চ-ইংরেজি স্কুলে সখারামের ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়।

স্বনামধন্য যোগীন্দ্রনাথ বসু* তখন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরই শিক্ষার গুণে, সখারাম তাঁর ছাত্রজীবনেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন, আর গৃহে তাঁর এক পিতৃস্বসার শিক্ষার গুণে সখারাম মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যও সযত্নে আয়ত্ত করেন। এইভাবে দুটি সজীব সাহিত্য ও ভাষার ভিতর দিয়ে যে প্রাণরসধারা তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন, তারই ফলে গড়ে উঠেছিল তাঁর মানসলোক। এরই ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি মারাঠী সাহিত্যের রত্নরাজি আহরণ করে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে সখারামের কাছে বাঙালির ঋণ অপরিশোধনীয় বললেই হয়।

সেকালে যাঁরাই দেশের কাজে ব্রতী হতেন তাঁদের প্রত্যেকের জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, ইতিহাসচর্চার ভিতর দিয়ে তাঁদের অনেকেই লাভ করেছিলেন দেশসেবার প্রেরণা। সখারামও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ইতিহাসচর্চায় তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। সেই অনুরাগের অভিব্যক্তি তাঁর ছাত্রজীবনেই দেখা দিয়েছিল। সেই সময় তিনি বহু ঐতিহাসিক সন্দর্ভ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন। ছাত্র বয়সের তাঁর সেইসব রচনার অনেকগুলি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অরবিন্দের মাতামহ স্বয়ং কিশোর সখারামের সেসব প্রবন্ধের প্রশংসা করতেন বলে জানা যায়। তাঁর মজলিশে সখারামের ছিল নিত্য আনাগোনা। "ঋষি রাজনারায়ণ বসুর সংস্পর্শে আসার ফলেই আমি দেশসেবায় অনুপ্রাণিত,হয়ে উঠেছিলাম।" সখারাম বলেছেন এই কথা।

প্রদীপ থেকেই প্রদীপের উজ্জ্বলন হয়।

দেশহিতব্রতী রাজনারায়ণের অন্তরের দেশপ্রেমের আগুন যেমন সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর দৌহিত্র অরবিন্দের মধ্যে, তেমনি সেই আগুনের উত্তাপ লেগেছিল, সখারামের মনে। তাই তো উত্তরকালে স্বদেশী বাংলার অনলকুণ্ডে দুজনেই অমনভাবে ঝাঁপ দিতে পেরেছিলেন। চব্বিশ বছর বয়সে সখারাম দেওঘর স্কুলে মাসিক পনর টাকা বেতনে সেকেণ্ড পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হলেন। শিক্ষকতার অবসরে তিনি নিয়মিতভাবে 'হিতবাদী' পত্রিকায় সংবাদ-প্রবন্ধ পাঠাতেন। সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতা তিনি একই সঙ্গে শুরু করেছিলেন এবং উভয়ক্ষেত্রেই সমান দক্ষতা প্রদর্শন করে সকলকে বিস্মিত করেন।

* ইনি ঋষি রাজনারায়ণ বসুর পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বসু নন—ইনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু।

'হিতবাদী' তখনকার দিনের বিখ্যাত বাংলা সাপ্তাহিক।

এর সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ছিলেন আরো বিখ্যাত।

জহুরী জহর চেনে। কাব্যবিশারদের বিলম্ব হলো না তাঁর দেওঘর-সংবাদ-দাতাটির প্রতিভা আবিষ্কার করতে। সখারামের প্রেরিত 'দেওঘরের সংবাদ' সেদিন 'হিতবাদী'র পাঠকরা খুব আগ্রহের সঙ্গেই পাঠ করতেন। নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সংবাদ পরিবেশন করার ফলে সখারামকে শীঘ্রই দেওঘরের ম্যাজিস্ট্রেট হার্ডি সাহেবের বিষনজরে পড়তে হলো। একবার সখারাম স্থানীয় জেলা শাসকের কয়েকটি অপকর্মের তীব্র সমালোচনা করে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ 'হিতবাদী'র সম্পাদকের কাছে পাঠালেন। কাব্যবিশারদ সংবাদটি যথারীতি পত্রস্থ করলেন এবং তাঁর প্রিয় সংবাদ-দাতাকে একটি পত্র লিখে বললেন, "এই ধরণের সংবাদের প্রামাণ্য সম্পর্কে সব সময়ে সতর্ক ও সুনিশ্চিত থাকবেন, নতুবা সংবাদদাতা ও সম্পাদক উভয়েরই বিপদ, বেচারা মুদ্রাকরও রেহাই পাবে না।"

কাব্যবিশারদ যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই-ই হলো।

সেই সংবাদটি 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিন পরে একদিন সকালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হার্ডি সাহেব ডেকে পাঠালেন সখারমাকে তাঁর বাংলোয়। মিস্টার হার্ডি জেলা স্কুলের পরিচালক সমিতির প্রেসিডেন্টও ছিলেন। সখারাম তো ম্যাজিস্ট্রেটের তলব পেয়ে বুঝতেই পারেন নি কিজন্য তাঁকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন।

—আপনি সখারাম গণেশ দেউস্কর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি 'হিতবাদী' কাগজের সংবাদদাতা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এই সংবাদটি তাহলে আপনিই পাঠিয়েছেন? এই বলে হার্ডি সাহেব তাঁর টেবিলের উপর থেকে একখানি 'হিতবাদী' কাগজ তুলে নিয়ে তার একটি পৃষ্ঠার একটি চিহ্নিত অংশ সখাবামকে দেখালেন। তিনি অস্বীকার করলেন না। শুধু জানতে চাইলেন—সংবাদটির মধ্যে কোথাও ভুল বা আপত্তিকর কিছু আছে কি না।

—হ্যাঁ, সমস্ত বিষয়টাই আপত্তিকর। সরকারের বিরুদ্ধে কাগজে কিছু প্রকাশ করাই ঘোর আপত্তিকর।

—কিন্তু জনসাধারণের স্বার্থেই—

—জনসাধারণের স্বার্থ—স্টুপিড, ম্যাজিস্ট্রেটের দুই চক্ষু রক্ত বর্ণ, গলার আওয়াজ উচ্চ গ্রামে। সখারাম কিন্তু অবিচলিত।

—আজ থেকে আপনাকে স্কুলের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

—বেশ। আর কিছু বলবেন ?

—হ্যাঁ, এখানে আপনার আর থাকা চলবে না।

সখারাম দেওঘর ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

এলেন তিনি কলকাতায়। এখানকার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে এসে তাঁর সাহিত্যিক ও সাংবাদিক প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ তিনি পেলেন। কাব্য-বিশারদ মহাশয় তখনি তাঁকে 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রুফ-রীডারের একটা চাকরি দিলেন। ১৮৯৭ সালে কলকাতায় শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। সেই থেকে দীর্ঘ পনের বৎসর কাল তিনি এইখানে অবস্থান করে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে নিষ্ঠার সঙ্গে দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে থাকেন। কলকাতায় আসার অব্যবহিত পরেই তিনি প্রথম পর্বের গুপ্তসমিতির সঙ্গে পরিচিত হন। স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করবার এমন একটা দল আছে শুনে, কথিত আছে, এই শিবাজীভক্ত মারাঠী সন্তান খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। বারীন্দ্রকুমারই তাকে সমিতির সভ্যদের সঙ্গে পরিচয়সাধন করিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি 'হিতবাদী'র সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন।

বাংলা দেশে তখন অগ্নিময় উত্তাল পরিবেশ।

কার্জনী বিধানের ফলে শুরু হয়েছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।

সখারাম সেই আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হন এবং বিপিনচন্দ্র-শ্যামসুন্দর-অরবিন্দ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসেন। ইতিমধ্যেই তিনি অবশ্য তাঁদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন শিবাজী উৎসব প্রবর্তন করার জন্য আর বৃহত্তর বাঙ্গালি সমাজে সখারামের নাম তখন লেখক হিসাবে খুবই সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর 'মহামতি রাণাডে', 'ঝাঁসির রাজকুমার', 'বাজীরাও', 'শিবাজীর মহত্ত্ব' প্রভৃতি জীবনী গ্রন্থগুলি তখন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁর যুগান্তকারী 'দেশের কথা' গ্রন্থখানির জন্য।

সখারামের 'দেশের কথা' শুধু কথা নয়।

তখনকার ভারতবর্ষের—শোষিত ভারতবর্ষের—অর্থনৈতিক অবস্থার একটি দলিল ছিল এই গ্রন্থখানি। দাদাভাই নৌরোজি, ডিগবি সাহেব ও রমেশচন্দ্র দত্ত এর আগে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমস্যা ও ভারতবাসীর শোচনীয় দারিদ্র্য সম্পর্কে যেসব মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, প্রধানত সেইগুলি অবলম্বন করেই 'দেশের কথা' রচিত হয়েছিল। তাঁর এই গ্রন্থ রচনার নেপথ্য প্রেরণা ছিলেন অরবিন্দ, তিনিই সখারামকে ঐ বই লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন।

বইটি প্রকাশিত হওয়ামাত্র হাজার হাজার কপি বিক্রী হয়ে যায় এবং সকলের মুখেই তখন 'দেশের কথা'র জয়গান। স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে বইটি প্রকাশিত হয়ে সেই আন্দোলনকে কতখানি শক্তিশালী করে তুলেছিল সেইসব কাহিনী আমরা সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানতে পারি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সখারামের গুণমুগ্ধ ছিলেন, বিশেষ করে তাঁর এই বইটির তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। উপাধ্যায়ের যেমন 'সন্ধ্যা', সখারামের তেমনি 'দেশের কথা'—দুই-ই সেদিন রচনা করেছিল দেশাত্মবোধের বেদী।

রাজনীতিতে সখারাম ছিলেন টিলকের মন্ত্রশিষ্য।

লোকমান্যের রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুগামী ছিলেন তিনি।

১৯০৭ সাল। সুরাট কংগ্রেস। 'হিতবাদী'র স্বত্বাধিকারিগণ ছিলেন মডারেট-পন্থী। সুরাট কংগ্রেসে বাংলার জাতীয়তাবাদীদল টিলককে সভাপতি করতে চেয়েছিলেন এবং তারই পরিণতি সুরাটের দক্ষযজ্ঞ। পত্রিকার মালিকপক্ষ সম্পাদক সখারামকে তখন টিলকের বিরুদ্ধে লিখবার জন্য নির্দেশ দিলেন। তখন সেই তেজস্বী মারাঠী ব্রাহ্মণের আত্মমর্যাদাবোধ তাঁর অন্তরে বিদ্যুতের মতো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। যাঁর কাছে স্বাদেশিকতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তিনি, সেই লোকমান্যের বিরুদ্ধে তিনি তো কিছুতেই লেখনী ধারণ করতে পারেন না। 'হিতবাদী'র কর্তৃপক্ষের এই অন্যায় অনুরোধের বিরুদ্ধে সখারামের সমস্ত মন-প্রাণ যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তিনি এক কথায় 'হিতবাদী'র একশো টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি দরিদ্র, কিন্তু তাই বলে বিবেকের বিরুদ্ধে কলম ধরতে পারেন না।

এই তো খাঁটি দেশপ্রেমিকের মূর্তি!

অরবিন্দ তখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ। তিনি এই সংবাদ শুনে বিচলিত হলেন। তখনি সখারামকে তিনি জাতীয় কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করলেন। এখানে সখারাম ছাত্রদের ইতিহাস ও অর্থনীতি পড়াতেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করা তাঁর অদৃষ্টে ছিল না। ঠিক এইসময়ে সরকার তাঁর দুখানি বই বাজেয়াপ্ত করেন। 'দেশের কথা' ও 'টিলকের মোকদ্দমা।' এই দুখানি বই থেকেই তখন তাঁর সামান্য আয় হতো। বই বাজেয়াপ্ত হলো, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের শঙ্কিত কর্তৃপক্ষের মনোভাব অবগত হয়ে সখারাম অধ্যাপকের পদে ইস্তফা দিলেন। এইখানেই তাঁর কর্মজীবনের শেষ। এর অল্পদিন পরে তিনি দেওঘরে ফিরে আসেন ও এইখানে তাঁর গ্রামের বাড়িতে ১৯১২ সালের ২৩শে নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

মহারাষ্ট্রের সন্তান হয়েও সখারাম বাঙালিকে আপনজন বলে মনে করতেন

আর বাংলাদেশকে তাঁর মাতৃভূমি বলে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর 'দেশের কথা' স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙালি তরুণদের কাছে দেশপ্রেমের 'বাইবেল' স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। দেশের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা, শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থার কথা, সর্বজনবোধগম্য ভাষায় সাধারণ পাঠকদের জন্য রচনা করে, পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর এই শতাব্দীর প্রারম্ভে যে মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করে গিয়েছেন, আজ সেই কথা স্মরণ করে, সেই নির্যাতিত দেশহিতৈষীর স্মৃতির উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধা-বিনম্রচিত্তে জানাই প্রণাম।

॥ একুশ ॥

ইতিহাসের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে নিতে হবে।

আর জীবনকে ইতিহাসের সঙ্গে।

তবেই না জীবনের সত্য পরিচয়, তার প্রতিটি পদক্ষেপের অর্থ আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। মানুষের জীবনে নানা রঙের, নানা ভাবের সমাবেশ। সেই রঙ, সেই ভাবকে দেখতে হবে, বুঝতে হবে ইতিহাসের ভিতর দিয়ে, নতুবা ভুল বোঝবার, ভুল বোঝাবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। যুগমানব শ্রীঅরবিন্দের জীবনের সম্মুখে, পিছনে, দক্ষিণে ও বামে যে ইতিহাস প্রসারিত রয়েছে, সেই ইতিহাস থেকে তাঁকে তো আমরা বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি না। সেইজন্যই আমরা কখনো কাহিনী থেকে ইতিহাসে, কখনো বা ইতিহাস থেকে কাহিনীতে আনাগোনা করছি, শ্রীঅরবিন্দের জীবনের গতিপথ যথার্থভাবে অনুসরণ করবার জন্য। তাঁর জীবনে দেশের ইতিহাস, জাতীয় সভ্যতা এবং জাতীয় জাগরণের সঙ্গে একাত্ম। তাই অরবিন্দের জীবন কথা বলতে গিয়ে ঘটনা যেমন বলতে হবে, ইতিহাসের কথাও তেমনি বলতে হবে। আবার ঘটনা ও ইতিহাসের চেয়ে তত্ত্বের কথা আরো বেশি বলতে হবে। নতুবা এই অসাধারণ ও জটিল জীবনের প্রতি সুবিচার করা যাবে না।

ইতিহাসের দিক থেকে দেখছি অরবিন্দের বরোদা জীবন ছিল নানা দিক দিয়েই একটা বিরাট প্রস্তুতি-পর্ব। একই সঙ্গে তিনি অনেক বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং চিন্তা করে একটির পর একটি কাজে হাত দিয়েছেন। অধ্যয়ন, সাহিত্যকর্ম অধ্যাপনার সঙ্গে সমসাময়িক রাজনীতির উপর যেমন তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন, তেমনি বাংলা দেশে বিপ্লবের প্রাথমিক কাজটাও সমাধা করেছেন নিঃশব্দে। কিন্তু এসব ছাড়াও এই যুগেই তাঁর আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির ও যোগের পথে প্রবেশেরও একটা চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বা তাঁর সাধনার বিবরণ আমরা যথাস্থানে পৃথকভাবে আলোচনা করব, আপাতত তাঁর বরোদায় অবস্থানকালে এইদিক দিয়ে তিনি কতটুকু অগ্রসর হয়েছিলেন, সেই সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করছি।

তাঁর এক জীবনীকারের মতে, বরোদায় প্রথম দিকে দর্শনতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্বের দিকে অরবিন্দের তেমন আগ্রহ ছিল না। নীরস পাণ্ডিত্যের অতিরিক্ত কিছু

নয় এসব—এই ছিল তাঁর তখনকার ধারণা। "একজন সাহিত্যিকের পক্ষে দর্শন বিষয়ে যতটুকু জেনে রাখা দরকার ততটুকুই তিনি জেনেছিলেন, কিন্তু ঐ নিয়ে তেমন কোন চর্চা করেন নি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে পরিচয় অতি অল্পমাত্রই ছিল।" কিন্তু আগ্রহটা জাগল বিবেকানন্দের রচনা পাঠ করে, বিশেষ করে নিবেদিতার কাছ থেকে যে 'রাজযোগ' বইটি পেয়েছিলেন, সেটি পড়ার পর। স্বামীজির রচনাগুলি অরবিন্দ-মানসে শুধু সুস্পষ্টভাবে রেখাপাতই করল না, তারই ভিতর দিয়ে তাঁর জীবনে এসে পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব। পড়লেন তখন ম্যাকসমুলারের লেখা রামকৃষ্ণ-চরিত। গভীরভাবে অভিভূত হলেন তিনি। অভিভূত এবং আত্মস্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ।

নবীন ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনার দুইটি উজ্জ্বল শিখা।

নিষ্কম্প ও প্রোজ্জ্বল সেই শিখার আলোকে অরবিন্দ যেন প্রত্যক্ষ করলেন যুগ-যুগান্তের ভারতের অধ্যাত্ম মহিমা। আধ্যাত্মিকতার আলোর প্রথম আভাস এলো তাঁর জীবনে, তাঁর চেতনায়। এই দুই তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের জীবন, সাধনা ও বাণীর ভিতর দিয়েই তিনি যেন এক স্বর্ণখনির সন্ধান পেলেন—সন্ধান পেলেন ভারতের অধ্যাত্ম শক্তির। আমরা কল্পনা করতে পারি, বরোদায় তাঁর সেই খাপরার ঘরে বসে রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে জুয়েল ল্যাম্পের আলোকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে স্বামী বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত মাদ্রাজ বক্তৃতাটি পাঠ করছেন :

"প্রত্যেক জাতিরই জীবনীশক্তি এক এক বিশেষ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক জাতিই বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে আর ধর্মই ভারতবাসীর সেই বিশেষত্ব। ভারতে ধর্মজীবনই আমাদের জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ , উহাই যেন জাতীয় জীবনরূপ সঙ্গীতের প্রধান সুর।· ·সুতরাং যদি তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি বা অপর কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফল হইবে এই যে, তোমরা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। যাহাতে এরূপ না ঘটে, তজ্জন্য তোমাদিগকে তোমাদের জীবনীশক্তি স্বরূপ ধর্মের মধ্য দিয়া সকল কার্য করিতে হইবে। তোমাদের স্নায়ুতন্ত্রীসমূহ তোমাদের ধর্মরূপ মেরুদণ্ডে দৃঢ় সম্বদ্ধ হইয়া তাহাদের সুর বাজাইতে থাকুক। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতি। আধ্যাত্মিকতাই সমগ্র জাতিকে একদিন অধিকার করিবে। পাশ্চাত্যের লোকেরাও এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে জাতি হিসাবে বাঁচিতে হইলে তাহাদের প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতা।"*

জাতীয় জীবনের লক্ষ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি।

* ভারতে বিবেকানন্দ : উদ্বোধন।

বিবেকানন্দর বক্তৃতার মধ্যে এই কথাটি অরবিন্দের অন্তরকে স্পর্শ করলো।

যতই পড়েন ততই তাঁর চেতনায় দীপ্যমান হয়ে উঠতে থাকে এই সত্যটি যে, ধর্মই জীবনের আশ্রয়, জাতীয়তার আশ্রয়, সমাজের আশ্রয়। উত্তরকালে শ্রীঅরবিন্দ 'ধর্ম ও জাতীয়তা' নামে যে পুস্তকটি রচনা করেছিলেন তার বীজ কি বরোদায় থাকবার সময়ে এইভাবে তাঁর হৃদয়ে রোপিত হয়েছিল? এইভাবে বিবেকানন্দের রচনাবলী যতই তিনি পাঠ করতে থাকেন ততই অরবিন্দর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে: "এ কেবল একজন আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসীর কথা নয়, কেবল পরমাত্মার অদ্বিতীয় সত্তায় বা শাশ্বত সচ্চিদানন্দে আস্থাবানের কথা নয়, এর মধ্যে আরো এই বিশ্বাসটি বদ্ধমূল রয়েছে যে ভারতই কেবল ঐ আধ্যাত্মিকতার অমূল্য বাণী সারা জগতে প্রচার করতে সক্ষম। এ কর্তব্য ত্যাগ করলে ভারতের স্বধর্ম ত্যাগ করা হবে।" বিদ্যা, জ্ঞান, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য—এসবের চূড়ায় বসেছিলেন অরবিন্দ, কিন্তু তাঁর অধ্যাত্ম-মানসের উদ্বোধনের পক্ষে এগুলি কিছুমাত্র সহায়ক হয় নি যেমনটি হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও তাঁর অলৌকিক সাধনা। এঁরই মধ্যে তিনি পেলেন খাঁটি সোনা। এই লীলায় অক্ষর পুরুষ নিরক্ষর হয়ে এসেছিলেন। তিনি যেন আধ্যাত্মিকতার জমাট মূর্তি—পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরশূন্য নিরাবরণ অকৃত্রিম আধ্যাত্মিকতার এমন প্রকাশ কে কবে দেখেছে? উত্তরকালে বিশ্ববরেণ্য এই মহাপুরুষ সম্পর্কে অরবিন্দ যা লিখেছিলেন সেটি প্রসঙ্গক্রমে এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম:

"শ্রীরামকৃষ্ণ যেমনভাবে থাকতেন হয়ত অনেকে একজন পাগলের কাণ্ড বলবে। কোন একজন ব্যক্তি, যার কিছুমাত্র লেখাপড়ার বিদ্যা নেই, সভ্যতা বা সংস্কৃতির কোন ধারই যে ধারে না, পরের কাছে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে যার পেট চলে, এমন একজনের সম্বন্ধে ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রজন মাত্রই মন্তব্য করবে যে কোন কিছু অনিষ্ট না করলেও সমাজের পক্ষে এমন মানুষ অচল ও অপ্রয়োজনীয়। সে বলবে—এ তো মূর্খ, নিজেই কিছু জানে না। আমি পাশ্চাত্যের এত সব বড় বড় বিদ্যা আয়ত্ত করে ফেলেছি, আমাকে ও আর নতুন কি শেখাবে? কিন্তু ইনি যে ঐভাবে থেকেই কোন মহৎ কাজ করে যাচ্ছিলেন, স্বয়ং ভগবান সে কথা জানতেন। তিনিই ওঁকে পাঠিয়েছিলেন এই বাংলাদেশে, কলকাতার কাছে ঐ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। আর উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম চারি প্রান্ত থেকে কত সব ভাল ভাল শিক্ষিত লোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য কত সব মহা মহা পণ্ডিত, য়ুরোপ থেকে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাপ্রাপ্ত কত জ্ঞানী ব্যক্তি, তারা সবাই এসে ফকির সন্ন্যাসীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। সমগ্র মানবজাতির মুক্তির কাজ, ভারতকে সকলের উর্ধ্বে তুলে দেবার কাজ এমনি করে ঐখান থেকেই প্রথম শুরু হয়ে গেল।"*

---

* কর্মযোগিন্: ১৯০৯।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বরোদায় অবস্থানকালেই অরবিন্দের চিত্তলোক আধ্যাত্মিকতার আলোকে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হতে শুরু করেছিল এবং ক্রমে তিনি এইদিকেই সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হতে থাকেন সকলের অলক্ষ্যে। উপনিষদে পড়েছেন তিনি—'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'—ভারতের এই আধ্যাত্মিকতা এমন জিনিস যাকে শুধু বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা লাভ করা যায় না। উপনিষদে আরো জেনেছেন—'ন বলহীনেন লভ্য'—শক্তিহীন বা আরামপ্রিয় হলে এই আত্মার নাগাল পাওয়া যায় না। কঠোপনিষদ পাঠ করে তিনি জেনেছেন, কোন্ পথ দিয়ে গিয়ে প্রাচীন ঋষিরা ওখানে পৌঁছেছেন। যোগবিধি হলো সেই পথ। কিন্তু সহজ নয় তো এ পথ—এ পথ ক্ষুরধারের মতো অতি সূক্ষ্ম আর এ পথে চলা বড়ই কঠিন। কিন্তু পৃথিবীর বুকে এক বিরাট শক্তিকে—অতিমানস শক্তিকে নামিয়ে আনার জন্য যাঁর আবির্ভাব, সেই যুগমানব শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্নিহিত সহজাত প্রবৃত্তি তাঁকে যে তখন থেকেই হাতছানি দিয়ে ঐ পথেই আকর্ষণ করে চলছিল, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। যে হাতছানির কথা বললাম, আসলে সেটা ছিল তাঁর অন্তর থেকে আসা অভ্রান্ত ও অপরিহার্য নির্দেশ। পরে আমরা দেখতে পাব যে, "সেখানে প্রবেশ করে একদিন তিনি তাঁর নিজস্ব এক অপূর্ব ও অসমসাহসিক সাধনার জোরে আরো উজ্জ্বলতর আলোক এনে এই পথকে আরো সূর্যালোকিত করে তুলবেন।"

তাঁর এক জীবনীকারের মতে বরোদায় আসবার পূর্বেই অরবিন্দের কিছু কিছু অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ হয়েছিল, কিন্তু তখন সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেন নি তিনি। এ তাঁর যোগ অভ্যাস শুরু করবার বহু পূর্বের কথা। শোনা যায়, বিলাতে তাঁর সহপাঠী দেশপাণ্ডে তাঁর বন্ধুকে নাকি একবার বলেও ছিলেন যোগ অভ্যাস করতে। যোগ? সেটি আবার কী বস্তু? মনে হয়, দেশপাণ্ডের এ কথায় তখন তিনি আদৌ কর্ণপাত করেন নি। তারপর ক্রমে অন্তর থেকে এলো প্রবল প্রেরণা এই পথের পথিক হবার জন্য। তখন আর কিছুতেই তিনি এর থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারলেন না। উপনিষদের আলোয় তিনি দেখলেন, ভারতের প্রাচীন ঋষিরা যেসব আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা বলে গেছেন, সেগুলি নিছক অনুমান নয়, কল্পনা নয়, তাঁদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। সেই অনুভূতিকে তিনি নিজের মধ্যে পেতে চাইলেন, প্রত্যক্ষ ও চরম উপলব্ধির বলয়ের মধ্যে তাকে আনতে চাইলেন এবং সেটা না হওয়া পর্যন্ত, সংকল্প করলেন, এ পথ থেকে তিনি নিবৃত্ত হবেন না।

কিন্তু সে পথে তাঁকে নিয়ে যাবে কে?

একজন সক্ষম দিশারীর প্রয়োজন।

প্রয়োজন ব্রহ্মজ্ঞ এক গুরুর।

ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনা যুগে যুগে এই ধারায় চলে আসছে। এ বিদ্যা—এই

ব্রহ্মবিদ্যা সর্বতোভাবেই গুরুমুখী। অরবিন্দের মন তখন বললে, এ পথে যারা প্রথমে চলতে যায় তারা সাধারণত এমন একজন গুরুকে ধরবার চেষ্টা করে, যিনি এই রহস্যময় পথের প্রকৃত সন্ধান তাদের জানিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর মনের মতো তেমন কোন আচার্যের সন্ধান পেলেন না অরবিন্দ, যদিও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন অনেক মহাপুরুষের কাছ থেকে কিছু কিছু নির্দেশ তিনি পেয়েছিলেন। নর্মদাতীরে গঙ্গা মঠের শ্রীব্রহ্মানন্দজী ছিলেন এইরকম একজন প্রাচীন যোগী যাঁর কাছে অরবিন্দ যোগ সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। ইনি থাকতেন নর্মদা নদীর তীরে চান্দোতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি আশ্রমে। তাঁর এই আশ্রমটি ঐ অঞ্চলে 'গঙ্গামঠ' নামে পরিচিত ছিল। তিনি কৃপা করে অরবিন্দকে দর্শন দিয়েছিলেন। এঁর শিক্ষাদান পদ্ধতিটা ছিল একেবারে অভিনব, মুখের কথা দিয়ে নয়, চোখের দৃষ্টি দিয়েও নয়। তাঁর কাছে দু' দণ্ড বসলেই দর্শনপ্রার্থীর মনস্কাম সিদ্ধ হতো, এই রকম কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল তাঁর সম্পর্কে। তাঁকে কেউ যদি দর্শন করতে যেত, তার চোখের দিকে তিনি কখনো চোখ তুলে তাকাতেন না।

কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল শ্রীঅরবিন্দের ক্ষেত্রে।

পরম সাধু শ্রীসদ্‌গুরু ব্রহ্মানন্দ দর্শনে এলেন একবার অরবিন্দ গঙ্গামঠে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু দেশপাণ্ডে। ভবিষ্যতের এক মহাযোগীর দিকে দুই চোখ মেলে তাকালেন বর্তমানের আর এক মহাযোগী। শুধু তাকানো নয়, আশীর্বাদও করলেন। শ্রীঅরবিন্দ পরে এ কথা বলেছিলেন যে, ব্রহ্মানন্দের চক্ষু দুটি ছিল অনিন্দ্যসুন্দর। শোনা যায়, এই ব্রহ্মানন্দেরই কোন শিষ্য প্রথমে শ্রীঅরবিন্দকে প্রাণায়াম করতে শিখিয়ে দেন। এর পরে আরও দু'একবার তিনি গঙ্গামঠে ব্রহ্মানন্দ-দর্শনে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ নিজে বলেছেন: "জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কিত কাজে যোগদানের বহুপূর্বে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি আমাকে কোন উপদেশ বা নির্দেশ দেন নি, এমন কি তাঁর সঙ্গে আমার কোন কথাবার্তাও হয় নি। আমি তাঁর মঠে গিয়েছিলাম শুধু তাঁর দর্শনের জন্য ও তাঁর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য।" শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবনের সেই প্রথম সূচনা।

অন্যান্য বিবরণ থেকে আমরা আরো জানতে পারি যে, বরোদা থাকতেই তিনি ১৯০৪ সাল থেকে রীতিমত প্রাণায়াম ও ধ্যান করতে শুরু করেন, আর তখন থেকেই এতে প্রত্যহ অনেকখানি সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। এ ছাড়া, বাংলা দেশে থাকবার সময় তিনি দু'বার গোয়ালিয়রে গিয়ে শ্রীবিষ্ণুভাস্কর লেলে নামে আরেকজন যোগীর সংস্পর্শে আসেন এবং যোগের ব্যাপারে এঁর কাছ থেকেও অনেক রকম সাহায্য পেয়ে যান। ঠিক গুরু বলতে যা বুঝায়,

ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তাঁর সেই সম্পর্ক কোন দিনই ছিল না। আর গায়কোয়াড়ের প্রাসাদে তিনি একবার স্বামী পরমহংস মহারাজ ইন্দ্রপ্রস্থের বক্তৃতা শুনেছিলেন। তবে এ কথা সত্যি যে, বরোদা-পরবর্তী যুগে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা একান্তভাবে তাঁরই স্ব-নির্দেশিত ছিল। অবশ্য বরোদায় অবস্থান কালে যোগের পথে বা আধ্যাত্মিক পথে তিনি যে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, যদিও বাইরে তার প্রকাশ খুব সামান্যই ছিল, কিংবা আদৌ ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁর অন্তরঙ্গস্থানীয় দু'একজন ব্যতীত খুব কম লোকেই জানত যে তখন অরবিন্দ যোগাভ্যাস করতেন। একমাত্র তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর নিকট তিনি তাঁর যোগ সাধনার কথা বলেছিলেন বলে জানা যায়।

১৯০৪। আগস্ট মাস।

বরোদার নতুন রাজস্ব-সচিব হয়ে এলেন রমেশচন্দ্র দত্ত।

এঁর কথা অরবিন্দ দু'বছর আগে শুনেছেন নিবেদিতার কাছে। নিবেদিতার 'ধর্মপিতা' ছিলেন রমেশচন্দ্র। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও দেশপ্রেমের জন্য নিবেদিতা তাঁকে যারপর নাই শ্রদ্ধা করতেন। রমেশচন্দ্রও তাঁকে কন্যাবৎ স্নেহ করতেন। সারা ভারতে তখন এই বাঙালি সন্তানের নাম। তিনি সিভিল সার্ভিসের একজন স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন বলেই তাঁর এই খ্যাতি নয়—ভারতের রাজনৈতিক দাবী নিয়ে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে তিনি যেমন রাজশক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করেছিলেন, তেমনি ভারতবাসীর অন্যান্য বহুবিধ সমস্যা নিয়ে, বিশেষ করে তাদের অর্থ নৈতিক সমস্যা, তাদের দারিদ্র্য, ভারতের কৃষকশ্রেণীর দুঃখ দুর্দশা নিয়েও তিনি তাঁর মস্তিষ্ক আলোড়িত করেছেন। কিন্তু এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ কাজ তিনি করেছিলেন ভারতের প্রাচীন গৌরবের পুনরুদ্ধার করে, তার ইতিহাস প্রণয়ন করে, হিন্দু শাস্ত্র সংকলন করে, ঋগ্বেদের বাংলা অনুবাদ করে এবং ইংরেজিতে রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ করে। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন রমেশচন্দ্রের কথা অরবিন্দের কাছে তাই অজানা ছিল না। বিলাতে ছাত্রজীবনে, আমরা অনুমান করতে পারি, তিনি রমেশচন্দ্রের সেই অতুলনীয় সাহিত্যকীর্তি 'এ হিস্ট্রি অব সিভিলাইজেসন ইন এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া' গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই পাঠ করে থাকবেন। বরোদায় এসে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও পড়ে থাকবেন এবং এই শতাব্দীর প্রথমেই প্রকাশিত তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ—'দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' অরবিন্দ যে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন তা আমরা জানতে পারি

১৯০৯ সালে রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে* 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের লেখা থেকেই। কাজেই বরোদায় তিনি যখন রাজস্ব সচিব হয়ে এলেন তখন অরবিন্দ নিশ্চয়ই রমেশচন্দ্রের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

এসেছিলেন তার প্রমাণ আছে।

রমেশচন্দ্র যখন বরোদায় আসেন রাজস্ব-সচিব হয়ে ঠিক সেই সময়ে অরবিন্দ বরোদায় উপস্থিত ছিলেন না—তিনি তখন বাংলা দেশে গিয়েছিলেন গুপ্তসমিতির দ্বিতীয় পর্বের কাজকর্ম দেখবার জন্য। ফিরে এসে শুনলেন নতুন রাজস্ব-সচিবের আগমনের কথা। রমেশচন্দ্র ও অরবিন্দ—এই দুইজন দিক্‌পাল বাঙালি সন্তান একই সামন্তরাজ্যে একই সময়ে দেড় বছর কাল একত্রে কাজ করেছিলেন। বয়সে রমেশচন্দ্র তাঁর পিতৃতুল্য ছিলেন আর পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় নিতান্ত কম ছিলেন না। সে যুগে আধুনিক ভারতবর্ষের নির্মাতা বলে আমরা যাঁদের গণ্য করে থাকি, রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁদেরই মধ্যে একজন ছিলেন। উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে মিল ছিল—রমেশচন্দ্র ও অরবিন্দ উভয়েই দেশকে ভালবাসতেন, যদিও রাজনৈতিক আদর্শ ও উপায় সম্পর্কে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তথাপি একথা স্বীকার্য যে, "এই দুই বাঙালি প্রতিভার বরোদারাজ্যে এই বৎসরে (১৯০৪) যে মিলন, সে মিলন বাংলার প্রাচীন ও অতি-অগ্রসর নবীনের মিলন।" এবং দুজনেই একত্রে কিছুকাল বরোদারাজ্যে নিজ নিজ প্রতিভার আলোক বিকীর্ণ করেছেন। বাঙালির কাছে এটা বড় কম গৌরবের কথা নয়।

বরোদার মহারাজা সয়াজিরাও বিলাত থেকে প্রথম রত্ন সংগ্রহ করেন অরবিন্দকে নিয়ে এসে আর দ্বিতীয় রত্নটি সংগ্রহের জন্য তাঁকে অনেক দিন প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল এবং বিশেষভাবে অনুরোধ-উপরোধ করতে হয়েছিল। সেদিনকার ভারতবর্ষের আর কোন সামন্ত রাজ্যে একই সময়ে এমন যুগল রত্নের সমাবেশ দেখা যায় নি। এদিক দিয়ে গায়কোয়াড়কে সৌভাগ্যবান নৃপতি বলতেই হবে। বোধকরি বরোদার রাজভাণ্ডারেও এই রকম মহার্ঘ রত্ন ছিল কিনা সন্দেহ। দিগ্বিজয়ী বাঙালির এই কীর্তির কথা আজকের দিনে কয়জন বাঙালি-সন্তান মনে রেখেছে? অরবিন্দের কথা রমেশচন্দ্র অল্প-বিস্তর তাঁর বন্ধু ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের কাছে ইতিপূর্বেই শ্রুত ছিলেন।

একদিন রমেশচন্দ্র নিমন্ত্রণ করলেন অরবিন্দকে তাঁর বাংলোয়। তিনি মনে-প্রাণে খাঁটি ভারতীয় বটে, কিন্তু আচারে-আচরণে, পরিচ্ছদে কৃষ্ণধনের মতোই পাকা সাহেব। বিদ্যাসাগর তো তাঁকে 'সাহেব' বলেই ডাকতেন্। চৌদ্দ বছর

* রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) বরোদাতেই মারা যান এবং মৃত্যুকালে তিনি বরোদারাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। লেখকের 'রমেশচন্দ্র' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বিলাতে রেখেও কৃষ্ণধন তাঁর এই পুত্রটিকে 'সাহেব' করে তুলতে পারেন নি। অরবিন্দ এলেন রমেশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিতান্ত সাদাসিধা পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়েই। কিন্তু তাঁর আপাদমস্তক প্রতিভার যে প্রখর দীপ্তিতে ভাস্বর ছিল, তা রমেশচন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি সস্নেহে অরবিন্দকে অভ্যর্থনা করলেন। অববিন্দ চিরকালই কেমন যেন 'মুখচোরা' মানুষ, অন্যদিকে উচ্ছল প্রাণশক্তিতে ভরপুর রমেশচন্দ্র অনর্গল কথা বলে চলেছেন। নানা কথার মধ্যে ভারতের মহাকাব্য দু'খানির প্রসঙ্গ উঠল।

—এই রামায়ণ মহাভারতই ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তুমি কি বলো ?

—আমারও ঐ একই মত।

—আচ্ছা, ওদেশের প্রাচীন মহাকাব্যের সঙ্গে কি এর তুলনা চলে ?

—না। ব্যাস-বাল্মীকির তুল্য প্রতিভা পৃথিবীতে বিরল। মহাকবি দান্তের কবিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলাম, হোমারের ইলিয়াড্ পাঠে পরিতৃপ্ত হয়েছিলাম, য়ুরোপের সাহিত্যে তা অতুলনীয়। কিন্তু কবিত্বে বাল্মীকি সর্বশ্রেষ্ঠ—তাঁর তুল্য মহাকবি, পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই, অন্তত এই আমার ধারণা।

—ঠিক বলেছ। আর সেইটাই ওদের দেখাবার জন্য আমি বিলাতে থাকতে ইংরেজি পদ্যে এই মহাকাব্য দুটির অনুবাদ করে প্রকাশ করেছি। জানো বোধ হয় ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার সে অনুবাদ আমি পাঠ করেছি।

—পড়েছ নাকি ? কেমন হয়েছে বলো ত ?

—মহাভারতের ভূমিকায় আপনি একটি সুন্দর কথা লিখেছেন: "এই কাব্য প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ও জীবনের জ্ঞান-রত্নাকর। মহাভারত অতীতের অবগুণ্ঠন মোচন করে বিগত সভ্যতাকে দৃশ্যমান করে তুলেছে।" বড় সুন্দর এই বিশ্লেষণ। আর রামায়ণের ভূমিকায় আপনি এই দুটি কাব্যের মধ্যে তুলনা করে বলেছেন: "মহাভারত মহাকাব্য, আর রামায়ণ ভারতবাসীর হৃদয়ের ধন।"—এটাও খুব চমৎকার কথা।

—হ্যাঁ, আমার চক্ষে এই কাব্য দু'খানি হিন্দু জাতির শাশ্বত সম্পদ।

—সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে।

—কিন্তু সে কথা থাক। আমার অনুবাদ ত পড়েছ, কেমন লাগল ?

—ভাল, খুবই ভাল লেগেছে। আপনার এই অনুবাদ থেকে প্রেরণা পেয়ে আমিও কিছু চেষ্টা করেছি।

—করেছ নাকি ? খুব ভাল কথা। একদিন শোনাবে আমাকে।

নিজের সম্বন্ধে অরবিন্দ বরাবরই চাপা প্রকৃতির। সহসা তিনি তাঁর সেই অনুবাদ রমেশচন্দ্রকে দেখাতে চান নি। বিশেষ অনিচ্ছার সঙ্গে পরে আরেক-

দিন তাঁর অনুবাদ দেখালেন রমেশচন্দ্রকে। রমেশচন্দ্র অপূর্ব সেই রচনা দেখে অভিভূত হয়ে বললেন: "ইতিপূর্বে যদি তোমার রামায়ণ ও মহাভারতের এই অনুবাদগুলি আমার চোখে পড়ত, আমি তবে কখনোই আমার অনুবাদগুলো ছাপতে দিতাম না। তোমার এই অতুলনীয় অনুবাদের পাশে আমারগুলি মনে হচ্ছে নিছক ছেলেখেলা।"

রমেশচন্দ্রের অনুবাদ বিলাতে বিদগ্ধ সমাজে অভিনন্দিত হয়েছিল, তথাপি, অরবিন্দ-কৃত অনুবাদ পাঠ করে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তাতে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে, বলতে হবে। দুঃখের বিষয়, শ্রীঅরবিন্দের এই রচনার কোন হদিস পাওয়া যায় না। তাঁর বহু অবলুপ্ত বা বিনষ্ট রচনার মধ্যে এটিও একটি। সেদিন রমেশচন্দ্রের মতো একজন মনীষী অরবিন্দ-প্রতিভায় যে এমন উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন, এ কথা স্মরণ করেও আমরা আনন্দবোধ করি, গর্ববোধ করি। ভারতের শাশ্বত আত্মার পরিচয় এই দুই প্রবীণ ও নবীন বাঙালি যে ভারতের মহাকাব্য দু'খানির ভিতর দিয়ে লাভ করেছিলেন, এর তাৎপর্যটা পরবর্তীকালে তাঁদের স্বজাতি কতটুকু অনুধাবন করতে পেরেছে, সেইটাই আমাদের বিশেষভাবে বলবার কথা এবং সেইজন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম।

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁর প্রতিভার মূল্যায়ন করে অরবিন্দ তাঁর 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় লিখেছিলেন: "তাঁর সমসাময়িক বিশিষ্ট বঙ্গ-সন্তানদের মধ্যে রমেশচন্দ্রের মৌলিকত্ব খুব কম ছিল। যদিও কংগ্রেসের সক্রিয় নেতাদের মধ্যে কিছুকাল তিনিই ছিলেন সকলের পুরোভাগে, তথাপি রানাডে বা সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায় না। তাঁর সাহিত্যপ্রতিভাও যে খুব উচ্চ স্তরের ছিল তা নয়, সংস্কৃতে তিনি যে একজন সুপণ্ডিত ছিলেন তাও নয়, অর্থনীতিবিদ্ হিসাবে রানাডে বা গোখেলের সঙ্গেও তাঁর তুলনা করা চলে না—তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যা কিছু লেখা হয়েছে, সে সব রচনার মধ্যে রমেশচন্দ্রের রচনাই, রাজনৈতিক বিচারে, সবচেয়ে ফলপ্রসূ। তাঁর প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস তাঁর অতুলনীয় সাহিত্যকীর্তি। কিন্তু সবচেয়ে বড় কাজ যা তিনি সম্পন্ন করেছেন তা হলো লর্ড কার্জনকে লেখা তাঁর পত্রাবলী আর তাঁর অর্থনৈতিক ইতিহাস। শেষোক্ত ক্ষেত্রে, এ কথা বলা যেতে পারে, তিনি শুধু ইতিহাসই রচনা করেন নি—পরন্তু তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।" কিন্তু রমেশচন্দ্র সম্পর্কে আসল কথাটি বলতে অরবিন্দ বিস্মৃত হয়েছেন। সেটি হলো রমেশচন্দ্রের দেশপ্রেম। সেকথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, বলেছেন ভগিনী নিবেদিতা।

॥ বাইশ ॥

যোগাভ্যাসই করুন আর প্রাণায়ামই করুন, অরবিন্দের মন কিন্তু তখন বাংলাদেশে তাঁর গুপ্তসমিতির উপর নিবদ্ধ ছিল। এর প্রথম পর্বের ইতিহাস ১৯০২ থেকে ১৯০৪, এবং এরই মধ্যে আমরা দেখতে পাব তার ক্রমবিকাশের ধারা এবং শেষ পর্যন্ত তার ব্যর্থতার চিত্র। অনেক আশা নিয়েই তিনি এই কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু আশা ভঙ্গের বেদনাও তাঁর বুকে বড কম বাজেনি সেদিন। এই ইতিহাসটা আমাদের খুব ভাল করে জানা দরকার। অরবিন্দ-প্রবর্তিত গুপ্তসমিতির প্রথম উদ্যোগ কেন পণ্ড হলো তার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রযোজন নেই। আমরা শুধু মূল ঘটনার ধারা অনুসরণ করব এই অধ্যাযে।

আমরা আগেই দেখেছি, অরবিন্দ বরোদা থেকে প্রথমে যতীন্দ্রনাথকে, পরে কনিষ্ঠ সহোদরকে পাঠালেন বাংলাদেশে এবং পরে নিজেও আসা-যাওযা করতে থাকেন। কিন্তু তিনি আদৌ অনুমান করতে পারেন নি যে, নিকট ভবিষ্যতে সমিতির এই দুই উপ-নেতার মধ্যে নেতৃত্ব নিযে একদিন তুমুল কলহ বাধবে ও সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন পণ্ড হয়ে যাবে। কলকাতায় গুপ্তসমিতির প্রথম কেন্দ্রটি ছিল সার্কুলার রোডে কোন একটি স্থানে, এর দ্বিতীয় কেন্দ্র স্থাপিত হয় গ্রে ষ্ট্রীটে। ১৯০৪ সালে অরবিন্দ বরোদা থেকে কলকাতায এলেন উপনেতৃত্ব নিয়ে যতীন্দ্র ও বারীন্দ্রের মধ্যে যে কলহের সূত্রপাত হয়েছিল তার একটা মিটমাট করবার জন্য। আলো-আঁধারের ইতিহাস থেকেই যেটুকু তথ্য আমরা উদ্ধার করতে সমর্থ হই তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, গুপ্তসমিতির জন্য লোক-সংগ্রহ ও অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারে বারীন্দ্র ও যতীন্দ্র যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, অনেকের বিবেচনায়, তা ছিল "মিথ্যা প্রতারণার কৌশল" মাত্র। হেমচন্দ্র কানুনগোর জবানবন্দীতেই আমরা ইহা জানতে পারি।

তিনি লিখেছেন: "স্বল্প শিক্ষিত যুবকেরা ঝাঁপিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে খাস কলকাতাবাসী কম ছিল। তাদের পনের আনাই কলকাতার বাইরের ছেলে। নতুন ভাব গ্রহণের প্রবৃত্তি কলকাতার মত বহু বড় বড় শহরের যুবকদের চাইতে পল্লী যুবকদের বেশি বলে আমার মনে হয়।" মোট কথা, কি লোক-সংগ্রহ, কি অর্থ-সংগ্রহ, গুপ্তসমিতির প্রথম পর্বের উদ্যোগ আশানুযায়ী সফল হতে পারে নি। সেই অসাফল্যের চিত্রটাও হেমচন্দ্র কানুনগো এইভাবে এঁকেছেন: "আসল কেন্দ্র

কলকাতাতেই প্রায় দু' বছরে প্রস্তুত হয়েছিল। একটিমাত্র ঘোড়া, একখানি মাত্র বাইক, একডজন নেতা ও উপনেতা; আর জুটেছিল খুব বেশি হয়ত জন পাঁচেক সর্বস্বপণকারী চেলা এবং জনকয়েক মাত্র আধ-চেলা। গুপ্তসমিতির কাজ যে স্রেফ কিছুই হচ্ছিল না, তা বুঝতে একটুও বেগ পেতে হয় নি।"

এ স্বীকারোক্তি দুঃখের ও বেদনার।

হেমচন্দ্র কেন, অরবিন্দের নিজের উক্তির মধ্যেই আমরা এর সুস্পষ্ট সমর্থন পাই। প্রথম পর্বের সময় তিনি স্বয়ং বাংলাদেশে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিজে এসেছিলেন এবং, কথিত আছে, অবস্থা দেখে নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। সুরাট-দক্ষযজ্ঞের পরবর্তী সময়ে বোম্বাইতে প্রদত্ত তাঁর একটি বক্তৃতার মধ্যে এই নৈরাশ্যের কথা আছে। ঐ বক্তৃতার তারিখ ছিল ১৯শে জানুয়ারি, ১৯০৮। তিনি বলেছেন: "স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার তিন-চার বছর আগে আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম, গুপ্তসমিতিকে আবার জাগিয়ে তোলা যায় কিনা, সেটা দেখবার জন্য। রাজনৈতিক অবস্থা কেমন, লোকের মনোভাবই কি রকম এবং একটি সত্যিকারের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সম্ভাবনাই বা কতদূর—এই সব পর্যবেক্ষণ করতেই গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে যা দেখেছিলাম তা হলো চরম নৈরাশ্য ও ঔদাসীন্যের ভাব।"

এখানেই আমরা প্রমাণ পাচ্ছি যে স্বদেশী আন্দোলনের বেশ কিছুকাল পূর্বেই অরবিন্দ গুপ্তসমিতির প্রাথমিক কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন এবং অনেক আশা নিয়েই তা করেছিলেন। অর্থ-সংগ্রহ বা লোক-সংগ্রহ, দুয়ের একটাও যে আশানুযায়ী তখন হয় নি তা আমরা উপরি-উদ্ধৃত হেমচন্দ্রের উক্তির মধ্যেই পাচ্ছি। কিন্তু ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল কলহ—যা বাঙালি-চরিত্রের চিরন্তন স্বভাব। আমরা দল গড়ি উৎসাহের সঙ্গে, কিন্তু প্রচণ্ড কলহ করি দলের নেতৃত্ব নিয়ে। সেকালের বিপ্লবী-দাদাদের অনেকের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ লেখকের হয়েছিল এবং সেই সব আলোচনা থেকেই জেনেছি এই সত্য। বারীন্দ্রকুমার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "আমাদের প্রথম বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ, দেবব্রত বসু এবং আমার মধ্যে প্রায়ই কলহ হতো। যতীন্দ্রের উদ্ধত মিলিটারি মেজাজ আমাদের আদৌ সহ্য হতো না, তিনি আমাদের একেবারে কোণঠাসা করে রাখবার মতলব করেছিলেন।"*

তবে একথাও সত্য আর সকলের চাইতে যতীন্দ্রই ছিলেন কর্মিষ্ঠ পুরুষ এবং তিনিই ছিলেন অরবিন্দের একান্ত বিশ্বাসভাজন ও দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। সেই কারণেই দলের উপর তাঁর ছিল অপ্রতিহত প্রভাব। তাঁর মধ্যে যে কর্তৃত্বের স্পৃহার কথা বারীন্দ্র উল্লেখ করেছেন সেটা অসম্ভব নয়। সৈনিক বিভাগে ট্রেনিং-পাওয়া লোকের

* ডন অব ইণ্ডিয়া: বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

মধ্যে মিলিটারি মেজাজ অস্বাভাবিক কিছু নয়। অন্যদিকে বারীন্দ্রের স্বভাবই এই ছিল যে তিনি অন্যের প্রদর্শিত পথে চলতে পারতেন না এবং তাঁরো মধ্যে সব সময়ে একটা বিশেষ ধরণের 'এগো' সক্রিয় ছিল। অতএব উভয়ের মধ্যে বাধল সংঘর্ষ। বাংলাদেশে এসে অরবিন্দ স্বয়ং সেটা চাক্ষুষ করলেন। বারীন্দ্র তখন যতীন্দ্রের চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে সেজদাকে একটি রিপোর্ট দিলেন। হেমচন্দ্রের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ অরবিন্দ বারীন্দ্রের অভিযোগ সত্য বলে মেনে নিলেন, নিজে একবার সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না এবং যতীন্দ্রনাথকে সরাসরি গুপ্তসমিতি থেকে বহিস্কৃত করে দিলেন। অতঃপর সার্কুলার রোডের কেন্দ্র উঠে গেল, যতীন্দ্রনাথ অন্যত্র পৃথকভাবে দল গঠন করতে লাগলেন আর বারীন্দ্রের নেতৃত্বে গ্রে ষ্ট্রীটে সমিতির নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হলো। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে আরো একজন বিতাড়িত হয়েছিলেন ; তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অরবিন্দ-বারীন্দ্রের মাতুল। এবং সত্যেনের ক্ষেত্রেও ঐ একই গুজুহাত ছিল— চরিত্রদোষ। আমরা এখানে এর বেশি আর উল্লেখ করলাম না, কারণ ভিতরের ইতিহাস অতি কদর্য। গুপ্তসমিতির প্রথম পর্বের এইখানেই অবসান।

অরবিন্দের কোন কোন জীবনীকার এই প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "তিনি একতরফা বিচার করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শুধু বারীনের কথার উপর বিশ্বাস করিয়াই যতীনকে এবং সত্যেনকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।...অথচ এই যতীন্দ্র বরোদা থাকাকালীন অরবিন্দের কত বিশ্বাসভাজন ও প্রিয় পাত্র ছিল।" আর বারীনের কথায় যে সত্যেনকে অরবিন্দ বিতাড়িত করেছিলেন, সেই সত্যেনই আলিপুর জেলে প্রমাণ রেখে গিয়েছেন যে তাঁর যোগ্যতা ভাগিনেয় অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। সেদিন সহোদর নয়, এই মাতুলই নিজের প্রাণ দিয়ে অরবিন্দের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। অপ্রিয় হলেও ইহা সত্য কথা। অরবিন্দের অন্ধ ভ্রাতৃস্নেহ ও পক্ষপাতিত্বমূলক বিচারের ফলে শুধু গুপ্তসমিতি যে ভেঙে গিয়েছিল তা নয়, তাঁকে যাঁরা শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন এমন অনেকেই তাঁর নেতৃত্বে আস্থা হারিয়ে তাঁকে ত্যাগ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার পি. মিত্র, সরলা দেবী এবং আরো অনেক কর্মী।* বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ' গ্রন্থের লেখককে বলেছিলেন: "অরবিন্দ বারীনের উপর পক্ষপাতিত্ব করিয়া যতীনের উপর অবিচার করিয়াছিলেন।" ভূপেন্দ্রনাথ দলের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

যাই হোক, ছ' বছরের চেষ্টায় যেটুকু গড়ে উঠেছিল, তা ভেঙে গেল।

বোঝা গেল, বাংলাদেশ তখনও প্রস্তুত নয়।

* লেখক এইসব কথা শুনেছিলেন অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে।

বোঝা গেল, বাংলাদেশে গুপ্তসমিতি গড়া কঠিন।

ব্যর্থতার বেদনা বুকে নিয়ে অরবিন্দ বরোদায় ফিরে গেলেন। সঙ্গে চললেন কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্রকুমার। বোম্বাইতে প্রদত্ত অরবিন্দের বক্তৃতায় এই ব্যর্থতার সুরটা খুবই প্রকট। তিনি বলেছিলেন: "বাংলাদেশের লোকেরা হতাশ হয়ে বসে আছে, নিজেরা কিছুই করবে না, অন্য কোন জাতি এসে যদি তাদের হাত ধরে উদ্ধার করে তবেই যদি কিছু হয়।" কিন্তু এখানে প্রসঙ্গত একটি বিষয় উল্লেখ্য। যে কারণেই দল ভেঙে যাক না কেন, বাংলাদেশে গুপ্তসমিতি স্থাপনে তাঁর এই যে প্রাথমিক প্রয়াস, এর ভিতর দিয়ে আমরা কী দেখতে পেলাম?

দেখতে পেলাম অরবিন্দের দুঃসাহস।

ভারতবর্ষে তখন পর্যন্ত এমন দুঃসাহসের পরিচয় কোন নেতাই দিতে পারেন নি।

পারেন নি টিলক, লাজপৎ রায় অথবা বিপিনচন্দ্র।

এমন কি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও নন।

জাতিকে "রক্ত ও অগ্নিস্নানে" পরিশুদ্ধ করে তোলার দুঃসাহসটা সেদিন একা তাঁরই ছিল।

দুঃসাহস ছিল আর একজনের। তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের মেয়ে নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতা বিপ্লবে শুধু অগ্রণী ছিলেন না, তিনি ছিলেন অরবিন্দের সহকর্মিণী। বরোদা থেকে ফিরে এসে তিনি শুধু মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নি—পরন্তু নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন গুপ্তসমিতিকে। বাছা বাছা দুশো বই—যা ছিল তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ—সমিতিকে দিয়েছিলেন। শুধু বই দেওয়া নয়, সমিতির যুবকদের নানাভাবে পরামর্শও দিতেন। এ ছাড়া, কয়েকটি রাজনৈতিক কর্মী গড়ে তুলবার জন্য তাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন তিনি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—এইসব কর্মীদের বাংলাদেশের শহরে শহরে পাঠিয়ে সমগ্র দেশ বিপ্লবের ছোটবড় কেন্দ্রে ভরে দেবেন। একথা লেখক শুনেছিলেন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে। প্রথম পর্বের কাজটা কিন্তু নিঃশব্দেই সম্পন্ন হয়েছিল, পুলিশ এর বিন্দু-বিসর্গও তখন জানতে পারে নি। এটাও বড় কম কথা নয়। মন্ত্রগুপ্তিসাধনে অরবিন্দ সত্যিই অদ্বিতীয়।

অরবিন্দ তো বরোদায় চলে এলেন, কিন্তু বিপ্লব কর্মের অবস্থাটা তখন কিরকম দাঁড়াল বাংলা দেশে, আর বিপ্লবী কর্মীদেরই বা কী অবস্থা হলো—এটা জানবার জন্য পাঠকের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। "অরবিন্দ চলিয়া গেলে যতীন্দ্র মনের দুঃখে বিরাগী হইয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া শ্যামাকান্ত সোহং স্বামীর সঙ্গে জুটিয়া নিরালম্ব স্বামী হইলেন। যে মিথ্যা চরিত্রদোষের জন্য অরবিন্দ তাঁহাকে তাড়াইয়াছিলেন, যতীন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়া সেই চরিত্রদোষের অপবাদকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিলেন।" হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছেন যে, অরবিন্দ তাঁদের

পরিত্যাগ করে চলে গেলে অন্যান্য নেতারা গুপ্তসমিতির কাজ একেবারে ছেড়ে দিলেন না। কোন রকমে জীইয়ে রাখলেন। দেবব্রত বসু* অন্য নেতাদের সঙ্গে মিশে অলৌকিক উপায় গ্রহণ করার জন্য আর সকলকে উৎসাহিত করতে থাকেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তখনো ভগিনী নিবেদিতার নির্দেশে প্রচার-কার্যে নানাস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বিপিনচন্দ্রও সেই একই কাজ করছিলেন।

এই সময়ে আচম্বিতে ইতিহাসের পট-পরিবর্তন হয়।

বাংলার মন্থর রাজনীতিতে একটা প্রবল বন্যার স্রোত আসন্ন হয়ে এলো।

স্বদেশী আন্দোলনের বন্যার স্রোত। সেই স্রোত রচনা করবে নতুন আবর্ত।

সেই আবর্ত মথিত করে যুগপৎ উঠবে অমৃত ও হলাহল।

আমরা দেখতে পাব, একই কণ্ঠে সেই অমৃত ও হলাহল ধারণ করে, উত্তাল ইতিহাসের স্রোতোধারাকে তার নিয়তি-নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন অরবিন্দ। কিন্তু আগের কথাটা আগে বলা দরকার, নইলে ইতিহাসের গতিপথ আমরা ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারব না—আর পারব না অনুধাবন করতে অরবিন্দের জীবন রহস্য। এই ইতিহাসের কেন্দ্রে ছিলেন লর্ড কার্জন যাঁর স্বৈরাচারী শাসন ভারতে ইংরেজশাসনের ইতিহাসে রচনা করেছিল একটি অভিনব অধ্যায়।

কার্জনের আবির্ভাবকালকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "১৮৯৮ সালে ভারতের রাজনৈতিক গগন ঘন মেঘাচ্ছন্ন বোধ হয়েছিল। সরকারের দমননীতি ও তার ফলে দেশব্যাপী গণ-বিক্ষোভের মধ্যে এর প্রকাশ দেখা যায়। তার উপর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর করাল ছায়া সমগ্র দেশের উপর পড়েছিল। প্লেগের প্রতিষেধক কতকগুলি বিধিব্যবস্থা পুনা শহরে এমন কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয় যে, জনসাধারণের উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায়। এর পরেই দুইজন ইংরেজ কর্মচারী হত্যা, নাটু-ভ্রাতাদের নির্বাসন এবং বোম্বাই প্রদেশে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের উদ্ঘাটনে সমগ্র দেশে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই বিক্ষুব্ধ সময়েই ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড কার্জন। পার্লামেন্টের এই বিশিষ্ট এবং কৃতবিদ্য সদস্যের নিকট আমাদের প্রত্যাশা ছিল অনেক যদিও আমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি নি।"†

স্পষ্টতই এক মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে লর্ড ন্যাথানিয়েল কার্জন তাঁর কর্তব্যভার গ্রহণ করে এদেশে এলেন। ভারতের সর্বময় কর্তার পদে অধিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরেই লর্ড কার্জন লণ্ডনের এক সম্বর্ধনা সভায় বলেছিলেন: "আমি

* ইনি পরে রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন। তখন থেকে ইনি 'স্বামী প্রজ্ঞানন্দ' এই নামে পরিচিত হন।

† এ নেশন ইন মেকিং: সুরেন্দ্রনাথ।

ভারতবর্ষকে ভালবাসি, এর অধিবাসী, এর ইতিহাস, এর শাসননীতি এবং এর বিচিত্র সভ্যতা ও জীবনযাপন পদ্ধতির উপর আমার অনুরাগ আছে।"* ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে, কার্জনের এই অনুরাগই শেষে বিরাগে পরিণত হয়েছিল। ঐ একই সময়ে অপর একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: "ভারতের রাজ-প্রতিনিধির প্রধানত দুটি গুণ থাকা দরকার—সাহস এবং সহানুভূতি।" পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি, সাহস তাঁর প্রচুর ছিল, তবে সে সাহস জনমতকে উপেক্ষা করবার সাহস, শাসিতদের উপেক্ষা করে স্বীয় আদর্শকে বড় করে দেখবার সাহস। সহানুভূতি বস্তুটা তাঁর প্রকৃতি বা চরিত্রের মধ্যে আদৌ ছিল কিনা সন্দেহ, আর যদিও বা থেকে থাকে, তা অতি সামান্যই।

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে শুরু হলো বিংশ শতাব্দী।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে আসন্ন হয়ে উঠল এক বিরাট পরিবর্তন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিরাট তরঙ্গ উঠেছিল—সে তরঙ্গ গিয়ে আঘাত করেছিল অতলান্তিকের অপর পারে এবং টেমস ও টাইবর নদীর তীরে। বিবেকানন্দ, বিপিনচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পাশ্চাত্য অভিযান এই শেষ দশকেরই ঘটনা। এর পরেই আমরা দেখতে পাব নতুন যুগের নায়কদের—যাঁরা সৃষ্টি করবেন এই শতাব্দীর ইতিহাস। নতুন শতাব্দী নিয়ে এলো নতুন সম্ভাবনা—নতুন প্রত্যাশা। জাতীয়-জাগরণ—যা এতদিন স্তরে স্তরে ঐতিহাসিক কার্য-কারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সকলের অলক্ষ্যে পরিণতি লাভ করতে চলেছিল—এখন আর কল্পনা নয়, বাস্তব। শুধু বাস্তব নয়, জলদর্চিরেখার মতো ইতিহাসের পটে তা ক্রমেই ভাস্বর হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। ভারতের ইতিহাস-বিধাতা ভারতবর্ষকে যেন এইবার তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হাত ধরে নিয়ে চলেছেন। সে-ইতিহাসের প্রাণস্পন্দন বরোদায় বসে অরবিন্দ নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন।

১৯০০ থেকে ১৯০৬—এই কয় বছর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে উল্লিখিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে ১৯০৫ সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে বাংলার ইতিহাসে—সে কথা যথাস্থানে বলব। ভারতের কার্যভার গ্রহণ করার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ভারতবাসীর বিরাগভাজন হয়ে ওঠেন তাঁর উদ্ধত ও স্বৈরাচারমূলক কয়েকটি আচরণের জন্য। প্রথমেই তিনি কলকাতা পৌরসভার নির্বাচিত কমিশনারদের কাজ করবার স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করার উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করলেন একটি নতুন আইন—১৮৯৯-এর মিউনিসিপ্যালিটি আইন। শুধু ক্ষমতা সঙ্কুচিত করে দেওয়া নয়, নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে কমিয়ে পঁচিশ করা

* লাইফ অব লর্ড কার্জন: রোনাল্ডসে।

হয় এই নতুন আইনে আর মনোনীত সদস্যের সংখ্যা নির্ধারিত হয় পঁচিশ। তারপর ১৯০৩ সালের জানুয়ারিতে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হলো দিল্লীর দরবার। খুব জাঁক-জমক সহকারে এই দরবারের অনুষ্ঠান হয়েছিল। কার্জন খুব জাঁক-জমকপ্রিয় মানুষ ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে বিলাস-ব্যসনের চূড়ান্ত এবং জনসাধারণের অর্থের অপব্যয় দেখে রমেশচন্দ্র দিল্লী-দরবারকে একটি 'প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজী' বলে উল্লেখ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও এই দরবারী কাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। নিবেদিতাও এই উপলক্ষ্যে কলম ধরেছিলেন।

তারপর ১৯০৪ সালে কার্জন নিয়ে এলেন ইউনিভার্সিটি বিল। এই বিলের আসল অভিপ্রায় ছিল দেশের উচ্চ শিক্ষার ধারাকে রোধ করা। জাতীয়তাবাদী নেতারা এই বিলের পিছনে সরকারের কূটনীতির ইঙ্গিত পেলেন। তাঁরা বুঝলেন যে, শিক্ষিত শ্রেণীর বর্তমান মনোভাব ইংরেজ রাজপুরুষদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছে। তাই কার্জন এই বিলের মাধ্যমে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলোচ্ছেদ করতে উদ্যত হলেন। বাংলার জননায়কগণ একবাক্যে বিলের বিরোধিতা করলেন—তথাপি বিল পাশ হয়ে গেল। দেশশুদ্ধ লোকের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে জবরদস্ত লাট প্রবর্তন করলেন 'ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট'। কার্জন প্রতিবাদ শুনবার মানুষ ছিলেন না। তৃতীয় ঘটনাটি ছিল আরো উত্তেজক, আরো বিস্ফোরক। ১৯০৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভার অনুষ্ঠান হলো। চ্যান্সেলার হিসাবে লর্ড কার্জন তাঁর অভিভাষণ প্রদান করলেন। এই অভিভাষণেই তিনি ভারতীয়দের চরিত্রের নৈতিক শিথিলতার প্রতি কটাক্ষ করলেন: "প্রাচ্য দেশবাসিগণ অত্যুক্তিবাদী ও অতিরঞ্জনপ্রিয়।" কার্জনের আসল রাগ ছিল দেশীয় সংবাদপত্রগুলির উপর, কিন্তু তা পড়ল গিয়ে সমস্ত দেশের লোকের চরিত্রের উপর। এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন, দেশবাসীর পক্ষে ভগিনী নিবেদিতা।* এইভাবেই সেদিন দেশের মধ্যে একটি কার্জন-বিরোধী মনোভাব ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল।

১৯০৩, ৩রা ডিসেম্বর।

বাংলা ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১০।

লর্ড কার্জনের হাত থেকে নেমে এলো বঙ্গচ্ছেদের খড়্গাঘাত।

বাংলার শিয়রে যেন অকস্মাৎ বজ্র পড়ল।

এই তারিখে কলকাতা গেজেটে বাংলা দেশকে শাসন ব্যবস্থার সুবিধা হবে এই ওজুহাতে দ্বিধা খণ্ডিত করবার প্রস্তাব প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশ বলতে তখন বুঝাত একটি বিরাট দেশ—বিহার, উড়িষ্যা ও সমগ্র বাংলা দেশ।

---

* লেখকের 'নিবেদিতা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

চারদিকে বিক্ষোভ দেখা দিল। বিক্ষোভ থেকে প্রতিবাদ। বাংলার শিক্ষিত সমাজ প্রতিবাদ জানাল। কলকাতা ও সমগ্র বাংলা দেশের জেলায় জেলায় প্রতিবাদ সভার আয়োজন হলো। লর্ড কার্জন এদেশে এসেই বাঙালির উগ্র দেশপ্রেমের পরিচয় পেয়েছিলেন এবং কি ভাবে সেটা সঙ্কুচিত করে দেওয়া যায়, সেই বিষয়ে গভীর ভাবে তাঁর মস্তিষ্ক আলোড়িত হতে থাকে। বিলাতে ভারতসচিবের কাছে তিনি একটি গোপন পত্র লিখেছিলেন। সেই গোপনীয় পত্রেই তিনি বাংলা দেশকে ভেঙে দু'টুকরো করার একটি প্রস্তাব তুলেছিলেন এবং তাঁর প্রস্তাবটি যাতে পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয় সেজন্য বিস্তর যুক্তিজালও বিস্তার করেছিলেন তিনি তাঁর সেই পত্রে।

বাংলা ভাগ হবে।

কথাটা আর চাপা রইল না—লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল।

একদেশ দু'টুকরো হবে; এক ভাষায় কথা বলে যারা, সেই বাঙালি হিন্দু-মুসলমান আলাদা হয়ে যাবে, এমন অদ্ভুত কথা কেউ কখনো শোনে নি। কী করা যায়—কেমন করে দুষ্টবুদ্ধি লাটের এই প্রস্তাব রদ করা যায়? বিলাত থেকে এখনো প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়ে আসে নি। এখনো হয়ত উপায় আছে, ভাবলেন বাংলার নেতৃবৃন্দ। আলোচনা হলো—কি করা যায়। সবাই মিলে তখন পরামর্শ করে ঠিক করলেন—ভারত-সচিবের কাছে হাজার হাজার বাঙালির স্বাক্ষরিত একটি স্মারকপত্র পাঠিয়ে দেওয়া যাক। স্মারক পত্রটির মুসাবিদা করলেন সুরেন্দ্রনাথ—তিনিই তখন বাংলার 'মুকুটহীন রাজা'। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সব নেতারা তাতে স্বাক্ষর দিলেন। স্বাক্ষর দিলেন বাংলার অনেক রাজা, মহারাজা, জমিদার ও নবাবেরা। জেলায় জেলায় গিয়ে স্বাক্ষর সংগৃহীত হলো জনসাধারণের কাছ থেকে। এমনি করে প্রায় আশী হাজার লোকের স্বাক্ষরিত সেই স্মরণীয় স্মারকপত্রখানি বিলাতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ভারত-সচিব লর্ড ব্রডউইকের কাছে।

এইভাবে অতিক্রান্ত হলো ১৯০৪ সাল।

সকলেরই আশা ছিল এ আবেদন বোধহয় নিষ্ফল হবে না।

দিন যায়। বাংলার নেতৃবৃন্দ উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রতীক্ষা করছেন।

ফল কিছুই হলো না, বরং ব্যবচ্ছেদের মাত্রাটা আগের থেকে একটু বেড়ে গেল। ১৯০৪-এর ২০শে জুলাই বিলাত থেকে জবাব এলো—পার্লামেণ্ট লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছেন। বাংলায় আগুন জ্বলে উঠবে এইবার। আমরা দেখব, সেই আগুনের লেলিহান শিখায় কেমন করে রাঙিয়ে উঠল ইতিহাসের দিগন্ত। দেখব কেমন করে একই সঙ্গে বাংলার আকাশে

শুরু হলো ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎচমক আর মেঘগর্জন। আর দেখতে পাব সেই অনলকুণ্ডে কেমন করে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন অরবিন্দ ঘোষ, তাঁর স্বজাতিকে 'অগ্নি ও রক্তস্নানে' পরিশুদ্ধ করবার একটি সুমহৎ সংকল্প নিয়ে। দেখতে পাব যে, "বাঙালির বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় বিপ্লবী অরবিন্দের বিপ্লবের স্থান প্রথম।" কিন্তু তার আগে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকাটি পাঠকদের সামনে আরো একটু বিশদভাবে তুলে ধরতে হবে। যে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নাম বিশেষভাবে জড়িত হয়ে আছে, তার পূর্বাপর ইতিহাসটা আমাদের জানা দরকার, নতুবা সেই আন্দোলনে অরবিন্দের ভূমিকাটি আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারব না।

॥ তেইশ ॥

বাঙালি বড় বেয়াড়া জাত।

বাঙালি হিন্দু-মুসলমান চির-দুর্বিনীত, চির বিদ্রোহী।

এ তাদের অপবাদ নয়, গৌরব।

শুধু যে ইংরেজ আমলেই বাঙালি শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিল শাসকজাতির তা নয়, দিল্লীর পাঠান ও মুঘল সম্রাটদের শিরঃপীড়ার কারণ ঘটিয়েছিল এই বাঙালি। বাঙালির শক্তি, ঐক্য ও স্বাধীনতার আবেষ্টনকে দমন করবার জন্য স্বৈরাচারী কার্জন যেমন অগ্রসর হয়েছিলেন পাঠান ও মুঘল বাদশাহগণও বাংলা ও বাঙালি সম্পর্কে সেই একই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। বিশশতকের বঙ্গ ভঙ্গের বহুকাল আগে বঙ্গব্যবচ্ছেদের উল্লেখ আছে ইতিহাসে। সেই ইতিহাসটা এখানে একটু বলব। যাঁরা এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চান, তাঁরা যেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলার ইতিহাস' পাঠ করেন।

বক্তিয়ার খিলজির বাংলা আক্রমণের পর একটি শতাব্দী অতিক্রান্ত হলো। বাংলার মুসলমান রাজারা দিল্লীর পাঠান বাদশাদের বশ্যতা মানা দূরে থাক, তাদের অধীনতা-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার আগে দেখা যায় যে, শাসন কার্য সুপরিচালনার ওজুহাতে (এই একই ওজুহাত লর্ড কার্জনও দেখিয়েছিলেন) একই বাংলাদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। বাংলার শাসনকর্তা প্রায়ই দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন। কিন্তু ওই বিদ্রোহ দমন করা তাঁদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না, কারণ গোটা বাংলাটাই ছিল তাঁদের শাসনাধীন। কাজেই দিল্লীর বাদশাহগণ ভাবলেন যাতে বিদ্রোহ না হতে পারে অথবা বিদ্রোহী বাঙালি শাসনকর্তাকে অল্প আয়াসেই দমন করা যেতে পারে, সেজন্য বাংলাদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করলে কেমন হয়।

প্রথম বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গে মালদহ জেলা, রাজধানী লক্ষ্মণাবতী (গৌড়)। এর শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন সম্রাট নাসিরুদ্দিন। দ্বিতীয় বিভাগ : পূর্ববাংলা, রাজধানী সোনার গাঁ। এর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন বৈরাম খাঁ। ঢাকা তখনো বাংলার মানচিত্রে দেখা দেয় নি। আমরা যে সময়ের কথা বলছি সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই দ্বিতীয় বিভাগটি হয়। বর্তমান ঢাকা শহর থেকে তেরো মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পূর্ববাংলার রাজধানী সোনার গাঁ অবস্থিত ছিল। তৃতীয়

বিভাগ : ত্রিহুতে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়, আমেদা খানকে এখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিল। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার দুই শাসনকর্তা—নাসিরুদ্দিন ও বৈরাম খাঁ—চৌদ্দ বছর দক্ষতার সঙ্গে শাসন করেন। এ সবই পুরাতন ইতিহাস।

প্রবল পরাক্রান্ত মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার বার ভুঁইয়াদের বিদ্রোহ ও সংগ্রাম ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই অবগত আছে। গৌড-সৈন্যের শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে রাজ-তরঙ্গিণীতে—দেশ-বিদেশের কাব্যে ও ইতিহাসে অঙ্কিত আছে তাদের মৃত্যুঞ্জয় মূর্তি। চাঁদ-প্রতাপের দাপটে "হটিতে হযেছে দিল্লীনাথে"—এ কথাও ইতিহাসে লেখা আছে। মুঘল সম্রাটগণও বাঙালিকে নিয়ে বিব্রত হয়েছেন এবং বহু বিনিদ্র রজনী তাঁদের যাপন করতে হয়েছিল যখন তিস্তা, কর্ণফুলী, মেঘনা ও পদ্মার জলে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত বা স্বতন্ত্র বিদ্রোহের বিদ্যুৎ চমক প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠত। তবে এ কথা সত্য যে, তখন অখণ্ড বাঙালি জাতির একটা সুস্পষ্ট আদর্শ ছিল না। সেটা দেখা গিয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। কারণ তখন বাংলাদেশ অখণ্ড নয, খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন। হিন্দু ও মুসলমানেব মধ্যে বাংলাদেশে তখন না ছিল রাজনৈতিক ঐক্য, না ছিল অখণ্ড জাতীযতাবোধ। বাঙালি জাতি অখণ্ড বাংলার জাতীয়তার আদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হলো ইংরেজ আমলে এবং স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল পরিবেশের মধ্যেই যেন আমরা প্রত্যক্ষ করলাম সেই অখণ্ড জাতীয়তার উজ্জ্বল মূর্তি। এই মূর্তির নির্মাণে পরোক্ষভাবে কার্জনী-বিভাগ যে সহায়তা করেছিল, সেটা স্বীকার করতেই হবে।

আগের একটি অধ্যায়ে অরবিন্দের কংগ্রেসী রাজনীতির সমালোচনামূলক প্রবন্ধাবলিতে আমরা দেখেছি, তিনি তাঁর ঐ বিখ্যাত নিবন্ধের মাধ্যমে এই সত্যটাই সেদিন ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন যে, কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল ইংরেজ শাসনের শত্রু হিসাবে নয়, বরং মিত্র হিসাবেই। সিপাহী বিদ্রোহের পর যখন প্রায় ত্রিশ বছব অতিক্রান্ত হতে চলল, তখন শাসকবর্গের মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা দানা বেঁধে উঠতে থাকে—হয়ত বা সাতান্ন'র বিদ্রোহের মতো আর একটা বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে। সংগ্রাম নয়, আবেদন-নিবেদন—এই ছিল এই যুগের কংগ্রেসের চরিত্র। সেই চরিত্রটাই অরবিন্দের লেখনীমুখে সর্বপ্রথম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। সম্ভবত তখন থেকেই শাসক-শ্রেণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বরোদার এই শান্ত শিষ্ট ও মৌন প্রকৃতির মানুষটির উপর নিবদ্ধ হতে থাকে। অমন যে রাজদ্রোহী টিলক, তিনিও বোধ করি সরকারের শিরঃপীড়ার ততখানি কারণ হয়ে ওঠেন নি, যতখানি হয়েছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ডাফরিণ-হিউমের মনোগত অভিসন্ধিটা তাঁর মতো আর

কেউ অনুধাবন করতে পারেন নি। অরবিন্দের কংগ্রেসী রাজনীতির সমালোচনার মধ্যেই যে স্বদেশী আন্দোলনের বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল, এ সিদ্ধান্ত বোধ করি ইতিহাস সমর্থন করবে।

দেখা গেল, প্রায় বিশ বছর কাল কংগ্রেস নেতারা আবেদন-নিবেদনের পথে আন্দোলনের গতি পরিচালিত করার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু দেশের অবস্থা আবেদন-নিবেদন রাজনীতির অনুকূলে আর রইল না। ইতিহাসের বিধানেই রইল না। ইংরেজ শাসকদের খড়্গ প্রথম থেকেই উদ্যত ছিল বাংলার উপর। তাছাড়া, এই শতাব্দীর প্রারম্ভেই কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেন এবং শিক্ষা সংকোচেরও চেষ্টা করলেন। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির স্বাধীনতা খর্ব করা হলো। ১৮৯১ সাল থেকেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বাংলা বিভাগের ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছিল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের আমলে বঙ্গবিভাগের এই ষড়যন্ত্র কার্যকর হয়। তিনি গোটা ভারতবর্ষের মানচিত্রটাই নতুন করে ঠিক করতে মনস্থ করেছিলেন, এ কথা জানিয়েছেন তাঁরই জীবনীকার রোনাল্ডসে। অনেকের মতে কার্জন বিপরীতে হিত করলেন। বাঙালির নব-উন্মেষিত জাতীয়তাকে ধ্বংস করতে গিয়ে তিনি একে আরো উস্কে দিলেন। সেই উস্কানীতে জাতীয়তার দীপ যেন আরো বেশি করে জ্বলে উঠল। চরমপন্থী রাজনীতি এইবার আত্মপ্রকাশ করল। বিলাতি আদর্শে রাজনীতি চর্চার দিন শেষ হয়ে এলো। কার্জনী প্রস্তাবের পথ দিয়েই এক নতুন ভাবের প্রবাহ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে এগিয়ে চলবে এইবার।

প্রাক্-স্বদেশী আন্দোলনের যুগের কয়কটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য।

এই শতকের গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে আমরা পেলাম 'স্বদেশী ভাণ্ডার'। এর প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করলেন সরলাদেবী চৌধুরাণী ও কেদারনাথ দাশগুপ্ত। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কয়েকটি উৎসাহী যুবকের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'ডন সোসাইটি'। স্বদেশী মন্ত্র প্রচারে ও স্বাদেশিকতার উদ্বোধনে এই সমিতির দান ছিল অসামান্য। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সোসাইটির আগে পাই 'ডন' পত্রিকা। এই মাসিক পত্রিকাটির মাধ্যমে সতীশচন্দ্র স্বদেশী সংস্কৃতির প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি জাগিয়ে তুলেছিলেন। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' থেকে প্রকাশিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকাটিও স্বদেশীমন্ত্র প্রচারে অগ্রণী ছিল। 'ভাণ্ডার' পত্রিকার লেখার গুণেই দেশের যুবকরা দেশজ দ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহী হয়ে উঠতে থাকে। সেই একই সময়ে পি. মিত্রের 'অনুশীলন সমিতি' একদল তরুণকে শক্তিচর্চায় উদ্বুদ্ধ করে তুলল। সরলাদেবী তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন; তিনি 'বীরাষ্টমী' মেলার আয়োজন করে শক্তিচর্চার প্রসার করেন। 'ভারতী' পত্রিকায় বেজে উঠল স্বদেশী মন্ত্রের আগমনী 'বিদেশী ঘুষি বনাম দেশী কিল' শীর্ষক প্রবন্ধে।

এই আসরেই আমরা প্রথম পেলাম বিপিনচন্দ্র পালকে।

সেদিনের উদ্বেলিত ভারতের ত্রিমূর্তি ছিলেন লাল-বাল-পাল।

অর্থাৎ পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায়,

মহারাষ্ট্রকেশরী বালগঙ্গাধর টিলক, আর

বাগ্মীশ্রেষ্ঠ ও নবজাতীয়তাবাদের উদ্গাতা বিপিনচন্দ্র পাল।

'ভাণ্ডার', 'ভারতী' ও 'ডন' প্রভৃতি পত্রিকা জাতীয়তার যে আগমনী গেয়ে এদেশে তখন এক নতুন ভাববন্যার সৃষ্টি করেছিল, সেই সুরে সুর মিলিয়ে আসরে নামলেন সদ্য বিলাত প্রত্যাগত বিপিনচন্দ্র তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা নিয়ে। ইংল্যাণ্ডে থাকবার সময়েই ভারতের রাষ্ট্রিক দাবী নিয়ে তিনি আন্দোলন করেছিলেন। লণ্ডনে থাকতেই তিনি সেখানকার স্বাধীনচেতা সাংবাদিক মিস্টার উইলিয়াম টি. স্টেডের সংস্পর্শে এসেছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর সদ্যলব্ধ র‍্যাডিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রকাশ করেন 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা। ভারতের রাষ্ট্রিক চিন্তা এখান থেকেই মোড় ফিরতে থাকে।* ভারতীয় রাজনীতিতে এই ধারা শীঘ্রই জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

এইভাবেই সেদিন—এই শতকের প্রারম্ভে—জাতির জীবনে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত হয়েছিল স্বাদেশিকতার স্রোত। ঠিক সেই সময়ে লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে, জনমতের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও দ্বিখণ্ডিত করবার সংকল্প করলেন। কার্জন-শাসিত আমলাতন্ত্রের এই অন্যায় জিদের বিরুদ্ধে যে গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি হলো, তার মধ্যেই আমরা প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম জাতির মুক্তিকামনা। এই আন্দোলন চলেছিল ১৯০৩ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত। ১৯০৩-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবরের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে, সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি, দু'হাজারটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভাগুলিতে মুসলমানেরাও যোগ দিয়েছিল। বাংলার এই গণ-আন্দোলনের পাশাপাশি চলেছিল মহারাষ্ট্রে গণ-আন্দোলন যার নেতা ছিলেন বালগঙ্গাধর টিলক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই দুটি গণ-আন্দোলনই য়ুরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের গণ-আন্দোলন থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছিল। আয়ার্ল্যাণ্ডের আন্দোলন, নবীন তুরস্ক আন্দোলন, পারস্যে মজলিশ প্রতিষ্ঠা, জাপানের জাতীয় জাগরণ (এদেশে যার বাণীবাহক হয়ে এসেছিলেন ওকাকুরা), চীনের বক্সার বিদ্রোহ—এইগুলি বাংলার তরুণদের মনে নিঃসন্দেহে নতুন সাহস সঞ্চার করেছিল।

দেশের রাজনৈতিক চিন্তায় দুটি ধারা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল।

একটি ধনিক-প্রভাবিত রক্ষণশীল সংস্কারবাদী ধারা।

---

* মেময়রস অব মাই লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস্ঃ বিপিনচন্দ্র।

অপরটি নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রভাবিত প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ধারা।

প্রথমটি লিবারেল, দ্বিতীয়টি গণতান্ত্রিক ধারা।

প্রথমটির প্রবক্তা ছিলেন কংগ্রেসের প্রাচীন নেতৃবৃন্দ—এঁদের দলের এখন নাম হলো 'মডারেট' বা নরমপন্থী আর দ্বিতীয়টির প্রবক্তা ছিলেন লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি ; এই নবীন দলের নাম হলো 'একস্ট্রিমিস্ট' বা চরমপন্থী। দুটি ধারার লক্ষ্যে, কর্মসূচীতে, বৈদেশিক নীতিতে সর্বক্ষেত্রেই দেখা গেল বিরাট পার্থক্য। প্রাচীন নেতারা বললেন—কংগ্রেসের লক্ষ্য হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন অর্জন। নবীনেরা বললেন—'স্বরাজ' ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার। অরবিন্দ আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন—ইংরেজের নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব দিয়ে।

১৯০৩-এর ডিসেম্বরে এই প্রস্তাবের প্রথম ঘোষণা।

১৯১১ সালের ডিসেম্বরে সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং দিল্লীতে এসে কার্জনী প্রস্তাব রদ করে দিয়ে যান।

বঙ্গভঙ্গ রহিত হলো সত্য, কিন্তু ভারতের রাজধানী আর কলকাতায় রইল না—স্থানান্তরিত হয়ে গেল ইন্দ্রপ্রস্থে। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে যে দিল্লী হারিয়েছিল তার গৌরব, এতকাল বাদে সেই হৃত-গৌরব ফিরে পেল দিল্লী, সঙ্গে সঙ্গে তার রূপেরও পরিবর্তন সাধিত হলো অনেক। একাদিক্রমে আট বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিজ্ঞাটা—"আমি এই কার্জনী বিধান রদ করবই"—বজায় থাকল বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাঙালিকে মেনে নিতে হলো একটা অপূরণীয় ক্ষতি। কলকাতা শুধু সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল না—ছিল সমগ্র ভারতের ইনটেলেকচুয়াল রাজধানী। এইটাই ছিল বাঙালির একমাত্র গর্ব। দুঃখের বিষয়, বাংলার কোন নেতা এর প্রতিবাদ করেন নি সেদিন, এমন কি অরবিন্দও নন। প্রতিবাদ করেছিলেন একজন। তিনি পুরুষ-সিংহ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।* কিন্তু সে কথা থাক, আমাদের প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

আট বছর ধরে বাঙালি যে আন্দোলন করেছিল, সমগ্র দেশকে ইহা রীতিমত সংক্রামক করে তুলেছিল এবং এর থেকেই আমরা এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পারি। এই আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একজন লেখক লিখেছেন : "এই আন্দোলনের স্বরূপ কোন এক বিশেষ বৎসরে আবদ্ধ নহে। এই আন্দোলনের গতিমুখে আমরা তিনটি স্তর বা অবস্থা দেখিতে

---

* লেখকের 'শিক্ষাগুরু আশুতোষ' দ্রষ্টব্য।

পাই। প্রথম, ধূমায়িত অবস্থা—১৯০৩, ডিসেম্বর হইতে ১৯০৫ জুলাই পর্যন্ত। দ্বিতীয়, প্রজ্জ্বলিত অবস্থা—১৯০৫, আগস্ট হইতে, ১৯০৮, এপ্রিল পর্যন্ত। তৃতীয়, নির্বাপিত অবস্থা—১৯০৮, মে হইতে ১৯১১, ডিসেম্বর পর্যন্ত।"* এইবার আমরা স্বদেশী আন্দোলনের সামগ্রিক কাহিনী অনুসরণ করব এই তিনটি স্তরের ইতিহাসকে অবলম্বন করে এবং সেইসঙ্গে অরবিন্দের জীবন-নাট্যের তৃতীয় অঙ্কে আমরা প্রবেশ করব। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অরবিন্দ শুধু দূরদর্শী নেতা ছিলেন না, তিনি দীর্ঘদর্শীও ছিলেন। বরোদায় এসেই প্রথম যখন তিনি কংগ্রেসী নীতির সমালোচনার জন্য কলম ধরলেন, তখনি তিনি বুঝেছিলেন আবেদন-নিবেদনের বাঁধা সুরটা না পাল্টালে দেশের রাষ্ট্রিক চেতনা সত্য হয়ে উঠবে না। তিনি আরো বুঝেছিলেন, নতুন শতাব্দীর প্রারম্ভে এটা অনিবার্য হয়ে উঠবেই একটা নতুন গণ-আন্দোলনের ভিতর দিয়ে। তিনি যখন বাংলাদেশে গুপ্তসমিতি প্রবর্তন করেছিলেন তখনো পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নি। অরবিন্দের রাজনৈতিক প্রতিভা দেখলে সত্যি বিস্মিত হতে হয়। যে গুপ্ত সমিতির সূচনা তিনি করেছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনের পাদপীঠরূপে তার যে একটা ঐতিহাসিক মূল্য ছিল, সেটা অনস্বীকার্য।

বলেছি, এক বাংলা ভেঙে দু'টুকরো করতে গিয়ে প্রকারান্তরে কার্জন বিপরীতে হিত সাধন করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবকে অরবিন্দ কী চক্ষে দেখেছিলেন সেটা আমাদের জানা দরকার। কার্জনী বিধানের মধ্যে তিনি ইতিহাস-বিধাতার আশীর্বাদ দেখতে পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে একজন বিশিষ্ট ইংরেজ লেখকের অভিমত এখানে তুলে দিচ্ছি, ইনি সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর একজন নিপুণ ব্যাখ্যাকার হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তিনি লিখছেন: "ভারতের ভাগ্যে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবটিকে অরবিন্দ ঘোষ সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বলেই গণ্য করেছিলেন। কারণ, তিনি মনে করেন এর দ্বারা বাঙালির উপকার হয়েছে। বহু বছরের নৈষ্কর্ম ও অবসাদ থেকে জাতিকে জাগিয়ে তুলতে অথবা জাতীয়তাবোধকে এমন গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করতে আর কোন উপায়ই সক্ষম হতো না।"† কথিত আছে, তাঁর এই সুস্পষ্ট অভিমতটা তিনি ঐ বিদেশী লেখকের নিকট স্বয়ং ব্যক্ত করেছিলেন আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে কোন এক সময়ে।

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হওয়ার পরের বছরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল বোম্বাইতে। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ঐ অধিবেশনের সভাপতিরূপে স্যর হেনরি কটন কার্জনী প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে বাঙালির ক্ষমতার তিনি প্রশংসাও করেছিলেন। কার্জনী-বিধানকে বাঙালির

---

* শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশীযুগ: গিরিজাশঙ্কর।

† দি নিউ স্পিরিট ইন ইণ্ডিয়া: নেভিনসন।

নব-জাগ্রত রাষ্ট্রিক চেতনার উন্মেষে সহায়ক বলে আরেকজন অনুভব করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ। কবি তখনো পর্যন্ত সাক্ষাৎভাবে অরবিন্দের সঙ্গে পরিচিত হন নি, দূর থেকে তাঁর কথা শুনেছেন মাত্র। আমরা দেখতে পাব যে, "রাষ্ট্রক্ষেত্রেও তাঁহার সৃজনীশক্তি প্রচণ্ড এবং প্রচুর। কাব্য-নিকুঞ্জে বসিয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে তিনি এক-সময় শুধু বংশীবাদনে কালক্ষেপ করেন নাই। পরন্তু জাতীয় জীবনে নূতন জোয়ার তিনি আনিয়াছেন।" আমরা শুনতে পাব স্বদেশী আন্দোলনের সময় কবি-কণ্ঠের ভীমগর্জন কিভাবে ভাব ও আদর্শের সৃষ্টি করে জাতীয় জাগরণকে একটি নতুন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছিল। বিপ্লবী অরবিন্দের ভাব ও আদর্শের সঙ্গে কবির মানসিক যোগ কী গভীর ছিল তারই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' শীর্ষক কবিতাটি।

স্বাদেশীকতায় তাঁর স্বজাতিকে কতভাবেই না রবীন্দ্রনাথ উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এই সময়ে এবং স্বদেশী আন্দোলনে তাঁরো যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল সেটিও আমাদের জেনে রাখা দরকার। বিপ্লবী অরবিন্দ একা বিপ্লব নিয়ে আসেন নি—এ কথাটা স্বীকার করলে তাঁর প্রতি আমাদের কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাবে না, বরং না করলে দোষ হবে। কোন একটি মহৎ কাজ—তা সে রাষ্ট্রক্ষেত্রেই হোক, অথবা সমাজ-সংস্কারের বা ধর্ম-সংস্কারের ক্ষেত্রেই হোক—পৃথিবীতে কখনো একটিমাত্র মানুষের দ্বারা সম্পাদিত হয় না, অন্তত ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয় না। এই শতাব্দীর শুরুতেই কবি নিজের হাতে তুলে নিলেন সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্রের গাণ্ডীব—'বঙ্গদর্শন'। তাঁর সম্পাদনায় নব-পর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় স্বদেশিকতার সুর বেশ উচ্চগ্রামেই শোনা গিয়েছিল। হিন্দুসমাজ ও হিন্দু সভ্যতা—এক কথায় প্রাচ্যপ্রীতি—কবির লেখনীতে নিল নতুন রূপ আর পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকারীরা হলো প্রচণ্ডভাবে ধিক্কৃত। এইসময়েই আমরা দেখতে পাই সন্ন্যাসী উপাধ্যায়কে নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে স্থাপন করেছেন একটি অভিনব বিদ্যালয়, যার আদর্শ ছিল ব্রহ্মচর্য। এইসময়েই তাকে আমরা দেখতে পাই বঙ্গদর্শনে চরমপন্থী রাজনীতি প্রচার করতে: 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে"—চরমপন্থী রাজনীতির এমন অভিব্যক্তি আর কারো কাছে আমরা পাই নি।

কংগ্রেসী রাজনীতির সমালোচক অরবিন্দ।

কিন্তু বিলাতি আদর্শে রাজনীতি চর্চার বিরোধী রবীন্দ্রনাথ।

স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে আজো সেই দৃশ্যটি। স্থান: বিডন স্ট্রীটে মিনার্ভা থিয়েটার; সময় ১৯০৪, ২২শে জুলাই। কোন নাটকের অভিনয় সেদিনের সন্ধ্যায় হয় নি এই রঙ্গমঞ্চে। শহরের বহু জ্ঞানী-গুণীজনের সমাবেশ হয়েছে। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ পাঠ করলেন তাঁর সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ'। সেই স্মরণীয় সভায়

সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। এর ঠিক দু' বছর আগে, বিগত শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর টিলকের গ্রেপ্তারে বিক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ কলকাতা টাউন হলের এক বিরাট সভায় 'কণ্ঠরোধ' নামে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন, সেটিও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। অরবিন্দ যেমন আবেদন-নিবেদনের বিরোধী ছিলেন, রবীন্দ্র-মানসও সেই একই সময়ে ঠিক সেই একই সুরে বাঁধা ছিল। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে কবির সেই ধিক্কার বাণী আজো আমাদের রক্তে শিহরণ জাগায়। কবি সেদিন স্পষ্টভাষায় লিখেছিলেন: "রাজদ্বারে নিবেদনের থালা লইয়া বৎসরের পর বৎসর কেবলমাত্র কাঁদুনির সুরে 'কিছু দাও কিছু দাও' করিয়া প্রার্থনা করিলে কিছু পাইব না। গুরুতর দুঃখকে শিরে বহন করিয়া, কারাদণ্ডে অবিচল থাকিয়া, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবার পূর্বে বাহুবলে উহা আমাদের অর্জন করিতে হইবে।" তাঁর 'নৈবেদ্য' কবিতাগুচ্ছে ঈশ্বর ও দেশ সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনাই যেন নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে।

এইভাবেই সেদিন স্বদেশী আন্দোলনের উষাকালে একটির পর একটি ধারা এসে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। এইসব ধারার বাহকদের মধ্যে আমরা যাঁদের পাই এবং যাঁদের চিন্তা-ভাবনার মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতীয়তাবোধ শতাব্দীর পটে অরুণাভায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্দ্র, নিবেদিতা আর অরবিন্দ। এইবার আমরা দেখব, কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-রূপ উদ্যত খড়্গের সম্মুখে কেমন করে উদ্যত ফণা বিষধরের মতো এই ধারাগুলি একত্রে গর্জন করে উঠল।

॥ চব্বিশ ॥

১৯০৪, ১৬ই ডিসেম্বর।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের দৈনিক পত্র 'সন্ধ্যা' প্রকাশিত হলো।

তখনো স্বদেশী আন্দোলন দানা বাঁধে নি, প্রতিবাদের স্তরেই রয়েছে। সেই অবস্থায় 'সন্ধ্যা'র আবির্ভাব সকলকে বিস্মিত করল, করল উদ্বুদ্ধ। নতুন ভাষা, নতুন ঢং। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম ভেরী নিনাদ সন্ধ্যার আসরেই হয়েছিল। পত্রিকার সূচনায় ব্রহ্মবান্ধব লিখলেন: "আমরা হিন্দু। আমরা হিন্দু থাকিব। বেশভূষায় আসনে-বসনে সর্বপ্রকারে হিন্দু থাকিব।...য়ুরোপ হইতে আমরা স্বাধীনতা, মৈত্রী, সাম্য গ্রহণ করিব। কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্মকে নষ্ট হইতে দিব না। যাহা শুন, যাহা শিখ, যাহা কর, হিন্দু থাকিও, বাঙালি থাকিও।" আসরে নেমে ব্রহ্মবান্ধব একদিকে প্রকাশ করতে লাগলেন হিন্দুর জ্ঞানধর্ম ও সভ্যতার গুণগরিমা, অপর দিকে তিনি স্পষ্ট করে আমাদের দেখালেন ইংরেজ ভারতবাসীকে নির্জীব বিবেচনায় কেমন করে যাদুমন্ত্রে ভুলিয়ে রেখে ক্রমশঃ পদদলিত করছে।

এইভাবেই সেদিন "গোঁড়া হিন্দুয়ানী ও তার সঙ্গে কড়া পাকের উগ্র রাজনীতি 'সন্ধ্যা' প্রথম স্তরে বাঙালিকে পরিবেশন করিল।" সেই সুরে সুর মিলিয়েছিলেন বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং নিবেদিতা। এর অল্পকাল পরেই, বঙ্গভঙ্গ আইনে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'সন্ধ্যা'র রূপ গেল পাল্টে, রঙ্ গেল পাল্টে—ভাষা সম্পূর্ণ নতুন। এতকাল যাঁর মুখে ছিল বৈদান্তিক পরিভাষা, এবার তিনি তাঁর কাগজে এমন একটা সর্বসাধারণের বোধগম্য ও মুখরোচক ভাষা প্রবর্তন করলেন যা বাঙালির কানের ভিতর দিয়ে একেবারে তার মর্মে গিয়ে প্রবেশ করল। বাঙালির সমকালীন আন্দোলনের ইতিহাসে 'সন্ধ্যা' তাই আজো অমর হয়ে আছে। বাঙালির মনে তখন সন্ধ্যার জপমালা, তার মুখে সন্ধ্যার ভাষা, তার হৃদয়ে সন্ধ্যার প্রেরণা। এমনভাবে বাঙালিকে তিনি তাতিয়ে মাতিয়ে দিলেন কার্জনী-বিধানের বিরুদ্ধে যে, "কখন সন্ধ্যা আসিবে, আজ সন্ধ্যায় কি লিখিয়াছে—এই জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া থাকিত।"

স্বদেশী আন্দোলনের পাদপীঠ রচনায় উপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' পত্রিকার ভূমিকাটি বুঝতে হলে 'সন্ধ্যা'র ভাবধারাকে বুঝতে হয়—বুঝতে হয় এর মাধ্যমে

তিনি জাতীয়তার এবং স্বাজাত্যবোধের কী ফিলজফি আমাদের পরিবেশন করেছিলেন তাঁর অনমুকরণীয় ভাব ও ভাষায়। উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকা বর্তমানে দুর্লভ বললেই হয়; এর সম্পাদকীয়গুলির কোন স্বতন্ত্র সংকলন আজ পর্যন্ত হয় নি। এখানে তাই নানাসূত্রে সংগৃহীত 'সন্ধ্যা' পত্রিকার কোন কোন সম্পাদকীয় রচনার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি দিলাম এইজন্য যে, এইগুলির মাধ্যমে আমরা যুগান্তকারী এই পত্রিকাটির ভাবাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হতে পারব। অরবিন্দের মতো ব্রহ্মবান্ধবও স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। সন্ধ্যার বুকে তাই আমরা প্রত্যক্ষ করি সেই আন্দোলনের বীচিবিভঙ্গ। পাই স্বদেশপ্রেমের একটি সত্যিকার দর্শন।

"শতাব্দীর ইতিহাসে দেখিতে পাই আমরা পঙ্গু। এই পঙ্গুত্ব ঘুচিবে কি প্রকারে? 'ঘুচিবে ফিরিঙ্গীর শিখান ঐ রাজনীতিতে নহে, ঐ স্বদেশহীন স্বাদেশিকতাতেও নহে, ঐ আত্মাভিমানশূন্য অসাড় 'পেট্রিয়টিজিমেও' নহে, আমাদের সর্বদুঃখ ঘুচিবে আমাদের আমিত্বকে লাভ করিলে। এই আমিত্বের সন্ধান পাওয়া যাইবে সনাতন সভ্যতার পরিচর্যায়। ভারতের মুনি-ঋষির চরণতলে বসিয়া যদি সেই সনাতন সভ্যতায় দীক্ষা লইতে পার, যদি তোমার চিরন্তন আচার অনুষ্ঠানে ব্রতী হইতে পার, যদি তোমার পিতৃ-পিতামহের সাধন-সম্পুষ্ট সমাজ-সংহতির সহিত একাত্ম হইতে পার, যদি তেত্রিশকোটি দেব-দেবীর চরণে নিজেদের উৎসর্গ করিতে পার, তবে আবার তোমার হস্তে বজ্র ঝলকিয়া উঠিবে, দলমাদল অগ্নি উদ্গীরণ করিবে, অনাদৃত বাঁশের লাঠি বিষ্ণুচক্রের তেজে বিঘূর্ণিত হইয়া শত্রু মথন করিবে। সত্য-সত্য-সত্য—তিন সত্য করিয়া বলিতেছি, এ কথা বিশ্বাস করিও।

"শিরে কৈলা সর্পাঘাত, তাগা বাঁধবি কোথা? জাতির সমগ্র বুদ্ধি ও চেতনাটাই দাসত্ব-বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে। এই মন থাকিতে কি আর আমাদের উদ্ধার আছে? এখন আমরা ফিরিঙ্গীর সব কিছুকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি, আর দেশের সব কিছুকেই মন্দ দেখি ও ঘৃণা করি। তাই আপাদমস্তক বিলাতি পরিশোভিত হইয়া আমরা স্বদেশী করিতে যাই। এইজন্য আমাদের স্বদেশী ও স্বরাজ কিছুই সার্থক হয় না। যেদিন আমাদের মনের ভূত নামিয়া যাইবে, সেইদিনই আমাদের সর্বসঙ্কল্পসিদ্ধির দিন। যেদিন আবার আমাদের দোল ও তুলসীমঞ্চের তলায় গড়াগড়ি দিবার বাসনা জাগিবে, সেদিন সমাজের সহস্র বন্ধন বেষ্টনে আপনাকে জড়াইতে পারিব, যেদিন অতীত অবদান পরম্পরায় গৌরব বোধ করিব, সেইদিন আবার আমাদের সুদিন ফিরিয়া আসিবে।

"ফিরিঙ্গী আমাদের দেশের বাস্তব সত্তার প্রতি আমাদের মনকে বিমুখ

করিয়া দিয়াছে। এই বিমুখী মনকে দেশের অভিমুখী করিতে না পারিলে আমাদের আর গত্যন্তর নাই। আর দেশকে ভালবাসিতে হইলে নিধুবাবুর টপ্পায় যেমন আছে 'তোমা বই আর জানিনে', তেমনি করিয়া ভালবাসিতে হইবে। বাছ-বিচার নহে, বিরুদ্ধ বুদ্ধির বিশ্লেষণ নহে—সে ভালবাসা একেবারে 'তোমা বই আর জানিনে'। এতখানি ভালবাসা দেশের প্রতি যেদিন জাগিবে, সেদিন আর ফিরিঙ্গীর দুয়ারে হাসেন হোসেন করিয়া কাঁদিয়া ককাইয়া, হে ফিরিঙ্গী আমাদের উদ্ধার কর, বলিয়া বেড়াইতে হইবে না। সেদিন কালু ডোমের হাতের লাঠি আবার আস্ফালন করিবে, লক্ষ্মী ডোমনীকে আবার রণচণ্ডী মূর্তিতে দেখা যাইবে।

"পল্লীগ্রামেই তো কাজ। যাহারা আমাদের যুদ্ধের সৈন্য-সামন্ত তাহারাই তো পল্লীতে জ্যান্তে মরা হইয়া আছে। এই আধা ফিরিঙ্গী পেট্রিয়টের দলের দ্বারা দেশের কখন কোন সত্যকার কল্যাণ হইবে না। সভায় হাজারো ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি দেখা যাইবে, কিন্তু দেশের খাঁটি প্রাণের কাছে ইহারা কোনদিন পৌঁছিবেন না, পৌঁছিতে জানেন না। বিউগল বাজাইয়া যে উদ্দীপনা তাহা প্রতিক্রিয়ামূলক—আসে উচ্ছ্বসিত হইয়া, যায় কূল ভাঙ্গিয়া। তখন শুধু নৈরাশ্যের বালুকা-বেলা ধূ-ধূ করে।...আমাদের সর্বস্বকে যদি সত্য করিয়া লাভ করি এবং ভালবাসি, তবে উত্তেজনার হুইস্কি খাইয়া পেট্রিয়টিজম্ উদ্রিক্ত করিতে হইবে না, স্বতঃপরতই দেশের প্রতি আকর্ষণ জন্মিবে এবং প্রাণ দিবার অনুপ্রেরণা জাগিবে।"

"জনসাধারণ হইয়াছে ত্রিশঙ্কুর মত, তাহাদের চিত্ত মধ্যপথে অবস্থিত। ইংরেজী শিক্ষিত বাবুদের দেখিয়া তাহারা দেশের প্রতি নিষ্ঠা হারাইতেছে, আবার সংস্কারের বশে স্বদেশের প্রতি নিগূঢ় প্রবাহিত যে মমতা, তাহাও ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। মোট কথা, ইহাদের স্বদেশনিষ্ঠ করিবার এখনো উপায় আছে। যেটুকু যাইতেছে, তাহাকে রাখিতে ও ধরিতে পারিলে আবার এ মরণাপন্ন জাতি জিয়াইয়া উঠে। যাইতেছে কি? ধর্মের স্বরূপ—সভ্যতার ধারা, দেশের রূপ, আচার ও নিষ্ঠা, ভক্তি ও সাধনা। এসব ধরিয়া দাও, মুক্তি করতলগত হইবে।

"আগে হইতে ফিরিঙ্গী সাজিও না। তাহা হইলে বিজেতার অনুকরণ স্পৃহায় তোমার মনুষ্যত্ব উন্মেষের পথে বিঘ্ন ঘটিবে। আপনার ভাবে, আপনার কর্মে, আপনার আদর্শে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া স্বরাজ ও স্বাধীনতা লাভের পর ফিরিঙ্গী সাজিব কি নিগ্রো সাজিব সে ভাবনা ভাবিও। তবে ইহা ভুলিও না যে, ফিরিঙ্গী সাজিতে গিয়া মরিয়াছ, আর যখন আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠাবান ছিলে, তখন তোমার সর্বস্বই ছিল। ফিরিঙ্গী আমাদের শিখাইয়াছে যে আমরা গোলামী

করিতেই জন্মিয়াছি। এই সংস্কারের জড় একবারে মারিয়া দিতে হইবে। কি আমরা আর্য সন্তান—আমরা বৈদিক সংস্কারে পরিপুষ্ট—আমরা কিনা বেদবিধি বিবর্জিত ফিরিঙ্গীকে আমাদের চেয়ে বড় বলিয়া মানিব? আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া নিজের নিজত্বে দাঁড়াইয়া স্বদেশীব্রত পালন করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগ। এই নিজত্বের সিংহত্বের বলে ভারতের লক্ষ্মী ও ভারতী দেবীকে ফিরিঙ্গীর বন্ধন হইতে উদ্ধার কর—আত্মমর্যাদা রক্ষা করিতে শিখ—দেখিবে তোমার স্বাধীনতন্ত্র অল্পদিনের মধ্যে ফুটিয়া ওঠে কিনা।”

আর অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই।

এই স্বদেশীতন্ত্রেই স্বদেশী আন্দোলনকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন উপাধ্যায়।

তথাকথিত ভারত-উদ্ধারকারীর দল যেন লজ্জা পেলেন, চমকে উঠলেন। এমন কথা তো আগে শুনিনি। তখন তাঁদের চিন্তায় এই সত্যটা উদ্ভাসিত হলো—একটা জাতিকে তোলা একটুখানি অবসরের ফাঁকে হয় না, সমস্ত জীবন দিয়ে এর সাধনা। দেশ-সেবক হওয়া সোজা কথা নয়। দেশ-ভক্তিরও পরীক্ষা আছে। সে পরীক্ষার কথা কতকাল আগে বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ: “দেশের দুঃখে তোমার কি রাত্রে নিদ্রা হয় না, তুমি কি অন্ন মুখে তুলতে পার না, দেশের ব্যথায় তুমি কি পাগল হয়েছ?” বিবেকানন্দের অন্তরের বেদনার প্রতিধ্বনি আজ উপাধ্যায়ের ‘সন্ধ্যায়’ শোনা গেল। আদর্শের উজ্জ্বল জ্যোতি ফুটে উঠল। এতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রআন্দোলনে ঠিক এই ধরণের স্বদেশী-তন্ত্রের কথা ধ্বনিত হয় নি। রাষ্ট্রনায়কদের মনেও স্বদেশীতন্ত্রের কথাটা জাগে নি। সন্ধ্যার স্বদেশীতন্ত্র তাই সেদিন জাতির স্তিমিত অন্তরে যে অগ্নিচেতনার সঞ্চার করে দিয়েছিল, ইতিহাসের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের মনে আর কোন সংশয় থাকে না। স্বদেশীতন্ত্রই বিপ্লবের উদ্বোধক—সন্ধ্যার এই ফিলজফিই সেদিনের সেই উদ্বেলিত পরিবেশকে যে কতখানি বেগবান্ করে তুলেছিল, তা হৃদয়-মন দিয়ে অনুভবের বিষয়, বিতর্কের বিষয় আদৌ নয়। তাই ব্রহ্মবান্ধব বা ব্রহ্মবান্ধবীয় চিন্তা-ভাবনার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস রচনা বৃথা।

১৯০৫, ২০শে জুলাই।

ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় তারিখ।

ঐদিন জানা গেল ভারত-সচিব বঙ্গ-বিভাগ মঞ্জুর করেছেন।

কার্জনের কঠিন আঘাতের ফলে জেগে উঠলো বাংলা।

জেগে উঠলো আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ।

বরোদায় বসে এই সংবাদ শুনলেন অরবিন্দ। শুনেই তিনি এর প্রতিকারের জন্য একটা উপায়ের কথা লিখে পাঠালেন বাংলার নেতাদের কাছে। তিনি বললেন, ইংরেজের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার একমাত্র উপায় হলো বিলাতি বর্জন অর্থাৎ বিলাতি দ্রব্য বয়কট করা। তিনি আরো বলে পাঠালেন—একটি জনসভায় এই বয়কটের প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে আমাদের। অরবিন্দকে বাংলা দেশের জনসাধারণ তখনো পর্যন্ত খুব ভাল করে চিনত না। তাই তিনি তাঁর মেশোমশাই, 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক এবং জাতীয়তাবাদী দলের অন্যতম নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের মারফত তাঁর এই প্রস্তাবটির বিষয় দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন। অনেকের মতে, বয়কটের আইডিয়া অরবিন্দের ছিল না; এই আইডিয়ার প্রথম অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছিল পাবনার একটি জনসভায়, এই কথা লিখেছেন সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে।

জাতির মর্মবেদনাকে ভাষা দিলেন রবীন্দ্রনাথ।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তিনি লিখলেন:

"ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমাদের বঙ্গভূমি রাজকীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নই হয় তবে সেই বিচ্ছেদ-বেদনার উত্তেজনায় আমাদিগকে সামাজিক সদ্ভাবে আরো দৃঢ় রূপে মিলিত হইতে হইবে, আমাদিগকে নিজের চেষ্টায় ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। সেই চেষ্টার উদ্রেকেই আমাদের পরম লাভ।...আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, একথা আমরা কোনমতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনি আমরা সচেতনভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায় একই পুরাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে। জননীর বাম-দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙালির সন্তানকে পালন করিয়াছে। আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ।"

কার্জনের আঘাত ও অপমান বাঙালি নীরবে নতমস্তকে মেনে নিল না।

দেশের জনসাধারণকে স্বদেশী-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য 'সঞ্জীবনী' লিখল:

"আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর দেশজাত দ্রব্য পাইলে কোন বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই কার্য করিতে যদি আর্থিক বা অন্য কোনপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব। স্বদেশে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন

হয়, ইংল্যাণ্ডের সে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিব না। স্তব-স্তুতি অনেক হইয়াছে, আর নয়। এখন আইস, আমরা নিজের পদভরে দণ্ডায়মান হই। বিদেশী দ্রব্য আর ব্যবহার করিব না, এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। এবার সকলে মাতৃভূমির নামে প্রতিজ্ঞা করি—ইংল্যাণ্ডজাত বস্ত্র ক্রয় করিব না। এবার ছিন্নবস্ত্র পরিয়া বাজারে বাহির হইব, তবুও বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করিব না। যদি সকলে এই প্রতিজ্ঞা করেন, তবে বঙ্গের ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় জোড়া লাগিবে। ভগবান আমাদের এই শুভ সংকল্পে সহায় হউন।"

'হিতবাদী' পত্রিকায় সখারাম গণেশ দেউস্করের লেখনীমুখে সেই একই আবেদন অনুরণিত হয়ে উঠল। উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যায়' স্বদেশী গ্রহণের ও বিলাতি বর্জনের সুর আরো উচ্চগ্রামে উঠল। রবীন্দ্রনাথের 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় কলম ধরলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—বাংলার পুরনারীদের উদ্দেশ্যে এই স্বদেশপ্রাণ মনীষী যে ভাষায় স্বদেশী গ্রহণের আবেদন জানিয়েছিলেন তা অতুলনীয়। এইভাবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা "স্বদেশী আন্দোলনের ধূমায়িত অবস্থায় ইহাকে ক্রমাগত ফুৎকারে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় পৌছাইয়া দিবার চেষ্টার ত্রুটি করে নাই।"

১৯০৫, ৭ই আগস্ট।

বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কলকাতা টাউন হলে আজ বিরাট সভা।

ইতিহাসে সে একটা স্মরণীয় জনসভা।

এই শতাব্দীতে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এটি একটি প্রধান স্মরণীয় সভা।

সভায় বিরাট জনসমাবেশ হয়েছে। হাজারে হাজারে লোক এসেছে। হলের মধ্যে আর লোক ধরে না। সিঁড়ি—সিঁড়ি থেকে রাস্তায়—লোকে লোকারণ্য। এর আগে থেকেই সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতারা কয়েকটি পরামর্শ-সভা ঘরোয়াভাবে করেছিলেন। ভারত-সভা হলে তখন প্রায় প্রতিদিনই পরামর্শ-সভা বসত—কি করা যায়? কেমন করে কার্জনী-বিধান রদ করা যায়?—পরামর্শ-সভাগুলিতে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল এই। তারপর ঠিক হলো ৭ই আগস্ট টাউন হলে প্রতিবাদ-সভা করতে হবে। মফঃস্বলের নেতাদের কাছেও চিঠি গেল ঐ সভায় যোগদান করবার জন্য। মফঃস্বলের নেতারা প্রতিবাদ-সভার সময় পিছিয়ে দেবার জন্য পত্রে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তখনকার যে আবেগ-উত্তপ্ত পরিবেশ, তাতে সভার তারিখ আর কিছুতেই পিছিয়ে দেওয়া চলে না।

এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে মফঃস্বলের নেতাদের আমি লিখে পাঠালাম যে এখন বড় কথা হলো সময়। আন্দোলনের যে আবেগ, যে প্রেরণা জনসাধারণের মনে দেখা দিয়েছে, তাতে সভার সময় আর পিছিয়ে দেওয়া চলে না। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় প্রথমে একটা বড় রকমের

বিক্ষোভ দেখাতে হবে আন্দোলনকে পরিচালিত ও নির্দিষ্ট পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য যার ফলে সমগ্র প্রদেশে এর ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে।"* অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ উত্তপ্ত লৌহ পিণ্ডকে আঘাত করবার কথা বললেন। কোন একটা বৃহত্তর ঘটনা যখন ইতিহাসে ঘটে, তখন দেখা যায় যে, তার পিছনে থাকে একটা প্রবল উত্তেজনা বা প্রেরণা। এ জিনিস আসে জাতির অন্তর থেকে। এবং যখন তা আসে সময়ের হিসাব করে আসে না। একেই বোধ হয় বলা যেতে পারে প্রাণের বন্যা, প্রাণের ঝড়। সমসাময়িকদের সাক্ষ্যে আমরা জানতে পারি যে, স্মরণীয় সেই স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মতো, একটা প্রবল বন্যার মতো বয়ে গিয়েছিল। প্রাণ যখন জাগে তখন এমনি করেই জাগে।

টাউন হলে অনুষ্ঠিত ৭ই আগস্টের সেই জনসভায় আমরা এই জাগরণকেই প্রত্যক্ষ করলাম। এমন অকল্পিত জনসমাবেশ হলো যে শেষ পর্যন্ত এক সভা ভেঙে তিনটা সভা করতে হয়েছিল। এও এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। আবার অন্যদিক দিয়ে এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভা। কারণ, এই সভায় প্রথম 'বয়কট' বা ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটির মধ্যেই কি গান্ধীর অহিংস-অসহযোগের বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল? ইতিহাস এর জবাব দিয়েছে—হ্যাঁ, ছিল। কিন্তু যাক সে কথা। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন—উপস্থিত ছিলেন বাংলার গণ্যমান্য সকল নেতাই। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই সভার সভাপতি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' এই সভায় পাঠ করেন। তাতে তিনি বললেন: "দেশে কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে।... আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে।" একের পর এক নেতা উঠে বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল একই—বাংলা দু'ভাগ হয়ে গেল, বাঙালি এখন কি করবে? তুমুল উত্তেজনার-ঢেউ বয়ে গেল সভায়। সুরেন্দ্রনাথের বজ্রকণ্ঠে শোনা গেল—"আমি এই বিধান রদ্ করবই।" সভার সামনে একটিমাত্র প্রস্তাবই ছিল: বয়কট-প্রস্তাব। সভায় বাংলার বৃদ্ধ জননায়ক 'ইণ্ডিয়ান মিরার'-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, টাউন হলের এই স্মরণীয় সভাতেই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

"যদি বঙ্গ-ভঙ্গ আইনে পরিণত হয়, তাহলে বাঙালি বিলাতি বস্ত্র, বিলাতি দ্রব্য বর্জন করবে"—লক্ষ-কণ্ঠে উচ্চারিত হলো এই শপথ।

"আজ থেকে আমরা বিলাতি জিনিস স্পর্শ করব না।"

হাজার কণ্ঠে উঠলো প্রতিধ্বনি—এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

---

* এ নেশন ইন মেকিং: সুরেন্দ্রনাথ।

বয়কট ও স্বদেশী—ভূমিষ্ঠ হলো বাংলায় ১৯০৫-এর ৭ই আগস্ট।

তখন ম্যান্‌চেষ্টার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার কাপড় আসত। তাতে ইংরেজের বড় কম লাভ হতো না। এবার তাদের ভাতে হাত পড়বার উপক্রম হলো। বিলাতি জিনিস বর্জন করার শপথ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির চেতনায় শুরু হয় এক মহা আলোড়ন। সকলের চোখে-মুখে ফুটে উঠল এক অদ্ভুত প্রাণচাঞ্চল্য। উনিশ শো পাঁচের সকাল বেলায় ঘুম থেকে জেগে উঠে বাঙালি যেন নতুন করে শুনতে পেলো বিবেকানন্দের সেই প্রাণবাণী: "তোমার দেবতা আজ চায় তোমার জীবন-বলি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তোমার সামনে তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা—সে তোমার জননী জন্মভূমি।"

আর মনে পড়লো ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা। যে দেবীমূর্তির বিগ্রহ তৈরী করে রেখে গিয়েছিলেন তিনি, উনিশ শো পাঁচে বাঙালি চেয়ে দেখলো বিশ্বজননী আজ দেশজননীরূপে তার অন্তর আলো করে রয়েছেন। আর উনিশ শো পাঁচের প্রত্যুষে বাঙালির কানে এল এক নতুন চেতন মন্ত্র—যে মন্ত্র এতদিন ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের মধ্যে। উষার নবারুণ আলোকে সহসা সেই মন্ত্র হয়ে উঠলো প্রাণময়। সেই মহামন্ত্র এলো পুঁথি থেকে প্রাণে। বাঙালির কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো মাতৃপূজার মন্ত্র: বন্দেমাতরম্।

আর সেদিন পরম আশ্বাসের বাণী নিয়ে বাঙালির সামনে এসে দাঁড়ালেন জাতির কবি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো জাগরণের এক নতুন মাঙ্গলিক। রাত্রির অন্ধকারে নেতারা যখন সমবেত হয়ে বিলাতি জিনিস বর্জনের শপথ গ্রহণ করেন তখন কবির কাছ থেকে এলো একতাবদ্ধ হবার এক অভিনব প্রেরণা, এক উৎসাহের সঙ্গীত:

"বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।

বাংলার ঘর, বাংলার হাট
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।

বাঙালির প্রাণে বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"

১৯০৫। ৩১শে আগস্ট। বাংলা আশ্বিন মাস।

উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় আশ্বিনের রাত জেগে কাটিয়েছে সবাই।

তাদের আশা ছিল, হয়ত শেষ মুহূর্তে বড়লাটের মনে শুভবুদ্ধি জাগতে পারে, জাগ্রত জনমতকে হয়ত তিনি অস্বীকার করবেন না, হয়ত বাংলা ভাগ না-ও হতে পারে। কিন্তু না, ১৬ই আশ্বিনের সকালবেলায় ক্ষীণ আশাটুকুও আর রইল না। ১৯০৫, ১লা সেপ্টেম্বর সিমলা শৈলশিখর থেকে গভর্নমেণ্ট সরকারীভাবে ঘোষণা করলেন বঙ্গ-বিভাগ। প্রভাতী সংবাদপত্রে সকলে জানতে পারলো সেই নিদারুণ দুঃসংবাদ। কে যেন বাঙালির হৃদয়ে শেলের আঘাত করলো। এক বাংলা—পূর্ব বাংলা আর পশ্চিম বাংলায় দেখা দিল, এক বাঙালি—কার্জনের কলমের এক খোঁচায় দুই ভাগে আলাদা হয়ে গেল। পার্টিসন অব বেঙ্গল এখন রীতিমতো বাস্তব রূপ নিতে চললো, কার্জনী-ভাষায় 'সেটলড্ ফ্যাক্ট'-রূপে দেখা দিল। আইন পাশ হয়ে গিয়েছে, এখন এর আর নড়চড় হবার জো নেই। বাঙালিকে মেনে নিতে হবে স্বৈরাচারী এই বিধান।

কিন্তু ৭ই আগস্টের পর থেকে স্বদেশী আন্দোলন ধূমায়িত অবস্থা থেকে উপনীত হলো প্রজ্জ্বলিত অবস্থায়। লেলিহান শিখা মেলে এইবার ছড়িয়ে পড়বে সেই আন্দোলন সারা বাংলায়। বাঙালির জীবনে এলো নতুন প্রভাত। আর সেই নতুন প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়লো সারা ভারতে। ২রা সেপ্টেম্বরকে বাঙালি গ্রহণ করলো একটি অশৌচের দিন হিসাবে—শোক প্রকাশের দিন হিসাবে। প্রভাত সূর্য উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল মহানগরীর রাজপথ দিয়ে দলে দলে লোক চলেছে খালি পায়ে গঙ্গার দিকে। সে দৃশ্য ভুলবার নয়। সেই জনতার পুরোভাগে দেখা গেল নবজাগরণের পুরোহিত রবীন্দ্রনাথকে। তিনিও নগ্নপদে চলেছেন জনতার সঙ্গে। নেতারাও সবাই আছেন। সকলে একসঙ্গে গঙ্গায় স্নান করলেন। ভারত-ভাগ্যবাহিনী গঙ্গার পবিত্র বারি অঞ্জলিপুটে ধারণ করে সবাই বলতে থাকেন:

"বাঙালির প্রাণে বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"

গঙ্গায় স্নান করে বাঙালি প্রতিজ্ঞা করে :

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।

সে পণ বিদেশী বর্জনের পণ। আর সেই সঙ্গে গঙ্গার দুই তীর কাঁপিয়ে হাজার কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে—বন্দেমাতরম্।

ঐদিন—ঐ চিরস্মরণীয় দিনে বেদনার প্রতিঘাতে মিলনের রাখীসূত্র হাতে বেঁধে বাঙালি প্রতিজ্ঞা নিলো :

"ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই।"

আর সঙ্গে সঙ্গে কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো :

"এক জাতি এক ভগবান
এক দেশ এক মনো প্রাণ।"

হলুদ রঙের রাখী হাতে বেঁধে আর কণ্ঠে এই মন্ত্র নিয়ে সকলে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন। রাত্রি প্রভাতের সেই নব-সঙ্কল্পের তরঙ্গ শহর ছাড়িয়ে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে আছড়ে পড়ে। পথে-ঘাটে-মাঠে সর্বত্র চলে রাখীবন্ধনের উৎসব। এই উৎসবের পরিকল্পনা ছিল রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের। হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই। একজন রাখী-হাতে অপরের হাতে রাখী বাঁধে আর বলে—মিলতে হবে, এক হতে হবে। কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে—এক জাতি, এক প্রাণ, এক ভগবান।

২২শে সেপ্টেম্বর।

আবার একটা বিরাট সভা হলো টাউন হলে।

এবার সভাপতি বাগ্মী লালমোহন ঘোষ। ১৯০৩ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে ইনি বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেছিলেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর। কলকাতার ময়দানে জনসাধারণ আর স্কুল-কলেজের ছাত্ররা সমবেত হয়েছে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাবার জন্য। তারা এসেছে মনের বেদনাকে ভাষা দেবার জন্য। তারা সবাই ছিল নিরস্ত্র। কিন্তু সেই জনতার উপর পুলিশের লাঠি নেমে এলো অতর্কিতে। সরকারী দমন-নীতির প্রথম প্রকাশ।

বাংলা দু'টুকরো হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে জাতির বেদনা মূর্তি পেলো এইভাবে। একটা নিঃশব্দ প্রতিবাদের ভিতর দিয়ে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চললো মিলনের পথে, ঐক্যের রাজপথে। এক জাতি, এক প্রাণ, এক ভগবান—এই সংকল্পকে বাঙালি রূপ দিতে চাইলো। ঠিক হলো একটা মিলন-মন্দির তৈরি করতে হবে শহরে। তার

নাম ঠিক হলো 'ফেডারেশন হল'। ১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবর মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হলো। সার্কুলার রোডে জগদীশচন্দ্র বসুর ভবনের ঠিক বিপরীত দিকে একটি উন্মুক্ত স্থানে এই স্মরণীয় উৎসবটি সম্পন্ন হয়। চারদিক থেকে লোক সমবেত হয়েছে। জননায়কেরা এসেছেন। এসেছেন পুরনারীরা। ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করলেন বর্ষীয়ান জননেতা আনন্দমোহন বসু। তিনি তখন বৃদ্ধ, রোগে শয্যাশায়ী। তবু এলেন একটি ইনভ্যালিড চেয়ারে বাহিত হয়ে। না এসে থাকতে পারলেন না।

সমগ্র জাতিকে আহ্বান করে তিনি বললেন: "এই যে মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হলো, আজ থেকে এই-ই আমাদের বঙ্গ-ভবন। এর ভিত্তি শুধু একটুকরো মাটির উপরে নয়, এর ভিত্তি আমাদের সকলের অশ্রুসিক্ত ব্যথিত হৃদয়ের ওপর।" এই উৎসব উপলক্ষ্যে সেদিন পাঞ্জাবের শিখগুরু কুন্ডার সিং উপস্থিত ছিলেন। বাংলার পক্ষ থেকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর হাতে রাখী বেঁধে দিয়ে বললেন: বাংলা ও পাঞ্জাবের এই বন্ধন অটুট হোক। তারপর সবশেষে জাতির পক্ষ থেকে জাতির কবি রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন: "আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করতে এবং বাঙালি জাতির একতা বজায় রাখতে আমরা সমগ্র বাঙালি জাতি আমাদের শক্তিতে যা কিছু সম্ভব তার সবই প্রয়োগ করব।"

এইভাবে ভাঙা-বাংলার মনের আকাশ রাঙিয়ে তোলে মিলনের নতুন সূর্য।

সেই সূর্যের দীপ্ত কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সকলের মুখ।

বাংলা শুধু একাই জাগল না। জেগে উঠে সে ডাক দিলো ভারতের অন্য সব প্রদেশকে, অন্য সব প্রদেশের লোকদের। জাগরণের শঙ্খধ্বনিতে বাঙালি ডাক দিলো বেহারীকে—মারাঠীকে—পাঞ্জাবীকে—মাদ্রাজীকে—ভারতের যে যেখানে ছিল সবাইকে। কারণ বাংলার সেই জাগরণ শুধু নিজের জন্য ছিল না, ছিল সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য। দু টুকরো বাংলা যেন আরো নিবিড়ভাবে ঐক্য ও মিলনের সূত্রে বাঁধতে চাইলো ভারতকে। সত্যিকার জাগরণ যখন হয়, তখন এমনি করেই হয়। এই ছিল সেদিন ইতিহাসের নেপথ্য বিধান। অমোঘ সেই বিধান ছাপিয়ে গেল কার্জনী-বিধানকে।

দেখতে দেখতে ঘটনার স্রোত দ্রুত আবর্তিত হয়ে চললো।

নব-জাগরণের প্রাণ-সঙ্গীতে বাংলার আকাশ-বাতাস ভরে উঠলো। ভরে উঠলো বাঙালির হৃদয়।

গানে ও বক্তৃতায় দেশের তরুণচিত্তে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হলো। একা রবীন্দ্রনাথের রুদ্র-বীণায় বেজে ওঠে গানের পর গান। সিডিশন আইনের শৃঙ্খল ঝঙ্কারে কামিনীকুমার ও রজনীকান্ত প্রমুখ বাংলার কবিদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় মাতৃ-বন্দনা। স্কুল-কলেজ থেকে দলে দলে ছাত্ররা বেরিয়ে এলো। তারা ছুটলো বিলাতি

জিনিস বর্জনের শপথের কথা সকলের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। তাদের কণ্ঠে—বন্দেমাতরম্। এমনি করেই সেদিন, সেই স্মরণীয় ১৯০৫ সালে বাংলাব বুকে নেমে এসেছিল দুকূল প্লাবী প্রাণবন্যা। নিষিদ্ধ হয় বন্দেমাতরম্। কিন্তু নিষেধ শোনে কে? সমুদ্র-তরঙ্গেব অবিরাম গর্জনের মতো সারা দেশের বুকের ভিতব থেকে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—বন্দেমাতরম্। স্বদেশী ও বয়কটেব মশাল হাতে কলকাতা থেকে দেশ-নায়কেরা বেরিয়ে পড়লেন বাংলার সর্বত্র জাগরণের শুভ সমাচার প্রচারের জন্য—বিশেষ করে তাঁরা গেলেন পূর্ব বাংলায়। জাতীয় ভাণ্ডারের উদ্বোধন হলো বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ির বিরাট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক সভায়*। 'সন্ধ্যা'র ভেরী নিনাদ আরো তীব্র হয়ে উঠলো। পান্তীব মাঠে একটি সভায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ স্থাপনেব সংকল্প গৃহীত হলো। এবং অবশেষে সাত বছব অপ্রতিহত প্রভুত্ব চালিয়ে লর্ড কাজন বিদায় নিলেন। এইভাবে বহু ঘটনা-সঙ্কুল এবং উত্তেজনা ও আবেগপূর্ণ একটি বৎসরের অবসান হলো। এইবার আমরা দেখব বরোদা থেকে বাংলায় এসে স্বদেশী আন্দোলনের সেই প্রজ্বলিত হুতাশনের মধ্যে কেমন করে দাঁড়ালেন বিপ্লবের রণগুরু অরবিন্দ ঘোষ।

* মতান্তরে এই সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল চোরবাগানে রাজেন্দ্র মল্লিকের ভবনে।

॥ পঁচিশ ॥

"প্রিয় মৃণালিনি,

আমার তিনটি পাগলামি আছে। ১ম—নিতান্ত সাধারণ লোকের মত খাইয়া পরিয়া থাকিয়া উপার্জনের আর সব টাকা দেশের অভাবগ্রস্ত দুঃখী লোকদিগকে বিলাইয়া দেওয়ার সংকল্প। এই দুর্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত। আমার ত্রিশকোটি ভাইবোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে। তাহাদের হিত করিতে হয়। ২য়—সম্প্রতিই ঘাড়ে চাপিয়াছে; পাগলামিটা এই, যে কোন মতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতে হইবে। ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহাব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে। সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্মে বলে—নিজের শরীরে নিজের মনের মধ্যেই সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্মের কথা মিথ্যা নয়। যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই।

তৃতীয় পাগলামি এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটি জড় পদার্থ, কতগুলি মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত বলিয়া জানে। আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সহিত আমোদ করিতে বসে—না, মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি, এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে—শারীরিক বল নয়, তরবারি বন্দুক দিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না। জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে। সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এইভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল। পাগল তো পাগলামির পথে ছুটিবেই ছুটিবে,

তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে ওর স্বভাবই বলবান। তবে তুমি কোণে বসিয়া কাঁদিবে মাত্র, না তার সঙ্গে ছুটিবে? পাগলের উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধরাজমহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন। হাজার ব্রাহ্ম স্কুলে পড়িয়া থাক, তবু তুমি হিন্দু ঘরের মেয়ে, পূর্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে। আমার সন্দেহ নাই—তুমি শেষোক্ত পথই ধরিবে। ইতি—তোমার স্বামী অরবিন্দ ঘোষ।"

অরবিন্দের এই চিঠির তারিখ ১৯০৫, ৩০শে আগস্ট।

তিনি বরোদায় বসে তাঁর বিদুষী পত্নীকে এই আশ্চর্য পত্রখানি লিখছেন ঠিক তখনি যখন বাংলা দেশে বঙ্গ-ভঙ্গকে উপলক্ষ্য করে দেখা দিয়েছে বাঙালির মনে এক অভূতপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্য, একটা অনাস্বাদিত-পূর্ব উন্মাদনা। আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, তিনি বরোদায় অবস্থান করে বাংলা দেশের ঘটনাবলীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। এইসব ঘটনা তাঁর মনেও যে প্রচণ্ড আঘাত করছিল এবং তাঁর 'বন্দরের কাল' যে তখন শেষ হয়ে আসছিল তাও আমরা অনুমান করতে পারি। কারণ আমরা দেখতে পাব যে, আর অল্পকাল পরেই তিনি বরোদার চাকরি ছেড়ে বাংলা দেশে চলে আসবেন ও আন্দোলনে সক্রিয়—শুধু সক্রিয় বলি কেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবেন—যে ভূমিকাটি একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু সে কাহিনী পরে আলোচনা করা যাবে, আপাতত সহধর্মিণীকে লেখা পত্রখানির প্রসঙ্গে ফেরা যাক।

একথা অতীব সত্য যে, "অরবিন্দের দাম্পত্য জীবনের কথা কেহ কিছুই স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন না। ইহা এখনো পর্যন্ত আলো-আঁধারে জড়াইয়া অস্পষ্ট এবং শুধু গল্প-গুজবের মধ্য দিয়া লোকমুখে রটিত। সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু এই চিঠি অরবিন্দের দাম্পত্য জীবনের উপর অনেকটা আলোকপাত করিয়াছে।" চিঠিখানির মূল্য এইখানেই। আমরা দেখতে পাই, এই চিঠিতে অরবিন্দ তাঁর মনের কথা অবারিত ভাবেই স্বীয় পত্নীর নিকট মেলে ধরেছেন, রেখে-ঢেকে কিছু বলেন নি। তাঁর স্বভাব সেরকম নয়। এই চিঠির দর্পণে তাঁর তখনকার মানসিক অবস্থা অতি সুস্পষ্টভাবেই প্রতিবিম্বিত রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাঁর এই গোপন পত্রখানির কথা কেউ জানত না। হয়ত কোন কালে কেউ জানতেও পারত না যদি না আলিপুর বোমার মামলার সময় সরকার পক্ষের কৌঁশুলি মিস্টার নর্টনের হাত দিয়ে 'এগ্‌জিবিট' হিসাবে ইহা আদালতে প্রকাশ পেত। চিত্তরঞ্জন তো এই চিঠিখানার বলেই তাঁর বন্ধুর মামলা অনেকখানি হালকা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতএব অরবিন্দের এই পত্রখানি যে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান, সে

বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই চিঠিখানি থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, সেই সময় দুটি প্রবল স্রোতের বেগ তাঁর মধ্যে সমানেই প্রবাহিত হচ্ছিল। তার মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক, অপরটি রাজনৈতিক। রাজনীতির স্রোতটা ছিল গৌণ আর সেটা অনুপ্রাণিত হচ্ছিল আধ্যাত্মিক ধারা থেকেই। মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগটা আবাল্যের, ইংল্যাণ্ডে ছাত্রজীবনেও তাব অভিব্যক্তি আমরা দেখেছি। কিন্তু যখন থেকে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পবিচিত হলেন তখন থেকে তিনি নতুন করে জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন।

এই চিঠিতে আমরা দেখছি অরবিন্দেব স্বদেশপ্রেম, দেখছি তিনি পরদুঃখ-কাতর ও দয়ার্দ্রচিত্ত। নিজের সুখভোগ তিনি তুচ্ছ মনে করেন, এমন কি তিনি সর্বস্ব ত্যাগেব জন্যও দৃঢ় সঙ্কল্প। কিন্তু এহ বাহ্য। অরবিন্দ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, হিন্দুধর্মে উল্লিখিত যোগসাধনায় তাঁর প্রবল আস্থা। জানা যাচ্ছে, তিনি তখন থেকেই যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং এই পথে বেশ কিছুদূর অগ্রসরও হয়েছেন। প্রিয়তমা মৃণালিনীও এই পথে তাঁর সঙ্গিনী হন, ইহাই ছিল স্বামীর অন্তরেব আকুল আগ্রহ। পৃথিবীতে আর কোন স্বামী তাঁব স্ত্রীকে ঠিক এই রকম ভাষায় কখনো চিঠি লিখেছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু অববিন্দ স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ, তাঁর সব কাজই আপাত দৃষ্টিতে উদ্ভট। উদ্ভট কিন্তু সরল। এমনভাবে নিজের স্ত্রীর কাছে অকপটে মনের কথা খুলে বলতে খুব কম স্বামীই পারেন। কিন্তু অন্যে যা পারে না, এই মানুষটি অনায়াসে তাই পারেন। হিসাব করে আমরা দেখতে পাই যে, অরবিন্দ তাঁব স্ত্রীকে যখন এই পত্রখানি লিখছেন তখন তাঁদের বিবাহিত জীবনেব চার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। চার বছর হলো তাঁদের বিবাহ হয়েছে, কিন্তু স্বামীর কোন উন্নতি হইল না'—সম্ভবত মৃণালিনী দেবীব পত্রে এই রকম একটা আক্ষেপ প্রচ্ছন্ন অথবা সুস্পষ্ট ছিল এবং সেই চিঠির উত্তরেই এই চিঠিখানি লিখতে হয়েছিল। আমরা আরো একটা জিনিস এখানে দেখতে পাচ্ছি—"বিবাহিত জীবন সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াই অরবিন্দ যোগী হইতে চাহিতেছেন" এবং এই পথে "কাঞ্চনত্যাগী হইলেও তিনি স্ত্রী-ত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে চাহিতেছেন না।" অরবিন্দ-চরিত্রের জটিলতা এইখানেই।

কিন্তু চিঠিখানির মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় যেটা সেটা হলো স্বদেশ সম্পর্কে অরবিন্দের ধারণা। তাঁর কাছে স্বদেশ ভৌগোলিক সত্তা নয়—সাক্ষাৎ চিন্ময়ী সত্তা—একেবারে প্রকৃত দেশজননী। স্বামী বিবেকানন্দও স্বদেশ বলতে ঠিক এই জিনিস বুঝতেন। কিন্তু বাংলা দেশে স্বদেশ সম্পর্কে এই জাতীয় চিন্তার প্রথম প্রবক্তা ছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তা আমাদের কাছে

সেদিন এইভাবেই উদ্ভাসিত হয়েছিল বিবেকানন্দ-অরবিন্দের স্বদেশ চিন্তার মাধ্যমে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই চিন্তা কী প্রবল ভাবেই না বাঙালির জীবনে কার্যকর হয়ে উঠেছিল ইতিহাসই তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে। অরবিন্দ যখন স্বদেশকে মা বলে জেনেছেন তখন আরো একজনের মধ্যে ঐ ভাব জীবন্ত ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে দেখতে পাই। তিনি উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব এবং তাঁর সন্ধ্যার আসরে যে মাতৃবন্দনা উদ্গীত হতো তা দেশকে প্রত্যক্ষ জননী হিসাবেই বন্দনা ছিল, অন্য কিছু নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনিও এই ভাবটা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। অতএব বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের মূলাধার পুরুষ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান সর্বাগ্রে, আর কারো নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে একটি মহত্তম ভাব থেকেই বৃহত্তম ঘটনার উদ্ভব হয়ে থাকে। বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তা ছিল আমাদের জাতীয় জীবনে ঠিক এইরকম একটি মহত্তম চিন্তা আর সেই চিন্তার ধারক ও বাহক ছিলেন এই তিনজন সন্ন্যাসী—বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব ও অরবিন্দ। তবে এই তিনজনের চিন্তার মধ্যে কিছু তারতম্য আছে, যদিও মূল সুরটা একইভাবে তিনজনের অন্তরের বীণায় ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল। অরবিন্দের দেশপ্রেম ও রাজনীতি দুটি জিনিসেরই মূল ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিকতায়। চিঠিতে এর আভাস খুবই সুস্পষ্ট।

বলেছি, এই চিঠিখানিতে আমরা অরবিন্দের তৎকালীন মনের একটা ছবি পাই—সেই দিক দিয়ে ইহাকে "একখানি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীও বলা চলে—এই চিঠিতে আমরা তাঁহার জীবনের তিন কালের পরিচয় পাইতেছি—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।" তথাপি পত্রে একটি জিনিস তিনি চেপে গিয়েছেন দেখা যায় এবং সেটা যে তিনি ইচ্ছা করেই করেছেন তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। দেশোদ্ধারের জন্য তিনি যে বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই তথ্যটা অরবিন্দ এখানে ব্যক্ত করলেন না। ব্যক্ত করা নিরাপদ নয় মনে করেই তা করেন নি। তা ছাড়া—তাঁর শ্বশুর ভূপাল বসু ছিলেন একজন সরকারী কর্মচারী এবং ধনী ব্যক্তি। তবে ভবিষ্যতে তিনি কি করবেন পত্রে তার সুস্পষ্ট আভাসটা তিনি স্ত্রীর সামনে তুলে ধরতে দ্বিধাবোধ করেন নি। মৃণালিনী দেবীকে এই চিঠি লিখবার ছ'মাস পরেই আমরা দেখতে পাব তাঁর পাগল স্বামী বরোদার চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলা দেশে আসবেন ও প্রজ্জলিত হুতাশনে স্বীয় জীবনকে আহুতি দেবেন।

১৯০৫, ৯ই নভেম্বর।

স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ।

ঐ তারিখে পাণ্ডীর মাঠে* ছাত্রদের একটি সভা হয়।

স্বনামধন্য সুবোধ মল্লিক এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। সেইদিন ঐ সভায় সভাপতি হিসাবে তিনি একটি চমকপ্রদ ঘোষণা করেন। তেমন ঘোষণা ইতিপূর্বে বাংলা দেশে—শুধু বাংলা দেশে বলি কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে আর কেউ কখনো শোনে নি। "যদি একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় তা হলে আমি তার প্রতিষ্ঠাকল্পে একলক্ষ টাকা দান করব।" তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন যে, দেশে জাতীয় শিক্ষাপ্রচারের এই মাহেন্দ্রক্ষণ। পাণ্ডীব মাঠে ছাত্র সভায় সুবোধচন্দ্রের এই এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেশের মধ্যে যে উৎসাহের সঞ্চার করেছিল তা অভূতপূর্ব বললেই হয়। যে শুনল সেই-ই অবাক হলো। অবাক হলেন চিত্তরঞ্জন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর মারফৎ চিত্তরঞ্জন যখন প্রথম ইহা শুনলেন তখন তাঁর যেন বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না। এক লক্ষ টাকা। সুবোধ দেবে। সুবোধ একা এই টাকা দেবে। চিত্তরঞ্জন যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তিনি নিজে এসে দেখা করলেন সুবোধচন্দ্রেব সঙ্গে। শুনলেন তাঁর সঙ্কল্পের কথা। হ্যাঁ, দেব—এক লক্ষ টাকাই আমি দেব যদি আপনাবা সবাই মিলে একটা ন্যাশনাল কলেজ এখনি করতে পারেন।—এই কথা বললেন সুবোধচন্দ্র তাঁর বন্ধু চিত্তরঞ্জনকে। "ছাত্রেরা জয়-জয় রব করিয়া হর্ষধ্বনি করিল এবং তাঁহাকে রাজা সুবোধ মল্লিক বলিয়া সম্মানিত করিল। দেশের লোকের প্রদত্ত 'রাজা' উপাধি এই প্রথম আমরা দেখিলাম।" একেই বলে দেশপ্রেম।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখনকার বাঙালি সন্তানের কাছে বাঙালির প্রাণের 'রাজা' এই সুবোধচন্দ্র মল্লিকের স্মৃতি ম্লান বললেই হয়। পটলডাঙার বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের সন্তান ছিলেন সুবোধচন্দ্র মল্লিক (১৮৭৯-১৯২০)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি কেমব্রিজে অধ্যয়ন করতে যান ও ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দেবার জন্যও প্রস্তুত হন। পারিবারিক কারণে বিলাতে অধ্যয়ন অসমাপ্ত রেখে ১৯০১ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন এবং তাঁর ১২ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ (বর্তমান নাম 'রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার') বাসভবনটি তখন স্বদেশী আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তাঁর ক্রীক রো-র বাড়িতে ছিল 'বন্দেমাতরম্' প্রেস ও পত্রিকা এবং এই পত্রিকার পিছনেও তাঁর অর্থানুকূল্য বড় কম ছিল না। বরোদা থেকে এসে

* এই স্থানটি তখন 'ফিল্ড য়্যাণ্ড একাডেমি ক্লাবের' মাঠ নামেও পরিচিত ছিল।

অরবিন্দ তাঁর বাড়িতে বেশ কিছুদিন বাস করেছিলেন। আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সফল করে তোলার জন্য সুবোধচন্দ্র মুক্তহস্তে দান করেছিলেন। ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি এক লক্ষ টাকা দান করে সমগ্র বাঙালিজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি জাতীয় পরিষদের কাউন্সিলের অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন। ১৯০৭ সালে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে যোগদান করবার জন্য জাতীয়তাবাদী দলের যে প্রতিনিধিদল গিয়েছিলেন তার সমগ্র ব্যয়ভার তিনি বহন করেছিলেন। বরিশাল কনফারেন্সে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে সেই সময় সমগ্র পূর্ব-বঙ্গ ভ্রমণ করেছিলেন। ১৮১৮ সালের তিন আইনে বাংলাদেশে যে নয়জন ধৃত ও নির্বাসিত হয়েছিলেন, সুবোধচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে একজন। ১৯১০ সালে মুক্তিলাভের পর তিনি অবশিষ্ট জীবন কলকাতার বাইরে অবস্থান করেন এবং ১৯২০ সালের ১৪ই নভেম্বর তারিখে মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য এমনভাবে জীবন ও অর্থদান খুব কম লোকেই করতে পেরেছেন। পণ্ডিচেরীতে অবস্থান করবার সময় শ্রীঅরবিন্দ টিলকের মৃত্যুতে এবং আরো অনেকের সম্পর্কে লিখেছিলেন। কিন্তু সুবোধচন্দ্র সম্পর্কে কিছুই লেখেন নি। কেন লেখেন নি, কে জানে? অথচ একথা অতি সত্য যে, সুবোধ মল্লিকের দান ভিন্ন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হতে পারত কিনা সন্দেহ এবং প্রধানত এই পরিষদকে উপলক্ষ্য করেই বরোদা থেকে অরবিন্দের বাংলায় আসা সম্ভবপর হয়েছিল; তেমনি সুবোধ মল্লিকের অর্থানুকূল্য ভিন্ন 'বন্দেমাতরম্' প্রকাশ হতে পারত কিনা সন্দেহ আর এই বন্দেমাতরম্-কে কেন্দ্র করেই তো অরবিন্দের সাংবাদিক তথা রাজনৈতিক প্রতিভা স্ফুরণের পথ প্রশস্ত হতে পেরেছিল। সুতরাং এমন একজন দেশপ্রেমিকের অকাল-মৃত্যুতে অন্তত তাঁর দান ও ত্যাগের মহত্ত্বটা শ্রীঅরবিন্দের একবার স্মরণ করা উচিত ছিল। সুবোধচন্দ্রের অকাল-মৃত্যুতে কিন্তু সেদিন একজনকে আমরা অশ্রুবিসর্জন করতে দেখেছিলাম। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।

প্রসঙ্গক্রমে স্বদেশী আন্দোলনের একটি অপরিহার্য অধ্যায় হিসাবে এখানে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইতিহাসটা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিগত শতাব্দীর শেষ দশক থেকেই জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেন। সেই সময় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬৫-১৯৪৮) নাম বিশেষভাবেই স্মর্তব্য। ১৯০২ সালে তিনি ডন্ সোসাইটি নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সোসাইটির মাধ্যমেই তিনি জাতীয় ঐতিহ্য, জাতীয় স্বার্থ ও শিক্ষার প্রকৃত

মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসার কথা চিন্তা করেন ও প্রয়াস পান। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বীজটা এখানেই আমরা প্রথম পাই। ছাত্রদের মধ্যেও চরিত্র গঠন, নিঃস্বার্থ সেবা ও মাতৃভূমির সেবার জন্য আত্মোৎসর্গের ভাবটাও তিনি এই সোসাইটির মাধ্যমে অনেকখানি উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। তারপরেই এলো বঙ্গবিভাগ—এলো বয়কট আন্দোলন। বিদেশী বস্ত্র ও পণ্যের সঙ্গে দেশের নেতারা বিদেশী শিক্ষাধারাকেও বর্জন করতে সাব্যস্ত করলেন।

অতঃপর জাতীয় শিক্ষার প্রশ্নটা আর আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে নিবদ্ধ রইল না। দেশের নবজাগ্রত রাজনৈতিক চেতনা যতই সংহত ও ব্যাপক হয়ে উঠতে থাকে, ততই নেতারা একটি সুপরিকল্পিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের কথা গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন। এই চিন্তারই পরিণতি ছিল ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন। ১৯০৫ সালের ১৬ নভেম্বর পার্ক ষ্ট্রীটে বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েসনের কার্যালয়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বিষয়টি নিয়ে একটি প্রাথমিক আলোচনা সভা বসে; বাংলাদেশের তখন যারা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা সবাই এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। যাঁদের নিয়ে এই আলোচনা সভায় একটি কমিটি গঠিত হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যর রাসবিহারী ঘোষ, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর তারকনাথ পালিত, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার পি. মিত্র, ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল, 'মিরার'-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ। তারপর ১৭ই নভেম্বর পনর হাজার দর্শকের সামনে পাণ্ডীর মাঠে যে বিরাট জনসভা হয়, সেই সভায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এই সভাতে আরো ঘোষণা করা হয় যে, এইজন্য সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করেছেন। এর প্রায় বৎসরখানেক পরেই ১৯০৬ সালের ১৫ আগষ্ট তারিখে টাউন হলের একটি সভায় কাউন্সিলের উদ্বোধন হয়। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই উদ্বোধনী সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল এবং শহরের বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সেদিন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্বোধন করতে গিয়ে স্যর গুরুদাস জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে যে অপূর্ব ভাষণটি দিয়েছিলেন তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শিক্ষার একটি সম্পূর্ণ ও সুবলয়িত 'স্কীম' তিনি সেদিন দিয়েছিলেন। সত্য বটে যে, তিনি স্বদেশী আন্দোলনের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নি কিংবা এর অসংযত গতিবেগ ও উদ্দাম উন্মাদনা তিনি কোনদিন সমর্থন করেন নি, কিন্তু জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে তিনি নিজেকে

সম্পূর্ণভাবেই সংযুক্ত করেছিলেন। শুধু সংযুক্ত হওয়া নয়, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি পরিষদের একজন প্রধান কর্ণধার ছিলেন বললেই হয়। অবসর-প্রাপ্ত বিচারপতি ও 'নাইট' উপাধিধারী এই মানুষটির সঙ্গে সেই যে জাতীয় শিক্ষার তন্তু গ্রথিত হয়েছিল, জীবনাবধি তা আর বিচ্ছিন্ন হয় নি। অনেকের মধ্যে দেখা যায় যে, উৎসাহ-বহ্নি ঝড়ের আগুনের মতো উদ্দীপিত ও নির্বাপিত হয়ে যায়। গুরুদাস ছিলেন এর ব্যতিক্রম। স্বদেশী আন্দোলনের ঝড় থেমে যাওয়ার পর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে অনেকে যখন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন, তখন দেখা গেল যে একমাত্র স্যর গুরুদাসই ধীর, স্থির, সংহত সংযতভাবে পরিষদের উন্নতিবিধানেব কাজে নিজেকে সংযুক্ত রেখেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, সুবোধচন্দ্র মল্লিকের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে পরিষদের প্রতিষ্ঠাকল্পে আর যে দুজন বরেণ্য বাঙালি সন্তান মুক্তহস্তে অর্থদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ব্রজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, অপরজন সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী। প্রথম ব্যক্তি দিলেন পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি আর দ্বিতীয় জন দিলেন আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি। এইভাবেই সেদিন শুভদিনে শুভক্ষণে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ।*

পরিষদের 'মেমোরাণ্ডাম' ও নিয়মাবলী রচনায় স্যর গুরুদাসের নিপুণ হস্তের নিদর্শন অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। উদ্বোধনী সভার প্রদত্ত ভাষণে ধীর ও সংযতভাবে তিনি জাতীয় শিক্ষার সকল দিক আলোচনা করে এর উপযোগিতা ও আশু প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কে বয়কট করার প্রস্তাব যে অযৌক্তিক তাও প্রতিপন্ন করেছিলেন। জাতীয় শিক্ষা অবশ্যই জাতীয় ভাব-ধারায় জাতীয় নিয়ন্ত্রণে পরিগণিত হবে, একথা তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনি সেই সঙ্গে একথাও বলেছিলেন যে, "জাতীয় শিক্ষা সরকারী শিক্ষা হইতে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইবে, তৎকর্তৃক কবলিত হইয়া সঙ্কর ভাবাপন্ন হইবে না, কিন্তু তাহার সহিত কোন বিরোধিতাও করিবে না। বাস্তবিক বর্তমান অবস্থায় ইহাই জাতীয় শিক্ষার সুচিন্তিত নিয়তি।" বলাবাহুল্য, স্যর গুরুদাসের এই সুচিন্তিত অভিমত অনুসরণ করেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সাফল্যমণ্ডিত হতে পেরেছিল। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অনেকদিন পর্যন্ত পরিষদের প্রতি রাজপুরুষদিগের রোষকষায়িত দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। স্যর গুরুদাস কিন্তু সেদিকে দৃকপাত করতেন না। তিনি বলতেন, "আমাদের দেশের বালক ও যুবকবৃন্দকে আমাদের মতানুযায়ী শিক্ষা দিব। ইহাতে কাহারো বাধা দিবার অধিকার নাই এবং কাহারো বাধা মানিতে আমরা বাধ্য নই।" পরিষদ স্থাপিত হওয়ার পর স্যর গুরুদাসের অনুরোধে স্বনামধন্য স্যর রাসবিহারী ঘোষ এর সভাপতি হন ও জীবনাবধি তিনি এর সভাপতি ছিলেন।

* স্বাধীনতা লাভের পর স্বদেশীযুগের স্মৃতিপূত এই পরিষদই 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়'-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

মৃত্যুর পূর্বে উইল করে তিনি জাতীয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে কুড়ি লক্ষ টাকা দান করে গিয়েছিলেন। বাংলার বিগত যুগের বিস্মৃতকীর্তি স্বদেশসেবকগণের মধ্যে স্যর রাসবিহারী ঘোষও নিঃসন্দেহে একজন।

আগেই বলেছি, উনিশশো পাঁচে বাংলার বুকে যেন একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল।

আবেগ ও উন্মাদনার ঝড়।

তার সঙ্গে খরবেগে প্রবাহিত হয়েছিল জাতীয় জীবনস্রোত।

এই একটা বছরে যে কত সভা আর কত বক্তৃতা হয়েছিল তার ইয়ত্তা করা যায় না।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম থেকে অর্থাৎ যেদিন সরকারীভাবে বঙ্গবিভাগ ঘোষিত হয় সেইদিন থেকে ঝড়ের বেগ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠল—বেদনাহত জাতির অন্তরের বিক্ষোভ যেন ফেটে পড়তে চাইল। এই ঝড়ের ভিতর দিয়েই বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে দেখা দিল দুটি দল—মডারেট ও এক্সট্রিমিস্ট অর্থাৎ নরমপন্থী ও চরমপন্থী। এই ঝড়ের মধ্য দিয়েই কার্জন ভারতভূমি পরিত্যাগ করে চলে যান। চরমপন্থী নেতাদের গরম গরম বক্তৃতায় বাংলার আকাশ বাতাস ক্রমেই ভারী হয়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদন নীতির সমালোচনা করে বিপিনচন্দ্র পাল একটি বিখ্যাত বক্তৃতা করেছিলেন; বক্তৃতার বিষয় ছিল 'আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষা'। এ বক্তৃতা ছিল রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতার প্রতিধ্বনি। "বিদেশী শাসন-নিরপেক্ষ স্বদেশী স্বাধীন সমাজ"—এই পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের দিয়েছিলেন। আর বিপিনচন্দ্র আত্মপ্রতিষ্ঠার যে নীতি উনিশশো পাঁচে বললেন, তার বারো বছর আগে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় ইহা প্রথম প্রচার করেন অরবিন্দ। অতঃপর "গভর্ণমেণ্ট-মুখোপেক্ষী না হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষাই চরমপন্থী রাজনীতির নূতন আদর্শ হইল।" এই আদর্শ বুকে নিয়েই চিত্তরঞ্জনের রসারোডের বাড়িতে সেদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল 'স্বদেশীমণ্ডলী'। এর নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল।

কাশী-কংগ্রেস উনিশশো পাঁচের ঘটনা।

এই কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে।

শিক্ষাব্রতী, ত্যাগীপুরুষ ও দেশসেবক এই মহারাষ্ট্রের সন্তান গোখলের বাঙালি-প্রীতি সুবিদিত। রাজনীতিতে নরমপন্থী হলেও দেশপ্রেমে তিনি কারো চেয়ে কম ছিলেন না। কিন্তু চরমপন্থী নেতা অরবিন্দ কেন যে গোখলের উপর বিরূপ ছিলেন এবং কেনই বা তিনি তাঁকে বিভীষণ অর্থাৎ দেশদ্রোহী আখ্যায় আখ্যায়িত করেছিলেন তা বুঝে ওঠা কঠিন। এইজন্যই তো অরবিন্দ-চরিত্র এমন জটিল।

কিন্তু সে কথা থাক। কাশী-কংগ্রেসে সভাপতি মঞ্চ থেকে গোখেল বাঙালির স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন, অভিনন্দিত করলেন—এমন কি, তিনি একথাও বললেন যে, "শুধু বাংলা কেন, সমগ্র ভারতে ইহা চলিতে পারে—সমগ্র ভারত ইহা গ্রহণ করিতে পারে।" কিন্তু তিনি বয়কট-নীতি সমর্থন করেন নি ; বলেছিলেন—এর মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও আক্রোশ আছে অতএব কংগ্রেস এই বয়কট-প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে না। তবে সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেছিলেন যে, "বয়কট সমস্ত ভারত গ্রহণ না করিলেও ভারতের সকল প্রদেশই বাঙালিদের পশ্চাতে আছে।" বরোদায় বসে, আমরা অনুমান করতে পারি, অরবিন্দ গোখলের এই বক্তৃতা নিশ্চয়ই পাঠ করে থাকবেন এবং ইহাও সহজে অনুমেয় যে এই বক্তৃতা তাঁর মনের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ স্বদেশীমণ্ডলীর কয়েকজন চরমপন্থী নেতা উপস্থিত ছিলেন আর উপস্থিত ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন যাতে সর্বভারতীয় 'ইস্যু' হিসাবে গৃহীত হয়, নেপথ্য থেকে তিনি সেই চেষ্টা করেছিলেন। কাশী-কংগ্রেসের গুরুত্ব এইখানে যে, এই অধিবেশনেই আমরা বাংলার চরমপন্থী আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করি আর সুরেন্দ্রনাথের বিবরণ অনুসারে, এই কংগ্রেসেই কিছু আপত্তি সত্ত্বেও বাংলার বয়কট বৈধ বলে গৃহীত হয়েছিল।

কাশী-কংগ্রেসে আর একজন নেতা উপস্থিত ছিলেন। তিনি লালা লাজপৎ রায়। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তিনি প্রকাশ্যে বাংলার স্বদেশী মণ্ডলীকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায়, "এই চরমপন্থী স্বদেশী-মণ্ডলী বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষে ভারতবর্ষে একটা নূতন রাজনৈতিক যুগ প্রবর্তন করিয়াছে। সেদিক দিয়া লর্ড কার্জন বাংলার উপকারই করিয়াছেন। বাঙালিকে লোকে ভীরু বলিত, এখন বাঙালি যে সাহস দেখাইতেছে, অন্য প্রদেশের তা অনুকরণীয়।" কাশী-কংগ্রেসের এই বিবরণও নিশ্চয়ই বরোদায় গিয়ে পৌঁছেছিল। এই কংগ্রেসে বরোদার মহারাজার সঙ্গে তাঁর নব-নিযুক্ত রাজস্ব-সচিব এবং প্রাক্তন কংগ্রেস-সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত উপস্থিত ছিলেন। মডারেট রমেশচন্দ্র স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন কংগ্রেসের চিরাচরিত আবেদন-নিবেদন নীতির স্থলে এবার উঠেছে একটা নতুন সুর। এখন থেকে কংগ্রেস নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথে পদক্ষেপ করতে উদ্যত হবে। ঘটনা-বহুল উনিশশো পাঁচের অন্তিম লগ্নে কংগ্রেসের ভিক্ষাবৃত্তি শুধু ধিকৃত হলো না, একেবারে বর্জিত হলো।

এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা 'প্যাসিভ রেসিসট্যান্সের' প্রবক্তা ছিলেন অরবিন্দ। কথিত আছে, চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে যখন স্বদেশীমণ্ডলী ভূমিষ্ঠ হয় তখন বরোদা থেকে

তিনি জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্রের কাছে এই বিষয়টি ব্যক্ত করে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন এবং তারই ভিত্তিতে তিনি পরে রচনা করেছিলেন তাঁর সেই স্মরণীয় রাজনৈতিক পুস্তিকা—'নো কম্‌প্রোমাইজ' যা পাঠ করে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ চমকে উঠেছিলেন। একদিন 'বেঙ্গলি' পত্রিকার অফিসে এসে তাঁর টেবিলে তিনি ঐ পুস্তিকাখানি দেখতে পান ও আদ্যন্ত পাঠ করে মুগ্ধ হন—মুগ্ধ হন লেখকের লিপিকুশলতা ও ইংরেজি রচনায় দক্ষতা দেখে। পুস্তিকায় লেখকের নাম ছিল না—নামের কাঙাল অরবিন্দ কোনদিনই ছিলেন না। তাই বাংলাদেশে দুই-একজন ব্যতীত তখন বিশেষ কেউ জানতেই পারেনি যে, 'নো কম্‌প্রোমাইজ' পুস্তিকাটির লেখক কে? এর থেকেই আমরা জানতে পারি যে, বরোদায় বসে অরবিন্দ যোগসাধনার সঙ্গে সঙ্গে উনিশশো পাঁচের বাংলার উপর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্বদা নিবদ্ধ রেখেছিলেন, জাগ্রত বাংলার প্রাণস্পন্দন তিনি বরোদায় বসে গভীরভাবেই অনুভব করেছিলেন। তাঁর মন ও মস্তিষ্ক একই সঙ্গে বহু বিষয়ের চিন্তা করতে সক্ষম ছিল। এই যুগমানবের স্বাতন্ত্র্য এইখানেই।

॥ ছাব্বিশ ॥

শুরু হলো ইংরেজি নববর্ষ—১৯০৬ সাল।

বাংলার প্রাণ প্রবাহ যেন ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে এইবার সেই প্রবাহ ভীম গর্জনে বয়ে যাবে।

ঈশানের হাতে প্রলয় বিষাণ এবার বেজে উঠবে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত করে।

স্বদেশী বাংলার বুকে এবার ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করবে শিবের তাণ্ডব নৃত্য।

নতুন ইতিহাস রচনা করবে বাঙালি এই ইংরেজি নববর্ষে।

আর সেই ইতিহাসের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন এক নতুন নায়ক।

তিনি অরবিন্দ ঘোষ।

ইতিহাসের গতিপথেই আমরা নিরীক্ষণ করব অরবিন্দের জীবনের গতিমুখ।

কারণ এই সময় থেকে চার বৎসরকাল যে ইতিহাস তার কেন্দ্রপুরুষ ছিলেন তিনিই—তাঁকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছিল এই চার বছরের ইতিহাসের নানা আবর্ত। স্বজাতিকে 'অগ্নি ও রক্ত স্নানে' পরিশুদ্ধ করবার ব্রত নিয়ে তিনি বাংলাদেশে এলেন ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে। অরবিন্দের আগমনী বেজে উঠল 'সন্ধ্যার' পৃষ্ঠায়। তাঁর আভ্যুদয়িক রচনা করলেন স্বয়ং বিপিনচন্দ্র পাল। তিনি লিখলেন: "ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে বয়সে তরুণতম হলেও অবদানে, শিক্ষায় এবং চরিত্রে হয়তো তাঁদের সকলের জ্যেষ্ঠ—অরবিন্দ যেন বিধাতারই চিহ্নিত পুরুষ, যাঁকে এই আন্দোলনে এমন এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে যা তাঁর অন্য কোনো সহকর্মী বা সমসাময়িকের অদৃষ্টে লেখা নেই। তাঁর একমাত্র ধ্যান হলেন দেশ জননী। তাঁকে তিনি মা বলেই উল্লেখ করেছেন সর্বদা। যে জাতীয়তা আর দশজনের কাছে বড় জোর মানসিক বিলাস কিংবা নিম্নতমরূপে যা রাজনৈতিক হট্টগোল এবং আকাঙ্ক্ষা, সেই জাতীয়তাই অরবিন্দের কাছে আত্মারই এক উন্মাদনা-বিশেষ। জাতীয়তাবাদী আদর্শের শক্তি ও তাৎপর্য অরবিন্দের মতো গভীরভাবে খুব কম লোকেই হৃদয়ঙ্গম করেছে।"

আর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর 'সন্ধ্যায়' লিখলেন: "অমল-শুভ্র অরবিন্দ দেখিয়াছ কি? ভারত মানস-সরোবরের প্রস্ফুটিত শতদল! এ ফিরিঙ্গীর আঁদাড়ে পাঁদাড়ের লিলিড্যাফোডিল নহে। নির্গন্ধ! শুধু রঙের বাহার! কেবল বর্ণ-বিলাস!! দেবতার পূজায় লাগে না। যাগ-যজ্ঞে অনাবশ্যক। শুধু সাহেব বিবির সাহেবিয়ানার

আড়ম্বর !! আমাদের এই অরবিন্দ জগৎ-দুর্লভ। হিমশুভ্র বর্ণে সাত্ত্বিকতার দিব্যশ্রী। বৃহৎ ও মহৎ। হৃদয়ের প্রখরতায় বৃহৎ—হিন্দুর স্বধর্ম মহিমায় মহৎ। এমন একটা গোটা ও খাঁটি মানুষ—এমন বজ্রের মতো বহ্নিগর্ভ, কমল-পর্ণের ন্যায় কান্ত-পেলব এহেন জ্ঞানাঢ্য, এমন ধ্যান-সমাহিত মানুষ তোমরা ত্রিভুবনে খুঁজিয়া পাইবে না। দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য ইনি ফিরিঙ্গী-সভ্যতার মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া, ইহলোকের সুখ-সাধ বিসর্জন দিয়া মায়ের ছেলে অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রের সম্পাদনায় ব্রতী হইয়াছেন। ইনি ঋষি বঙ্কিমের ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ স্বামী।...বিলেতে লেখাপড়া শিখিলেও বিলেতী অবিদ্যার পূতনা-মায়া অরবিন্দকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। অরবিন্দ শরতের সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো আপনার স্বদেশের স্বধর্ম ও সভ্যতার মহিমায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়া জননী-জন্মভূমি শ্রীচরণপদ্মে শ্রদ্ধার্ঘ্যের মতো শোভা পাইতেছেন।"

অরবিন্দের বাংলায় আগমন ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তরের সূচনা।

দেশসেবা তাঁর জীবনের ব্রত। বরোদায় এসে অবধি তিনি নীরবে সেই ব্রতসাধনে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। নীরব কর্মী অরবিন্দ, নীরবে কাজ করাই তাঁর প্রকৃতি। সমুদ্রের গভীর তলদেশে সকলের অগোচরে যেমন প্রবাল দ্বীপ তৈরি হয়, তেমনি তাঁর অন্তরের গভীর তলদেশে সকলের অলক্ষ্যে যে মহাপ্রস্তুতি নিয়ত চলছিল, স্বদেশী আন্দোলন যেন তাকেই অবারিত করে সকলের সামনে তুলে ধরলে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছিলেন এমন একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা—অধুনা পরলোকগত অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ—যথার্থই লিখেছেন: "শ্রীঅরবিন্দ দৃঢ়নিষ্ঠ সাধনার দ্বারা নীরবে অধ্যাত্মশক্তি সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি কখনো সাময়িক জয়গানের চাপে পথভ্রষ্ট হন নাই। শ্রীঅরবিন্দকে তখন যে দেখিল সেই বুঝিল যে, ইনি ভগবৎ-প্রেরিত. ভগবানের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে বুঝিলাম যে, বহুকাল ধরিয়া বাংলাদেশ যে নেতার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল এতদিনে তিনি আসিয়াছেন। তাঁহার নিকটে আমাদের অদেয় কিছুই নাই। তাঁহার হস্তে বাংলা তথা ভারতের সম্মান ও স্বার্থ নিরাপদ থাকিবে।"*

জাতির এই প্রত্যাশা অনেক পরিমাণেই পূর্ণ হয়েছিল।

বরোদা ত্যাগ করে কলকাতায় আসার অল্পদিন পূর্বে বাংলার বিপ্লবীদের মৃত্যুভয়হীন করে তোলার উদ্দেশ্যে অরবিন্দ 'ভবানী মন্দির' নাম দিয়ে ইংরেজিতে পনর-ষোল পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা রচনা করেন ও সেটি কনিষ্ঠ সহোদরের মাধ্যমে

---

* 'লাইফ ওয়ার্ক অব শ্রীঅরবিন্দ': জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।

কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। দ্বিতীয় পর্বের গুপ্তসমিতির বনিয়াদটা যাতে দৃঢ় হয়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এটি লিখে থাকবেন। পরে এর একটি বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। এই পুস্তিকাটি পাঠে জানা যায় যে, "ভারতবর্ষের কোন এক দুর্ভেদ্য মনোরম স্থানে এইরূপ মন্দির স্থাপনের পরিকল্পনা অরবিন্দ ১৯০৬ সালের প্রথমে বরোদা থাকিতেই করিয়াছিলেন।" পুস্তিকাটি আরম্ভ হয়েছে একটি স্তব দিয়ে; স্তবটি শক্তিমূর্তি ভবানীর উদ্দেশে বিরচিত। বিপ্লবে বা সন্ত্রাসবাদে যাঁরা অংশ গ্রহণ করবেন, মা ভবানীর কাছে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের দীক্ষা নিতে হবে। তবেই না অগ্নি ও রক্তস্নানে পরিশুদ্ধ হওয়া যাবে। যাঁরা বলেন অরবিন্দ বিদেশী আদর্শের অনুকরণে বাংলায় বিপ্লববাদ এনেছিলেন তাঁরা ঠিক কথা বলেন না। অরবিন্দের মধ্যে অনুকরণ নেই। তাঁর সকল কার্য, সকল চিন্তা মৌলিকতায় ভাস্বর। এইখানেই অনেকে তাঁকে ভুল বুঝেছেন এবং অন্যকে ভুল বুঝিয়েছেন।

'ভবানী মন্দির' গুপ্তসমিতির বেদ। তাই এর থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম:

"যত গভীর ভাবে দেখি ততই উপলব্ধি করি যে আমাদের যা নাই, যা আমাদের সর্বাগ্রে অর্জন করা উচিত তা শক্তি—শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি, নৈতিক শক্তি এবং সবার উপরে সকল জিনিসের অন্তহীন ও অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক শক্তি। যদি শক্তি পাই তবে অন্য সব জিনিস সহজে আপনিই আসিবে।

"আমাদের মধ্যে অনেকে একান্ত তমোগ্রস্ত হইয়া ঘোরকায়, স্থূলভার আলস্য-অসুরের কবলিত হইয়া আজকাল বলিতেছেন—ইহা অসম্ভব, ভারতবর্ষ জরাজীর্ণ রক্তশূন্য ও প্রাণশূন্য, এত দুর্বল যে আর কখনো উঠিতে পারে না, জাতি হিসাবে আমাদের নির্ঘাত মৃত্যু। ইহা অর্থহীন প্রলাপ। নিজে ইচ্ছা না করিলে কোন মানুষ বা জাতি দুর্বল হইতে পারে না, নিজে স্বেচ্ছায় না চাহিলে কোন মানুষ বা জাতির মৃত্যু হয় না।

"কারণ দেশ বা জাতি কি? আমাদের মাতৃভূমি কি? তা শুধু একখণ্ড ভূমি নয়, একটা ভাষার অলঙ্কার নয়, মনের কল্পনা নয়। তা এক মহাশক্তি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যত ব্যষ্টি দিয়া দেশ গঠিত তাদের সকলের মিলিত শক্তি, যেমন মহিষমর্দিনী ভবানী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন একতাবদ্ধ অগণিত দেবতাদের অভিন্ন বিশাল শক্তি-সংহতি হইতে। যে শক্তিকে বলি ভারতবর্ষ, ভারতী ভবানী, তাহা ত্রিশ কোটি লোকের একত্রবদ্ধ জীবন্ত শক্তি।

"শক্তি, আরো শক্তি, আরো আরো শক্তি—আমাদের জাতির প্রয়োজন ইহাই। কিন্তু যদি শক্তি চাই তবে শক্তিময়ী মায়ের পূজা না করিলে তাহা

কিরূপে পাইব? তিনি নিজের জন্য পূজা চান না, চান যাহাতে আমাদের সাহায্য করিতে পারেন, নিজেকে আমাদের কাছে ধরিয়া দিতে পারেন। ইহা কোন অসম্ভব কল্পনা নয়, কোন কুসংস্কার নয়, বরং বিশ্বের সাধারণ নিয়ম। মা ভবানী কে? বিশ্বের ও তোমাদের মধ্যে যিনি শাশ্বত তাহা হইতে উদ্ভূত অনন্ত শক্তি তিনি। তিনি বিশ্বজননী, সর্বলোকের মাতা। তোমরা যাহারা এই পুণ্যস্থান আর্যভূমির মৃত্তিকায় গঠিত, তাহার সূর্যালোকে ও বাতাসে পুষ্ট—তোমাদের কাছে তিনিই ভবানী ভারতী—ভারতমাতা। তবে এস, মায়ের আহ্বান শুন।...দূরে সরিয়া থাকিও না। যাহারা তাঁহাব আগমনের পথ এতটুকুও সুগম করে তাহাদের প্রতি জননী ফিরিবেন, তাঁহার জ্যোতিরুদ্ভাসিত সুস্মিত আননে।"

এ যেন অরবিন্দের কণ্ঠে বিবেকানন্দের বাণী।

এই শতাব্দীকে স্পর্শ করে ইহলোক থেকে বিদায় নেবার পূর্বে স্বামীজি মেঘমন্দ্র স্বরে তাঁর স্বজাতিকে যেভাবে ও যে ভাষায় শক্তির সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছিলেন, অরবিন্দের 'ভবানী মন্দিরে' আমরা তারই প্রতিধ্বনি শুনলাম। অনুশীলন সমিতির প্রবর্তক প্রমথনাথ মিত্র স্বয়ং স্বামীজির আশীর্বাদ নিয়ে বাংলার যুবকদের মধ্যে শক্তির অনুশীলন শুরু করে দিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় স্তরে যখন অরবিন্দ এর সঙ্গে সংযুক্ত হলেন তখন তিনি সর্বাগ্রে শক্তির উদ্বোধন করে এবং শক্তিময়ীর পূজায় সকলকে আহ্বান জানিয়ে জাতির স্তিমিত চেতনায় যে অগ্নিবীর্যের সঞ্চার করে দিয়েছিলেন তার ফল যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল ইতিহাসই তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে।

শক্তির কৃপা না হলে কিছুই হবে না।

অভীঃ মন্ত্রের সাধনা ভিন্ন উত্থানের পথ নেই।

বিবেকানন্দের এই দৃপ্ত ঘোষণা জাতিকে নতুন করে শোনালেন অরবিন্দ।

অরবিন্দ নিঃসন্দেহে বিবেকানন্দের উত্তরসাধক।

নিবেদিতার দৃষ্টিতে এই সত্যটা ধরা পড়েছিল বলেই না তিনি বরোদায় ছুটে গিয়েছিলেন ভারতের নিদ্রিত শিবকে জাগ্রত করবার জন্য—ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিকে প্রদীপ্ত করে তুলবার জন্য। ভারতের নবজাগরণে শক্তির লীলাকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। অরবিন্দের চিন্তায় আমরা তারই অনুবর্তন লক্ষ্য করে বিস্মিত হই। তা ছাড়া, আরো একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। স্বামীজির মতো অরবিন্দও দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক—তিন রকম শক্তির উপরেই জোর দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে সফলকাম হওয়ার জন্য এই তিন প্রকার শক্তিরই একান্ত প্রয়োজন। নির্বীর্যের স্বাধীনতা লাভ হয় না—

বিবেকানন্দের এই তত্ত্বটাকেই অরবিন্দ যেন তাঁর 'ভবানী মন্দিরে' আরো পরিস্ফুট করে তুললেন।

স্বদেশী আন্দোলনের কণ্ঠ আশ্রয় করে দেশ-জননী তাঁর আকুল আহ্বান পাঠালেন বরোদায় অরবিন্দের কাছে। তাঁর ধ্যানের আসন থেকে সে আহ্বানে সাড়া দিলেন তিনি। ন্যাশনাল কলেজের ভার নেবার জন্য বাংলার জননায়কদের কাছ থেকে অনুরোধ এলো তাঁর কাছে। আবার সেই একই সময়ে নিবেদিতার কাছ থেকেও অনুরোধ এলো—বাংলায় বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে। আপনি আসুন—আপনি ছাড়া বিপ্লব-রথের সারথি আর কে হবে? দুইটি অনুরোধই গ্রহণ করলেন অরবিন্দ। যুগপৎ এমন দুটি কঠিন কাজের দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা একমাত্র তাঁরই ছিল। তিনি বুঝলেন, এইবার বন্দরের কাল শেষ হলো, দরিয়াতে নৌকো ভাসাতে হবে। বাংলা তাঁকে টানছে—সাপুড়িয়া যেমনভাবে মারণ-মন্ত্রের সাহায্যে সাপকে টানে—ঠিক সেই ভাবেই নবজাগ্রত বাংলা—দ্বিধা খণ্ডিত বাংলা আজ আকর্ষণ করল অরবিন্দকে। রাজ কলেজের সহ-অধ্যক্ষের সম্মানিত পদে তখন তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। বেতনও প্রচুর। নির্দ্বিধায় ইস্তফা দিলেন সেই লোভনীয় চাকরিতে।

তাঁর পদত্যাগ-পত্রখানি পেযে মহারাজা তো অবাক।

তাঁকে নিয়েই তো বরোদা রাজ্যের অর্ধেক গৌরব। মনে পড়ল সেদিনের কথা যেদিন তিনি বিলাত থেকে অরবিন্দকে নিযে ভারতে ফিরলেন। প্রাসাদে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হযে সযাজীরাও রাজমাতাকে বলেছিলেন যে, ওদেশ থেকে তিনি নিযে এসেছেন একটি মহামূল্য রত্ন—যা বরোদার রাজ-ভাণ্ডারেও নেই। সেই রত্নকে আজ হারাবার আশঙ্কায় মহারাজা স্বভাবতই একটু ম্রিয়মাণ হলেন যখন তাঁর হাতে এলো তাঁর কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের পদত্যাগপত্র। ডেকে পাঠালেন তিনি তাঁকে। অরবিন্দ তাঁর কর্মচারী মাত্র ছিলেন না—তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে মহারাজার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন।

—আপনি চাকুরি ছেড়ে দিচ্ছেন কেন?

—দেশের ডাক এসেছে। সেখানে একটা ন্যাশনাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। আমাকে সেই কলেজের দায়িত্ব নিতে হবে।

—দরকার হয় কিছুদিন ছুটি নিয়ে যান—একমাস, দু'মাস কি ছ'মাস পুরো বেতনেই ছুটি নিন, কিন্তু—

—কিন্তু কিছু নেই। আমি আমার কর্তব্য স্থির করেছি।

—যদি আপনাকে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল করে দিই।

—প্রধান অমাত্যের পদ দিলেও নয়।

—আপনার এই বিরাট লাইব্রেরী ?

—আপনার এখানেই থাক। ওটা আমি কলেজকে দান করে গেলাম।

মহারাজা বুঝলেন, এঁকে আর বেঁধে রাখা যাবে না। তাই তিনি আর বেশি পীড়াপীড়ি করলেন না। মহারাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, কলেজের সহকর্মী ও ছাত্রদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অরবিন্দ বাংলায় ফিরলেন ১৯০৬-এর এপ্রিলে। ষোড়শোপচারে মাতৃপূজার আয়োজন করে বাংলার নেতৃবৃন্দ তখন যেন অপেক্ষা করছিলেন শ্রেষ্ঠ পুরোহিতের জন্য। বাংলায় অরবিন্দের আসা এই প্রথম নয়—বরোদা থেকে তিনি এর আগে কতবারই তো এসেছেন। কিন্তু সে-আসা ছিল পূজাবকাশে আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আর শেষের দিকে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য। কাজেই বাংলার সাধারণের কাছে তাঁর পরিচয় তখন অনেকটা রহস্যাবৃত ছিল বললেই হয়—অনেকে তাঁর নামই শুনেছে, কিন্তু তাঁকে কখনো সামনা-সামনি দেখে নি। তাই তাঁর নামটিকে ঘিরে তখন থেকেই বাংলা দেশে একটা কিংবদন্তী তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তাঁর আসা ঠিক সাধারণভাবে আসা নয়—আগমন।

অরবিন্দের আগমন—সে যেন এক মহাশক্তির আবির্ভাব।

অথচ মানুষটিকে দেখলে কে বলবে তাঁর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে শক্তির একটা আগ্নেয়গিরি। সাজসজ্জার আড়ম্বর নেই—পরনে দেশী ধুতি, তাও মিহি নয় মোটা, গায়ে বোতাম-খোলা সার্ট, পায়ে সাধারণ জুতো—কোথাও কোন চটক নেই। অথচ একবার দেখলেই মন বলে উঠবে ইনি যেন "একটা গোটা ও খাঁটি মানুষ।" শহরের একটা গলিতে একটা ছোট্ট বাড়িতে 'যুগান্তর' কাগজের অফিস। সেইখানে এসে উঠলেন অরবিন্দ। ছেলেরা এলো দলে দলে। প্রণাম করলো তাঁর পায়ে হাত দিয়ে। মৃদু হেসে অরবিন্দ আশীর্বাদ করলেন তাদের মাথায় হাত দিয়ে। নেতারা এলেন কিছু আলাপ-আলোচনা হলো।

আগেই বলেছি, কলকাতায় আসবার আগে তিনি বারীন্দ্রের হাত দিয়ে ভবানী মন্দিরের পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং একখানা বাংলা কাগজ প্রকাশের উদ্যোগ আয়োজন করার নির্দেশও তিনি কনিষ্ঠ সহোদরকে দিয়ে থাকবেন। কারণ আমরা দেখতে পাই যে বারীন্দ্র এবার কলকাতায় একাই তাঁর সেজদার নির্দেশ মতো একখানি বাংলা কাগজ বের করবার জন্য উঠে-পড়ে লাগেন। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মুখে যুগান্তর কাগজের জন্মকথা যেমনটি শুনেছিলাম তাই এখানে বিবৃত করছি। "কাগজের নাম শ্রীঅরবিন্দই ঠিক করে দিয়েছিলেন এবং এর প্রথম সম্পাদক কাকে করা হবে তাও তিনি বারীনকে

দিয়ে আমাদের বলে পাঠিয়েছিলেন। আরো নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এই ব্যাপারে আমরা যেন সিস্টার নিবেদিতার পরামর্শ মতো কাজ করি যতদিন না তিনি বরোদা থেকে এখানে আসছেন। তখন নতুন দলের কাগজ বলতে ছিল উপাধ্যায় মহাশয়ের 'সন্ধ্যা'। শ্যামসুন্দর, বিপিনচন্দ্র এঁরা সবাই 'সন্ধ্যার' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। টাকার প্রশ্নটা যখন বড় হয়ে দেখা দিল তখন সিস্টার নিবেদিতা তার কিছুটা সমাধান করে দিয়েছিলেন। শ'তিনেক টাকা তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করে এনে বারীনের হাতে একদিন দিয়ে গেলেন। তখন বারীনও কার কাছ থেকে শ'খানিক টাকা সংগ্রহ করেছিল। মোট এই চারশো টাকার মূলধন নিয়ে আমরা 'যুগান্তর' কাগজ আরম্ভ করি। ডক্টর ভূপেন দত্ত এর প্রথম সম্পাদক হন। উপেন বাঁড়ুয্যে পরে এসে যোগদান করেন। আমি ছিলাম কাগজের ম্যানেজার। 'যুগান্তর' বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। যতদূর স্মরণ হয়, প্রথম সংখ্যাতেই শ্রীঅরবিন্দের 'আমার রণনীতি' নামে একটা রচনা ছিল। মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিল বারীন। তবে তাতে লেখকের নাম ছিল না।"

'যুগান্তর' পত্রিকার জন্মকথা বারীন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন: "১৯০৬ মার্চ মাসে আমি ও অবিনাশ চাঁপাতলা ২৭নং কানাইলাল ধর লেনের বাড়িখানা ভাড়া নিয়ে যুগান্তর অফিস খুলে বসলাম। দেবব্রতের ও আমার লেখা সম্বল করে প্রথম সংখ্যা যুগান্তর প্রেসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পত্রাকারে একটি উত্তেজনাপূর্ণ আবেদন কয়েকটি জেলা-কেন্দ্রে চলে গেল। বাংলার প্রথম বৈপ্লবিক মুখপত্র প্রকাশের সহায়তার জন্য যথাসময়ে প্রথম সংখ্যা যুগান্তর বের হলো এবং আমাদের জানিত বন্ধু-বান্ধবের কাছে কাগজ পাঠানো হলো। হঠাৎ অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতুর মতো যুগান্তরের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমন অভূতপূর্ব।"

এর ঠিক এক বছর আগে বেরিয়েছে উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা'।

এর পাঁচ মাস পরে আমরা প্রত্যক্ষ করব ইংরেজি 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার আবির্ভাব।

'যুগান্তর'কে যদি বিপ্লবের প্রথম মুখপত্র বলা হয়, তবে 'বন্দেমাতরম্' নিশ্চয়ই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মুখপত্র। দুটি কাগজই ছিল অরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ধারক, বাহক ও প্রচারক। অরবিন্দের জীবনেতিহাসেও দেখা যায় যে, আগে তিনি বিপ্লব ও বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির কথা চিন্তা করেছেন, পরে চিন্তা করেছেন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তিনি বিপিনচন্দ্রের অনুগামী, আর প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে অর্থাৎ বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির প্রবর্তনে তিনিই ছিলেন সকলের চেয়ে অগ্রগামী। দুটি জিনিস, বিচার করে দেখলে মনে হবে, আদৌ এক বস্তু নয়। "ইহা দুই পৃথক

বিপরীত বস্তু।" প্রশ্ন—"এই দুই বিপরীত বস্তুর সমন্বয় অরবিন্দের জীবনে কি করিয়া হইল ?" এর উত্তর আমরা দেখতে পাব তাঁর অদ্ভুত ও জটিল জীবনের বিকাশপথে।

বাংলার কর্মক্ষেত্রে নামলেন অরবিন্দ।

তিনি দেখলেন আন্দোলন শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু দেশের মধ্যে যাঁরা জাগ্রত, শিক্ষিত, তারা ইংরেজ-শাসনের পরিণাম সম্বন্ধে তখনো ভ্রান্ত। দেখলেন জাতীয় কংগ্রেস নামেই মাত্র কংগ্রেস। জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্যস্বরূপ স্পষ্ট কোন ধারণাই যেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের নেই। তাঁদের দ্বারা ভারতের মুক্তি হতে পারে না। পরাধীন জাতিকে নিজের চেষ্টায় মুক্তি অর্জন করতে হবে। তিনি আরো দেখলেন—বাঙালি চিন্তা না করে কাজ করে, আর কাজ আরম্ভ করে তা শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন না করেই মাঝ পথে থেমে যায়। বক্তৃতার তুবড়ি ফুটিয়ে জনতার হাততালি পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে প্রকৃত কাজ কিছুই হয় না। বাক্‌বিভূতিসম্পন্ন প্রবীণ নেতারা এমন কথা শুনে রীতিমতো হতবাক্ হয়ে গেলেন।

অরবিন্দ বললেন, দরকার দুটি জিনিস। প্রথম—কর্তব্য ও আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আর রাজনৈতিক কর্ম। যেমন তেমন কর্মী হলে চলবে না—চাই বীর কর্মী, যাঁরা সজ্ঞানে তাঁদের জীবন মায়ের কাছে বলি দিয়েছেন—সেই রকম লোকই এখন দরকার।

এমন নতুন কথা বাঙালি এর আগে শোনে নি।

আন্দোলনের রূপটাই যেন পরিবর্তিত হবার উপক্রম হলো এইবার।

আর উত্তেজনার আগুন পোয়ানো নয়।

আবেদন-নিবেদনও নয়।

গলাবাজিও নয়। ওসব অনেক হয়েছে। এখন কাজের সময়। লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র হয়ে, জাতিকে এবার কাজে নামতে হবে। বাংলার জাতীয়তাবাদী নবীন দল অরবিন্দকে নেতৃত্বে বরণ করে নিলেন। কিন্তু নেতৃত্বের জন্য তিনি কোনকালেই ব্যগ্র ছিলেন না। নীরবে, পিছনে থেকে কাজ করাই ছিল তাঁর চিরকালের প্রকৃতি। বরোদায় থাকবার সময় আত্মসমাহিত ভাবে দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন, কর্মক্ষেত্রে নেমে সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি পথ চলতে সংকল্প করলেন। আর এটাই ছিল তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

নামমাত্র বেতন নিয়ে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ হলেন অরবিন্দ।

কেমব্রিজের ট্রাইপস তিনি ; কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায়ও। আবার বহু ভাষাবিদ্‌ও তিনি। তবু প্রসন্ন মনে গ্রহণ করলেন একশো পঞ্চাশ টাকা বেতনের এই কর্মভার। বরোদায় পেতেন এর পাঁচগুণ। সেই

যুগে এতখানি ত্যাগ কেউ কল্পনা করে নি। উপাধ্যায় মিথ্যা বলেন নি যে, অরবিন্দ ঋষি বঙ্কিমেরই মানস সন্তান। বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ— এই বার্তা যখন সারা দেশে রটে গেল তখন দলে দলে ছাত্রেরা এসে ভর্তি হয় সেখানে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকেও ছাত্র এলো কলকাতার নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যায়তনে পড়বার জন্য। আবার অরবিন্দের ত্যাগে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক শিক্ষক এবং অধ্যাপকও এখানে এসে নাম মাত্র বেতনে অথবা বিনা বেতনে যোগদান করলেন। জাতীয় শিক্ষার নবতম আদর্শের ভিতর দিয়ে তিনি বাংলার ছেলেদের গড়ে তুলতে চাইলেন।

১৯০৬ সালের মার্চ মাসে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় আর এপ্রিল মাসেই অরবিন্দ এসে এখানে যোগদান করেন অধ্যক্ষরূপে। সুপারিনটেনডেণ্ট হলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। খুব বেশিদিন কিন্তু তিনি এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারেন নি, কারণ বাংলার রাজনীতি তখন তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছিল। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্ভবের মূলে কিন্তু ছিল আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি। প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার আদর্শ তিনিই প্রথম প্রচার করতে থাকেন তাঁর নিজস্ব 'ডন' পত্রিকায় এবং তার শিলান্যাস রচিত হয় তাঁর ডন সোসাইটির বেদীর উপরেই। সেই কারণে ন্যাশনাল কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর এর শিক্ষকমণ্ডলীর অন্যতম তিনিই ছিলেন এবং অরবিন্দ চলে আসার পর সতীশচন্দ্রই এর পরিচালনার গুরু দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে বহন করেন। অধ্যাপক বিনয়-কুমার সরকার মহাশয়ের কাছে লেখক একবার শুনেছিলেন যে, কলকাতায় এসে সতীশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হওয়ার পর অরবিন্দ নাকি সুবোধ মল্লিককে বলেছিলেন: "সুবোধ, এমন একজন মানুষ থাকতে তোমরা আমাকে অধ্যক্ষের পদে নির্বাচিত করে খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও নি। সতীশবাবুর মতো যথার্থ জ্ঞানবান ও দেশপ্রেমিক এবং ধার্মিক প্রকৃতির আর সাত্ত্বিক চরিত্রের মানুষ বাংলাদেশে আর কেউ আছেন কিনা জানি না।" 'ডন' সোসাইটির সভ্যরাই প্রথম সরকারী স্কুল-বর্জন করেছিলেন। শুধু বর্জন করা নয়—তাঁরা স্বদেশী প্রচারেও অংশ গ্রহণ করে সরকারের বিরূপভাজন হয়েছিলেন। কুখ্যাত 'কার্লাইল সার্কুলারের' বিরুদ্ধে ডন সোসাইটির ভূমিকা বিস্মৃত হওয়া কঠিন। সেদিন বিরোধী বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করে বাংলার ছাত্ররা যে আন্দোলন করেছিল তার মূল প্রেরণা জুগিয়েছিলেন সতীশচন্দ্র ও তাঁর ডন সোসাইটি। অতএব তাঁর সম্পর্কে অরবিন্দ যে এমন উচ্চ অভিমত প্রকাশ করবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মহৎ মানুষই মহৎ মানুষকে জানতে পারে ও বুঝতে পারে এবং অকপটে তাঁর মহত্ত্বের স্বীকৃতি দিতেও দ্বিধা করে না। বাংলাদেশে যে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতো মনুষ্যত্বের

একটি সবল বিগ্রহ আছেন, ইহা চাক্ষুষ করে অরবিন্দের মনে নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়েছিল—অবনত অবস্থায়ও বাংলা রত্ন-প্রসবিনী। অরবিন্দের পর আচার্য সতীশচন্দ্র ছিলেন ন্যাশনাল কলেজের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ; ইনি দুই বৎসরকাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিনিই এই কলেজের প্রথম অবৈতনিক অধ্যক্ষ।

ন্যাশনাল কলেজের প্রথম যুগের একজন ছাত্রের বর্ণনায় একটি সুন্দর চিত্র পাই। সেখানে নব-নিযুক্ত অধ্যক্ষ অরবিন্দকে তাঁর প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "দেখিলাম এক সৌম্যমূর্তি যুবক মধ্যকার হলঘরে উপবিষ্ট। একটি শার্ট গায়ে, তাহার উপরে চাদর।...তাঁর চক্ষু দুটি যেন বাহ্য জগৎ হইতে অন্তরের স্বরাজ্য-ভূমিতে অভিনিবিষ্ট। সেদিন শ্রীঅরবিন্দ অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিগণকে সম্বোধন করিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়াছিলেন। দেশীয় ও য়ুরোপীয় চরিত্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন—এই যে কর্মনিষ্ঠা ইহাই ইংরেজকে জগজ্জয়ী করিয়াছে। এই আসুরিক কর্মশক্তি যেদিন জাতীয় আধ্যাত্মিকতার সহিত সম্মিলিত হইবে সেদিন আমাদের জাতীয় চরিত্রের যে বিকাশ হইবে, তাহা হইবে জগতে অতুলনীয়।"

প্রকাশ্য রাজনীতিতে অরবিন্দের প্রথম প্রবেশ অথবা পদক্ষেপ যে ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করে সম্ভব হয়েছিল, ইতিহাসে তারই নাম বরিশাল কনফারেন্স। স্বদেশী আন্দোলনের একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচিত হয়েছিল বরিশালে অনুষ্ঠিত বা আয়োজিত প্রাদেশিক সম্মিলনীতে। এই কনফারেন্সের আনুপূর্বিক বিবরণ আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি*। কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এখানে প্রসঙ্গত বরিশাল কনফারেন্সের কথা সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করব। অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনেও এই কনফারেন্সের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ "এই অতিশয় শান্ত ও নীরব মানুষটি বরিশালে উপস্থিত হইয়া" যা দেখেছিলেন তাই-ই তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপকে ত্বরান্বিত করে দিয়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের একটি উজ্জ্বল অধ্যায় বরিশাল কনফারেন্স।

১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়।

এক বাংলা ভেঙে তখন দুই বাংলা হয়েছে। পূর্ববঙ্গের নতুন লাট ব্যামফিল্ড ফুলার, আর পশ্চিমবঙ্গের লাট এণ্ড ফ্রেজার। ফুলারী শাসনে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি নিষিদ্ধ হয়েছিল ঐ অঞ্চলে। এদিকে গঙ্গা, ওদিকে পদ্মা। তার দুই তীরে জেগে উঠেছে প্রাণ। বাঙালির প্রাণের জোয়ার পদ্মা ও গঙ্গার স্রোতের ধারায় মিশে বয়ে চলেছে শত ধারায় সারা বাংলার বুকের উপর দিয়ে। সে প্রচণ্ড স্রোত

* লেখকের 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

আইনের বাধা মানে না। সেই নবীন বাংলায় জেগে উঠেছে বরিশাল। অশ্বিনী-কুমার দত্তের বরিশাল। স্বদেশপ্রেমের পীঠস্থান বরিশাল। বিলাতি দ্রব্য বর্জনের অগ্নি পরীক্ষায় সেদিন বরিশালের নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। একটু নুন বা এক টুকরো বিলাতি বস্ত্র সেদিন এখানে ঢুকতে পারে নি। অশ্বিনীকুমারের আদেশই ছিল বরিশালের লোকের কাছে ভগবানের আদেশের মতো।

সেই বরিশালে হবে এবার প্রাদেশিক সম্মেলন।

সভাপতি বাঙালি মুসলমান রসুল সাহেব। ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল। বিলাতে অবস্থানকালেই তাঁর সঙ্গে অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জনের বন্ধুত্ব হয়েছিল। দীর্ঘকাল পরে রসুলের সঙ্গে অরবিন্দের সাক্ষাৎ হলো এখানে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অশ্বিনীকুমার দত্ত।

বাংলার স্বদেশসেবক শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সকলেই সেদিন এই সম্মেলনে যোগদান করতে এসেছিলেন। এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, কৃষ্ণকুমার, শ্যামসুন্দর, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রমুখ অনেকেই। আর এসেছিলেন অরবিন্দ। নেতারা সবাই কলকাতা থেকে স্টীমারে করে বরিশালে এসেছেন। কিন্তু কেউই মাটিতে নামছেন না; স্টীমারেই আছেন। বরিশালের নেতারা সুরেন্দ্রনাথের কাছে স্টীমারে গিয়ে বললেন—গোল বেধেছে। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কি? মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা তখন জানালেন—ব্যাপার গুরুতর। বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন যে, লাট সাহেবের আদেশ যেন লঙ্ঘন করা না হয়—রাজপথে শোভাযাত্রায় যেন কেউ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি না তোলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের এই কথায় অভ্যর্থনা সমিতি রাজীও হয়েছেন।

স্টীমারের ডেকের উপরেই নেতৃবৃন্দের একটা বৈঠক বসল। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি কানে না শ্রবণ করে তাঁরা মাটিতে কিছুতেই পদার্পণ করতে পারেন না। তখন সুরেন্দ্রনাথ বললেন—অভ্যর্থনার সময় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে কাজ নেই, পরে সভায় গিয়ে প্যাণ্ডেলের মধ্যে করলেই চলবে। এই আপোষে তাঁরা মাটিতে নামলেন। বরিশালে যেন বিস্ফোরণের অবস্থা, অশ্বিনীকুমারের একটু ইঙ্গিত পেলেই বিস্ফোরণ অনিবার্য ছিল। কনফারেন্সের নির্বাচিত সভাপতির গাড়ি আগে আগে চললো, পিছনে অন্য প্রতিনিধিদের গাড়ি। অকস্মাৎ তুমুল আওয়াজ ও চীৎকার শোনা গেল—লাঠির দমাদম শব্দ। পুলিশের গুলি। পিছনের প্রতিনিধিদের উপর নির্বিচারে বর্ষিত হচ্ছে পুলিশের লাঠি। রুখে দাঁড়ালেন বাংলার 'মুকুটহীন সম্রাট'—বর্ষিয়ান জননায়ক সুরেন্দ্রনাথ। কাছেই ছিলেন পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট কেম্প সাহেব। তিনি গর্জে উঠলেন—কেন মারছ? পুলিশ সুপার দ্বিরুক্তি না করে তাঁকে গ্রেপ্তার

করে সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিয়ে এসে হাজির করলেন। বিচারের প্রহসন হলো। কথা কাটাকাটি হলো। উদ্ধত ম্যাজিস্ট্রেট সুরেন্দ্রনাথকে ক্ষমা চাইতে বলেন। তিনি স্বীয় সংযত কণ্ঠে বলেন—কিসের জন্য ক্ষমা চাইব? আমি তো কোনো অন্যায় করি নি। তবু তাঁর চারশো টাকা জরিমানা হলো। জরিমানার টাকা দিয়ে তিনি আবার সভামণ্ডপে ফিরে এলেন।

ব্যাপার কিন্তু আরো গড়ালো।

পুলিশের লাঠির আঘাতে বরিশালের মাটি—আর সে মাটি বাংলারই মাটি—রক্তে লাল হয়ে উঠলো। মনোরঞ্জনবাবুর কিশোর পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে বর্বর পুলিশ লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত করে নিকটবর্তী একটি পুকুরের জলে তাকে ফেলে দেয়। সে দৃশ্য কল্পনা করলে শরীর আজো রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। মাথায় লাঠি পড়ে আর কিশোরের সতেজ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—বন্দেমাতরম্। মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পুত্রকে নিয়ে পিতা এলেন সভামণ্ডপে। বক্তৃতা মঞ্চে অন্য সকলের সঙ্গে উপবিষ্ট অরবিন্দ সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর ললাট নেত্রের আগুন যেন ধ্বক্ করে জ্বলে উঠলো। অন্তরের উত্তেজনা বাইরে প্রকাশ না করলেও তিনি এর জন্য দায়ী করলেন ফুলারী শাসনকে।

সম্মেলনে আর কোন কাজ হলো না। তার আর দরকারও ছিল না।

কাজ যা হবার তা হয়ে গেল। হঠাৎ পুলিশ সুপার সভায় এসে সভাপতি রসুল সাহেবকে বলেন—সভা ভঙ্গের পর তাঁরা যেন রাজপথে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি না তোলেন। রসুল সাহেব প্রতিবাদ করলেন। নেতারাও আপত্তি জানালেন। ক্রুদ্ধ পুলিশ সুপার সভা ভেঙে দিলেন। ইতিহাস-বিখ্যাত বরিশাল কনফারেন্সের ওপর এইখানেই যবনিকা পড়লো। কাব্যবিশারদদের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হলো :

"আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল লাঠির ঘায়
ঐ যে মায়ের জয় গেয়ে যায়।"

॥ সাতাশ ॥

বরিশাল থেকে অরবিন্দ কলকাতায় ফিরলেন।

সেখানে দুই চোখ দিয়ে তিনি যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাতে তাঁর বিপ্লবী মন স্তব্ধ হয়ে সেদিন সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তে কী যে সংকল্প করেছিল, কেউ তা জানতে পারে নি। সেই বিষম উত্তেজনার মধ্যে বড় বড় নেতারা সবাই পরম অহিংস ভাব অবলম্বন করেছিলেন। কেবল একটি অতি নিরীহ নীরব মানুষ সেদিন অহিংসভাব নিয়ে ঘরে ফেরেন নি। অরবিন্দ বুঝতে পেরেছিলেন, বরিশালে এই ফুলারী দমননীতিই বিপ্লবের ধূমায়িত আগুনকে শীঘ্রই প্রজ্জ্বলিত করে তুলবে। বরিশালের মাটিতে নিরীহ ও নিরস্ত্রের এই রক্তপাত ব্যর্থ হবার নয়।

ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাটা দিয়েছে যে, সকল দেশেই জাতির অগ্রগামী চিন্তা বিপদের ঝড়কে সঙ্গে করেই প্রবাহিত হয়। বাঙালির আট বৎসরব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে যেসব অগ্রগামী চিন্তা ছিল তার মধ্যে সন্ত্রাসবাদসূচক চিন্তাটি ছিল অন্যতম। এই আন্দোলনেরই অপরিহার্য পরিণতি ছিল সন্ত্রাসবাদ বা বিপ্লব। এমন কি বৈধ আন্দোলনের একনিষ্ঠ সাধক সুরেন্দ্রনাথ একথা বলতে দ্বিধা করেন নি যে, স্বৈরাচারী শাসনই বাংলাদেশে বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল। তাঁর আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন: "বাংলাদেশের কয়েকজন তরুণের মনে অলক্ষ্যে বৈপ্লবিক ভাবের আবির্ভাব হয়েছিল। অরাজকতা কেউই পছন্দ করে না। হত্যা যে উদ্দেশ্যেই সাধিত হোক না কেন কিংবা যে নামেই তা অভিহিত হোক না কেন—সব সময়েই ইহা এক গুরুতর অপরাধ সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সময়ে সরকারী দমননীতির ফলে দেশের তরুণ মনে যে অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের উদয় হয়েছিল ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের তা ভুললে চলবে না।"

মডারেট হলেও সুরেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য ছিল। তিনি বাঙালি। তাই বাঙালির স্বদেশী স্রোত থেকে তিনি নিজেকে দূরে রাখতে পারেন নি। অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। বিলাত থেকে এসে অবধি ভারতের রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি গভীরভাবে অনুধাবন করে এবং বিগত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান কাল পর্যন্ত ওই দশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনীতির প্রবাহ পথে পরিক্রমা করে ও এই সময়কার বিভিন্ন ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে তাঁর মনের মধ্যে এই ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, সাহস ও শক্তি

নিয়ে নির্ভীকচিত্তে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার দিন আগতপ্রায়। স্বাধীনতার মতো পরম বস্তু লাভ করতে হলে তার জন্য চরমমূল্য দিতে হবেই। মহারাষ্ট্রে যে তীব্র জাতীয়তাবাদকে আশ্রয় করে টিলকের নেতৃত্বে বৈপ্লবিক মনোভাবের উন্মেষ হয়েছিল, বাংলাকে সেই পথেই যেতে হবে—বরোদায় থাকতেই অরবিন্দ নিঃসংশয়-ভাবে এই সত্যটি উপলব্ধি করে থাকবেন। সহধর্মিণীকে লেখা চিঠিতেই তো এর সুস্পষ্ট আভাস আমরা দেখতে পাই।

অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ শ্রীঅরবিন্দকে 'দি ম্যান অব দি আওয়ার' বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর বলার কথা এই যে, ভারতীয় জাতিকে সার্থকতার পথে নিয়ে যাবার ভগবৎ প্রেরিত আন্দোলনে যুগনেতারূপে ইনিই এসে তাঁর যথাস্থানটি অধিকার করলেন। নবগঠিত জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে তিনি বাংলা দেশে এলেন বটে—কিন্তু সেটা ছিল উপলক্ষ্য, তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল জাতিকে 'রক্ত ও অগ্নিস্নানে' পরিশুদ্ধ করা—অর্থাৎ বিপ্লবের কণ্টকময় পথে বাংলার সেই তরুণদের পরিচালিত করা যারা জন্ম হতেই "মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।" বিবেকানন্দের চিন্তার মধ্যেও বিপ্লবের ইঙ্গিত ছিল। ছিল, তার প্রমাণ তাঁরই মানসকন্যা নিবেদিতা। বিবেকানন্দ-নিবেদিতা-অরবিন্দ—এই তিনটি হৃদয় থেকে নির্গত হয়ে বিপ্লবের অগ্নিস্রোত বাংলার কোমল মৃত্তিকায় প্রবাহিত হয়েছিল। তাই এই শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙালি তরুণ তাদের কণ্ঠে অভীঃ মন্ত্র নিয়ে যে দুঃসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছিল তার প্রেরণা এই তিনজনই। নিবেদিতা তাই তাঁরই গুরুর বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসাবে অরবিন্দের পাশে দাঁড়িয়ে সমানে কাজ করেছিলেন।

বরিশাল থেকে কলকাতায় ফিরে অরবিন্দ নিজেকে আর বেশি দিন জাতীয় কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত রাখতে পারলেন না। বুঝলেন অধ্যাপনার দিন এখন নয়—এখন কাজের সময়। আন্দোলন যেভাবে চলছে তাতে কতদূর অগ্রসর হওয়া যাবে, সে কথাটি তিনি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেন। স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা—এই চারদফা কর্মসূচী যথেষ্ট নয়। আঘাতের বিনিময়ে আঘাত ফিরিয়ে দেবার দিন এসেছে এখন। এই সময়ে একদিন সন্ধ্যায় জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হলেন অরবিন্দ। তাঁদের সবাইকে তিনি বোঝালেন, এখন যে রকম বিস্ফোরক অবস্থার মধ্যে আমরা এসে উপনীত হয়েছি, তাতে আমার মনে হয় নবজাতীয়তার এই প্রাণধর্মী আদর্শকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিতে হবে। কংগ্রেসের তোষণ-নীতির বিরুদ্ধে দেশের জাগ্রত রাজনৈতিক চেতনাকে আরো সংহত, প্রদীপ্ত ও আরো প্রবুদ্ধ করে তুলতে হবে। অরবিন্দের এই অভিমত সকলেই একবাক্যে অনুমোদন করলেন।

রাজনীতিতে পরিপূর্ণভাবে ঝাঁপ দেওয়ার ইচ্ছাটা ক্রমেই প্রবল হতে থাকে। এই সময়ে তিনি সাময়িকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কলেজ থেকে বার বার ছুটি নিতে বাধ্য হন। ১৯০৬-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯০৭-এর এপ্রিল—এই চার-পাঁচমাস কাল তিনি দেওঘরে অবস্থান করেছিলেন। এর মধ্যে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে দশটি দিন কলকাতায় কাটিয়ে যান। সে বছর (১৯০৬) কংগ্রেসের অধিবেশন কলকাতায় বসেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অরবিন্দ যখন বাংলা দেশে এসে জাতীয় কলেজের ভার গ্রহণ করেন, তার অল্প কিছু কাল পরেই বিপিনচন্দ্র পাল "বন্দেমাতরম্" নাম দিয়ে একটি নতুন ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার কথা বলার আগে প্রসঙ্গত আর একটি ঘটনার উল্লেখ করতে হয়।

সেটি হলো কলকাতায় টিলকের আগমন ও শিবাজী উৎসব।

এ হলো ১৯০৬ সালের জুন মাসের কথা।

বাংলাব স্বদেশী আন্দোলন তখন প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে।

লোকমান্যের আগমনে সেই অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল।

শিবাজী-উৎসবের সঙ্গে ভবানী পূজারও আয়োজন ছিল।

"টিলক-অরবিন্দ-বিপিনচন্দ্র-উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি চরমপন্থী নেতারা সেদিন প্রাণপণে যেরূপ জাতীয়তার বেদী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন," তা ছিল সত্যিই এক অভূতপূর্ব ঘটনা। বাংলার চরমপন্থী স্বদেশী-মণ্ডলীর উদ্যোগেই এই উৎসব ও পূজার আয়োজন করা হয় এবং তাঁরাই টিলক মহারাজকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। ৪ঠা জুন থেকে ১২ই জুন—এক সপ্তাহকালব্যাপী এই অনুষ্ঠান সেদিন মহানগরীর বুকে তুমুল প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছিল। ৫ই জুন পান্তির মাঠে সভা হলো—সভাপতিত্ব করলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। টিলক তাঁর বক্তৃতায় শক্তি পূজার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বললেন: "মা ভবানীকে চাই, তাঁর পূজাও চাই।" এ যেন অরবিন্দের কথারই প্রতিধ্বনি।

এর ঠিক দু'বছর আগে কলকাতায় টাউন হলে যখন প্রথমবার 'শিবাজী উৎসব' হয়েছিল, সেই উৎসবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'শিবাজী' কবিতাটি পাঠ করেছিলেন। তিনি যখন বক্তৃতামঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে দৃপ্ত মধুর কণ্ঠে পাঠ করলেন:

"মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজী'
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।"

তখন সভামধ্যে যে নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল, আজ টিলকের উপস্থিতিতে উৎসব সভায় সমাগত সকলের প্রাণে সেই একই উদ্দীপনার তরঙ্গ বয়ে গেল। এবারকার উৎসবের সঙ্গে একটি স্বদেশী মেলার আয়োজনও করা হয়েছিল। অপরাহ্নে টিলক মেলার উদ্বোধন করলেন। এই স্বদেশী মেলার বিবরণ সংবাদ পত্রে পঠে করে সারা ভারতবর্ষ সেদিন বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। উৎসবে ভবানী পূজার অনুষ্ঠানটিও সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। ভবানী মূর্তিটির গঠন পারিপাট্য দেখে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হলেন।

বরিশাল সম্মেলনের পর দেখা গেল বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনটি ধারা প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রথম—নিবেদিতা-অরবিন্দের বিপ্লবের ধারা; দ্বিতীয় ও তৃতীয়—নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষজাত ভিন্ন দুইটি ধারা। স্পষ্টই বুঝা গেল দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হয়ে চলেছে।—মডারেট ও এক্সট্রিমিস্ট—এই দুই দলের মতের ভিন্নতা ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সত্যের খাতিরে একটি অপ্রিয় কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার কয়েক মাসের মধ্যেই নেতাদের মধ্যে কর্মপদ্ধতি নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল; ক্রমশ সেই ভেদটা স্পষ্ট মনান্তরে পরিণত হলো। সংবাদপত্রে পরস্পর পরস্পরকে অভদ্রোচিত আক্রমণ শুরু করলেন—আক্রমণ বললে ভুল বলা হয়, খেউড় গাওয়া চললো। বরিশাল কনফারেন্স থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ বাংলার নরম ও চরমপন্থী দলের গৃহ-বিবাদ মেটাবার জন্য সচেষ্ট হলেন। এই সময় তিনি 'দেশনায়ক' নাম দিয়ে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন ও সেটি প্রকাশ্য একটি সভায় পাঠ করেন। তাঁর উদ্দিষ্ট দেশনায়ক তখন সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁকেই প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করে নেবার জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ করলেন কবি। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি অনেকেরই মনঃপূত হয় নি। কারণ, ইহা অনেকটা আধুনিক যুগের ডিক্টেটারসিপের পূর্বাভাষ।

এই সময়কার দলগত ভেদবিভেদের চিত্র আছে। সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী', কাব্যবিশারদের 'হিতবাদী', শিশিরকুমারের 'অমৃত বাজার পত্রিকা', কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি সংবাদপত্রও সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায়। এই আসরেই আমরা পাই চরমপন্থীদের চড়াসুরে বাঁধা 'সন্ধ্যা' 'যুগান্তর' ও 'নবশক্তি' পত্রিকা। শেষোক্ত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বরিশালের অন্যতম জননায়ক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। এই তিনখানি পত্রিকারই প্রচারের বিষয় ছিল বিপ্লব; তবে 'সন্ধ্যার' বিপ্লবাদর্শ ঠিক 'যুগান্তর' অনুসারী ছিল না। এই আসরেই চরমপন্থীদের

নতুন ইংরেজী মুখপত্র 'বন্দেমাতরম্' আবির্ভূত হলো ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে। ভারতবর্ষে সংবাদপত্র জগতের ইতিহাসে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে স্বীকৃত হবার দাবী রাখে। বস্তুত সমসাময়িক কালে 'কেশরী' ও 'বন্দেমাতরম্'—এই দুইখানি পত্রিকা জাতীয়তার অগ্নিক্ষরা বাণী যে ভাবে ও যে ভাষায় প্রচার করেছিল এবং ভারতে ইংরেজ শাসনের ব্যর্থতার যে বাস্তব-চিত্র তুলে ধরেছিল, তার তুলনা হয় না।

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন সাংবাদিক প্রবর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। তিনি তাঁর 'কংগ্রেস' পুস্তকে এই পত্রিকার জন্মকথা যা লিপিবদ্ধ করেছেন তার কিছু উদ্ধৃতি আমরা এখানে দিলাম। তিনি লিখেছেন:

"ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৯০৬-এর ১লা আগস্ট হইতেই জাতীয় দলের ইংরেজী দৈনিক পত্র প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলেন। ১লা 'বন্দেমাতরম' প্রকাশিত হইল না, কিন্তু ৭ই আগস্টের পূর্বেই তাহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। হরিদাস হালদার এক বন্ধুর সহিত সহসা এক পত্র প্রকাশ করিল। উদার-হৃদয় সুবোধচন্দ্র মল্লিক তাহার কার্যে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—এই চারজন লইয়া সম্পাদক-সঙ্ঘ গঠিত হইল এবং বিপিনচন্দ্রের নামই প্রধান সম্পাদক বলিয়া লিখিত হইল। কিছুদিন পরে মনান্তরহেতু বিপিনচন্দ্র বন্দেমাতরম্ ত্যাগ করেন এবং অরবিন্দ অসুস্থ হইয়া পড়িলে অবশিষ্ট দুইজনই বহুদিন সংবাদ-পত্রগুলির পরিচালনা করেন। বোমার মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার হইলে বিপিনচন্দ্র আবার সাগ্রহে বন্দেমাতরমের সেবায় যোগ দিযাছিলেন এবং ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।"

বন্দেমাতরম্-এর মোট স্থায়িত্বকাল ১৯০৬, আগস্ট মাস থেকে ১৯০৮, অক্টোবর পর্যন্ত—অর্থাৎ প্রায় দু'বছর দু'মাস তিন সপ্তাহ হবে। এই সময়ের মধ্যে আমরা পত্রিকাটির তিনটি স্তর লক্ষ্য করি। "প্রথম—১৯০৬, ৭ই আগস্ট হইতে ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত, আন্দাজ আড়াই মাস বিপিনচন্দ্র পাল প্রধান সম্পাদক। ১৮ই অক্টোবর বন্দেমাতরম্ অফিস ক্রীক্ রো-তে উঠিযা যায়। দ্বিতীয়—১৯০৬, অক্টোবরের মধ্যভাগ হইতে ১৯০৮, ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত অরবিন্দ প্রধান সম্পাদকের কার্য করিয়াছেন। ১৯০৬, ডিসেম্বরের শেষভাগে কংগ্রেসের সময় মাত্র একদিনের জন্য অরবিন্দের নাম প্রধান সম্পাদকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে তিনি নিষেধ করায় তাঁহার নাম আর কখনো প্রধান বা অপ্রধান সম্পাদকরূপে প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি প্রায় এক বৎসর পাঁচমাস অরবিন্দ বন্দেমাতরম্-এর সম্পাদকীয় কার্যে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তৃতীয়—

১৯০৮, মে মাস হইতে (যখন অরবিন্দ বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হইলেন) ১৯০৮, ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত ছয়মাস আবার বিপিনচন্দ্র পাল ইহার প্রধান সম্পাদক হইলেন।"*

বন্দেমাতরম্ পত্রিকার জীবন স্বল্পায়ু ছিল। তথাপি স্বল্পকাল স্থায়ী এই পত্রিকাখানির সঙ্গে অরবিন্দের নাম অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। বস্তুত অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনকে বন্দেমাতরম্ থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। তাঁর সাংবাদিক প্রতিভারও চরমোৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয় এই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সম্পাদকীয় রচনা ও অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে। তাঁর লেখনী শুধু অগ্নিবর্ষীই ছিল না, একটি নতুন আদর্শকে জাতির চিত্তলোকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উহা যেন বিশেষভাবে নিয়োজিত হয়েছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত সমালোচনা আমরা পরে করছি। শ্রীঅরবিন্দের কোন জীবনীকার অথবা স্বদেশী আন্দোলনের কোন ইতিহাস লেখক বন্দেমাতরম্ পত্রিকার আনুপূর্বিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন নাই। অর্থানুকূল্যটাই এক্ষেত্রে বড় কথা ছিল। হরিদাস হালদারের একার টাকায় এই কাগজ হয় নি; তাঁর দানের পরিমাণ সামান্যই।

বন্দেমাতরমের আর্থিক ভিত্তিটা সুদৃঢ় করার জন্য সেদিন যাঁরা এর পিছনে তাঁদের অর্থবল ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন চিত্তরঞ্জন দাস, রজতনাথ রায় আর সুবোধচন্দ্র মল্লিক। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী লিখেছেন: "বন্দেমাতরমে কাটা কাটা বোল বেরুত আর টাকা টাকা করে প্রাণ যেত চিত্তর আর রজতের।" সুবোধচন্দ্রের নাম তিনি করেন নি—করার প্রয়োজনও নেই। তাঁরই ক্রীক রো-র বাড়িতে বন্দেমাতরমের ছাপাখানা ও অফিস ছিল এবং এটা তিনি বিনা ভাড়াতে দিয়েছিলেন। তবে পত্রিকা পরিচালনার জন্য তিনি যে মাঝে মাঝে মোটা টাকা না দিতেন তা নয়—বিশেষ করে তিনি ছিলেন অরবিন্দগত প্রাণ। তাই বরোদা থেকে অরবিন্দ যখন কলকাতায় চলে এলেন তখন এখানে তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য একা সুবোধচন্দ্রই ছিলেন সজাগ ও সচেষ্ট। চিত্তরঞ্জনের ত কথাই নেই। তিনি এবং রজতনাথ উভয়েই তখন হাইকোর্টের উদীয়মান ব্যারিস্টার; রজতনাথ কিছু বয়োঃকনিষ্ঠ ও জুনিয়র ছিলেন। কিন্তু তাঁরা দুজনেই ছিলেন লোকমান্য টিলকের মতানুসারী এবং অরবিন্দ সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ ও আকর্ষণ যে এই কারণেই প্রবল ছিল, তা বলা বাহুল্য। চিত্তরঞ্জন তো নিয়মিতভাবে ক্রীক রোতে বন্দেমাতরম্ অফিসে আসতেন। ভবিষ্যতের দেশবন্ধু যে বন্দেমাতরমের মতো জাতীয়তাবাদী পত্রিকাকে তাঁর সাধ্যমত অর্থানুকূল্য করবেন, তা ছিল একান্তভাবেই স্বাভাবিক।*

---

* শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশীযুগ: রায়চৌধুরী।

বরিশালের সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে সারা বাংলায়—এ বাংলায় ও বাংলায়—ছড়িয়ে পড়েছে। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণায় প্রথম পর্বে যেমন চারদিকে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, আজ বরিশালের মাটিতে রক্তপাতের সংবাদে তেমনি বিক্ষোভ ফেটে পড়ল চারদিকে। বঙ্গভঙ্গের বেদনাটা যেন আবার সবাই অন্তরে অন্তরে অনুভব করল তীব্রভাবে। এবার আর প্রতিবাদ নয়। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খধ্বনিতে গর্জে উঠল বিপ্লবের ঝঙ্কার। সহসা যেন বিদ্রোহের একটা অগ্নিময় পরিবেশ সৃষ্টি হলো। ফুলারী শাসনে ও বাংলায় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি নিষিদ্ধ—তাই বুঝি সহস্র-মুখরিত প্রতিধ্বনির মতো এই প্রথম ভারতের আকাশে-বাতাসে বেজে উঠলো 'বন্দেমাতরম্'। সে-মন্ত্রে ভারতবর্ষের অখণ্ডতার উদাত্ত ঘোষণা। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি বে-আইনী। ক্রোধে ফেটে পড়ে দেশের তরুণ ছাত্রদল।

স্বদেশী আন্দোলন আর আন্দোলন মাত্র থাকল না।

তা এখন হয়ে উঠলো স্বধর্ম।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।

লোকে এখন বুঝলো স্বদেশীও ঠিক তাই।

এটা বেশি করে বুঝিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। "স্বদেশী আন্দোলন প্রত্যেকের স্বধর্ম হয়ে উঠবেই। যতদিন না দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধে তোমাদের মনে এই প্রেরণা জাগছে, ততদিন কিছুই হবে না। এই যে বিদেশী দ্রব্য বর্জন—এটা আসলে অর্থনীতিক বিপ্লব। মনে রেখো, স্বদেশী আন্দোলন আমাদের জীবন-মরণ সংগ্রাম।"

এই কথা একদিন ডন সোসাইটির একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন নিবেদিতা।

কিন্তু শুধু কথা দিয়ে আর ক'দিন চলে? তাই বরিশালের ঘটনার পর তাঁরই কণ্ঠে বাঙালি শুনলো—কথা আর নয়, এবার কাজ চাই। সে-কাজ সশস্ত্র বিপ্লব। এই বিপ্লবের ভূমিতেই মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেন নিবেদিতা আর অরবিন্দ। অরবিন্দের কাছে 'বিপ্লব' শুধু একটি কথার কথা ছিল না। তার ব্যঞ্জনা ছিল বোমা-পিস্তল অতিক্রম করে আরো গভীরে। তিনি যে জাতীয়তার পাঠ দিতেন, আসলে তা আধ্যাত্মিকতা। যারা বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দেবে তারা যেন উপলব্ধি করে যে, দেবতার হাতে তারা যন্ত্র মাত্র—এই ছিল তাঁর আদর্শ। নিবেদিতাও একই সুরে বলতেন—ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করে দেশসেবাকে গ্রহণ করতে হবে জীবনব্রত রূপে। এ-ব্রত হবে আত্মনিবেদন আর আনুগত্যের সাধনা।

অরবিন্দের বিপ্লব-দর্শন শুধু রক্ত ও অগ্নিস্নানের দ্বারা পরিশুদ্ধ হওয়া নয়।

দেশহিতৈষণা তাঁর কাছে শুধু পেট্রিয়টিজম ছিল না।

একে তিনি দিতে চাইলেন ইষ্টনিষ্ঠার গুরুত্ব।

ইষ্ট কে ?

স্বদেশ। ভৌগোলিক ভূখণ্ড মাত্র নয়।

অরবিন্দের কাছে তিনি সাক্ষাৎ জগন্মাতা।

বরোদার রাজ-কলেজের মোটা টাকার মাইনের চাকরি ত্যাগ করে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন নিছক একটা আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে নয়—তিনি এসেছিলেন একটা 'মিশন' নিয়ে। দেশ-হিতৈষণাকে ইষ্ট নিষ্ঠার মর্যাদা দিয়ে জাতীয় আন্দোলনকে অধ্যাত্মসাধনায় রূপান্তরিত করতে যেন তিনি এসেছিলেন। তাই তো দেখা গেল, নব প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ পদ নেবার অব্যবহিত পরেই অধ্যক্ষতার গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁর প্রভাব দেখতে দেখতে বহুদূর পরিব্যাপ্ত হলো। ছেলেরা তাঁর সংস্পর্শে এসে বুঝতে পারলো কী মানুষ তিনি। বাইরে থেকে দেখতে শান্ত-শিষ্ট ও নির্বাক, কিন্তু তাঁর মুখের দু' একটা কথা শুনেই তারা বুঝলো তিনি যেমন অসাধারণ দৃঢ়চেতা, তেমনি অমোঘ তাঁর বীর্য।

এমন মানুষই তো আন্দোলনের কাণ্ডারী হবার যোগ্য।

এমন মানুষই তো দেশব্যাপী বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করবেন।

"আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকে অর্জন করবে নেতৃত্বের সামর্থ্য।"

"আমি চাই তোমরা প্রত্যেকে হবে পূর্ণ মানব।"

"এই শক্তি সাধনা নির্দ্বিধায় দুঃখ বরণের ব্রত। এ-ব্রত গ্রহণ করতে হলে বিশ্বাস থাকা চাই যে, মাত্র আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সংগ্রাম করে যারা, ভগবানই তাদের শক্তি দেন। অকুণ্ঠ আত্মবিসর্জনই শক্তির উৎস।"

দৈববাণীর মতো এইসব কথা যে শোনে সেই-ই হয় মন্ত্রমুগ্ধ। দেখতে দেখতে বাংলার সমস্ত তরুণ-চিত্ত উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো বিপ্লবের এই আদর্শে। যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে তিনি বাংলাদেশে এসেছেন, তরুণদের প্রাণে আগুনের ফুলঝুরির মতো সেই স্বপ্ন যেন ফুটে উঠতে লাগল। তারা সবাই ভবানী মন্দিরের পূজারী হতে চাইলো। বরিশাল কনফারেন্সে যোগদান করতে যাওয়া অরবিন্দের বৃথা হয় নি। সেখানে নীরবে তিনি যে মর্মান্তিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এসেছিলেন এবং যা দেখবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ললাটনেত্রের আগুন জ্বলে উঠেছিল—পুলিশের লাঠিতে আহত ও রক্তাক্তদেহ কিশোর চিত্তরঞ্জনের নির্ভীক কণ্ঠে উচ্চারিত সেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি—উপস্থিত সকল নেতার কানেই গিয়েছিল, কিন্তু কানের ভিতর দিয়ে মর্মে পশেছিল শুধু একজনের। তিনি অরবিন্দ ঘোষ। আমরা দেখব, তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া এইবার স্তিমিত রাজনীতিতে কি রকম প্রলয়ের ঝড় তুলবে।

নব জাগরণের সেই অগ্নিযুগে নিবেদিতা নিশ্চুপ ছিলেন না।

বাংলার বিপ্লবকেন্দ্র বলতে গেলে বাগবাজারে সতেরো নম্বর বোসপাড়া লেনে তাঁর 'ভগিনী নিবাসেই' অবস্থিত ছিল। যতকিছু গুপ্ত পরামর্শ এখানেই হতো। ইহলোক থেকে বিদায় নেবার পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালি তরুণকে মেঘমন্দ্রিত স্বরে যেভাবে আহ্বান করে গিয়েছিলেন, তাঁরই মানসকন্যার কণ্ঠকে আশ্রয় করে সেই স্বর আরো নিবিড়, আরো ব্যাপক হয়ে উঠতে থাকে। যখন থেকে বিপিনচন্দ্র, সতীশচন্দ্র ও ব্রহ্মবান্ধব রাজনীতিক্ষেত্রে উগ্র স্বাদেশিকতার বীজ বপন করতে আরম্ভ করেন, তখন থেকেই নিবেদিতা আসরে নামেন এবং তখন থেকেই তাঁর লেখনী ও রসনা জাগরণকে দীপ্যমান করে তুলতে থাকে। তখন থেকেই গুরুর অনুসরণে দেশের চারদিকে স্বদেশপ্রেমের বহ্নিশিখা ছড়িয়ে দেওয়াই হয়ে উঠেছিল নিবেদিতার প্রধান কাজ। স্বদেশী আন্দোলনের ঊষায়—জাতীয় জীবনের সেই মহাসন্ধিক্ষণে বাঙালির ভাব জগতে তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন যেন সাক্ষাৎ অভয়ারূপে।

বিবেকানন্দের চিতাভস্ম অঙ্গে মেখে, জাতীয় জাগরণের সেই কলমন্দ্রিত আসরে নিবেদিতার শিখাময়ী মূর্তি দেখে অরবিন্দ শুধু বিস্মিত হলেন না, মুগ্ধও হলেন। বাংলায় এসে তাঁকে যেন তিনি আরো সত্য করে চিনলেন। শিষ্যার হৃদয়ে গুরুর উপদেশ কেমনভাবে এঁকে গিয়েছে, বিবেকানন্দের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেমন করে তিনি জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত করতে উদ্যত হয়েছেন আর অবসন্নতার হীনবীর্য মুহূর্তে বিদ্যুতের চাবুক দিয়ে ব'র বার আঘাত হেনে সাতকোটি বাঙালিকে শিখাময়ী এই নারী কেমন করে একই আশার, একই আনন্দ-বেদনার অনুভূতিতে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন—তা স্বচক্ষে দেখে অরবিন্দের যেন বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে নিবেদিতা।

বাঙালির বিপ্লব আন্দোলনে নিবেদিতা।

স্বদেশীযুগের বাংলার ইতিহাসে তিনি একাই একটি অধ্যায়।

বঙ্গভঙ্গের বেদনা বুকে নিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন বাংলার নেতাদের পাশে।

বাঙালি তরুণের শিরায় শিরায় জাগিয়ে তুললেন বিদ্যুৎপ্রবাহ।

কলঙ্কময় ক্লীবত্বার মহাপঙ্ক থেকে তাদের তিনি ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন অগ্নিকমল করে। সেই রুদ্রানীর কণ্ঠে আমরা যে ভাষা শুনলাম তা কবির ভাষা, প্রাণসাধিকার ভাষা, তাপসের ভাষা, প্রেমের ভাষা, জীবনের ভাষা—মৃত অক্ষরের শব্দ নয়, যেন ওজস্বী মন্ত্রোচ্চার। সাতকোটি বাঙালি সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলো, প্রেরণার অগ্নিমশাল হাতে এ কোন্ নারী—তুষার-ধবল আবরণে অঙ্গ ঢাকা, করে রুদ্রাক্ষের মালা। বর্ণ তপ্তকাঞ্চনবৎ—যেন মূর্তিমতী বীণাপাণি, অগ্নিবীণায় নবযুগ-জীবনের মহামন্ত্র বাজিয়ে বাংলাদেশের হৃদয় থেকে আবির্ভূতা হলেন। চরণে ঝঞ্ঝার মঞ্জীর,

চক্ষে তাঁর আশীর্বাদ, হস্তে বরাভয় আর হাস্যে স্নেহের অজস্র কল্যাণধারা—তিনি যেন অরবিন্দের সাক্ষাৎ মা ভবানী। স্বদেশী আন্দোলনের সেই উত্তাল পরিবেশে বাংলার প্রাণ-ভাগীরথী ঘন-গর্জিত তরঙ্গ-প্রক্ষেপে মেতে উঠেছিল প্লাবনছন্দে। অরবিন্দ বাংলায় এসে দেখলেন, জাগ্রত বাংলার সেই প্রাণ-চেতনাকে একা একজন নারী তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে কিভাবে দিকে দিকে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন, আর কেমন করেই বা তিনি সহস্র সহস্র হৃদয়ের প্রার্থনা-ভরা প্রান্তরে আশার অগ্নিবীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

অরবিন্দ তো এলেন অনেক পরে।

আন্দোলন তখন প্রজ্বলিত অবস্থায় সদ্য উপনীত।

কিন্তু তার আগে থেকে নিবেদিতা কিভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন তা আমাদের জানা দরকার। সত্য বটে, 'সন্ধ্যায়' স্বদেশীর দীপারতি জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু তার স্বরূপটা সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ছিল। নিবেদিতা সেই কাজ করলেন। মুহূর্তের বিশ্রাম ছিল না তাঁর। কাউকে পাঠালেন বাইরে বোমা তৈরি করা শিখে আসবার জন্য আবার নিজেই স্বদেশীর জন্য চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কখনো বা 'যুগান্তর' অফিসে গিয়ে তরুণ বিপ্লবীদের উৎসাহ দিচ্ছেন—দিচ্ছেন বিপ্লবের প্রাথমিক পাঠ। বলছেন—আর দেরী নেই, বিপ্লব এসে গেল বলে—তোমরা তৈরি হও। তোমাদের নেতা এসে যেন দেখতে পান বাংলার বিপ্লব-বাহিনী প্রস্তুত। কখনো বা 'সন্ধ্যার' মজলিশে গিয়ে মিলিত হচ্ছেন উপাধ্যায়ের সঙ্গে—সলা-পরামর্শ করছেন। কিন্তু এসব তো বহিরঙ্গ ব্যাপার।

দেশের লোককে স্বদেশীর তাৎপর্যটা বুঝিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর প্রধান কাজ—গুপ্তসমিতির কাজের চেয়েও বড় কাজ ছিল এটা। নিবেদিতার স্পর্শচেতন দেহমনকে কার্জনী-আঘাত—যে আঘাত নিয়ে এসেছিল স্বদেশী অন্দোলন—কিভাবে নাড়া দিয়েছিল তা জানা গেল যেদিন তিনি একটি প্রকাশ্য সভায় দেশের তরুণদের উদ্দেশ করে বললেন: "স্বদেশী অর্থ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জনসাধারণের শুধু প্রতিবাদ নয়—প্রতিবাদে কিছু হয় না—রাজ-সরকারের সঙ্গে অসহযোগের চেষ্টা। স্বদেশী তোমাদের কাছে চায় প্রাত্যহিক জীবনে বীর্যের সাধনা। অর্থনৈতিক ব্যাপারেও স্বাবলম্বী হতে হবে আমাদের। মিস্টার দত্তের বইতে* তোমরা পড়েছ ইংরেজ কিভাবে ভারতবর্ষকে শোষণ করেছে। মনে রেখো, 'স্বদেশী' একটা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র নয়—এ তোমাদের জীবন-মরণ সংগ্রাম। কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা আর অসম্ভব ত্যাগ-স্বীকারের পথ দিয়ে চলতে হবে আমাদের। স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের জন্য মরণ-পণ মাত্র মনোবল সহায় করে এই কার্যে অগ্রসর হতে হবে। মনে

*রমেশচন্দ্র দত্ত ও তাঁর 'ইকনমিক হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের কথাই এখানে বলেছেন নিবেদিতা।

রেখো, দেশবাসীর যে স্বাজাত্যবোধ আজ জাগ্রত হয়েছে, এই স্বদেশী আন্দোলন তারই একটা প্রতীক।"

এইভাবেই সেদিন নিবেদিতা বাংলার জননেতাদের—জাতীয়তাবাদী জননেতাদের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সেই নবজাগরণের মুখে প্রেরণার সঞ্চার করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি শুধু বক্তা বা লেখিকার ভূমিকাই গ্রহণ করেন নি, অর্থনৈতিক ব্যাপারে বাঙালিকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা অনুসারে একটি আন্দোলনও আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। একথা তাই বিস্মৃত হলে চলবে না যে, বাঙালির এই স্বদেশী যুগের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত। অরবিন্দ আসবার আগে এমনি করেই তিনি ক্ষেত্রটা জমাট ভরাট করে প্রস্তুত রেখেছিলেন। যেমন করেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব তাঁর 'সন্ধ্যা' কাগজের মাধ্যমে ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার করে। অরবিন্দের পক্ষে এটা যে খুবই সহায়ক হয়েছিল, তা বোধ করি আর বুঝিয়ে না বললেও চলবে। ব্রহ্মবান্ধব ও নিবেদিতা—এঁরা দুজনেই অরবিন্দর পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। সেই কর্ষিত ভূমিতেই গজিয়ে উঠেছিল বিপ্লবের নবাঙ্কুর।

অরবিন্দ তখন সবেমাত্র কলকাতায় এসেছেন।

থাকেন কলেজ স্কোয়ারে তাঁর মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়িতে।

অল্পদিন পরেই শিলং থেকে তিনি একখানি চিঠি পেলেন।

চিঠি লিখেছেন তাঁর শ্বশুর ভূপাল বসু।

চিঠির মর্ম: "মিনু কলকাতায় তোমার কাছে যাবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছে।"

উত্তর গেল: "আপনি যদি মৃণালিনীকে কলকাতা পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকেন তবে পাঠান, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।"

ঠিক সেই সময়েই কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে বাইরে কোন একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠানো দরকার। কোথায় পাঠাবেন? শিলং-এ পাঠানো যেতে পারে। ঐ চিঠিতেই শ্বশুরকে লিখলেন: "বারীন অসুস্থ। আমি তাকে শিলং-এ চেঞ্জে যেতে বলছি। যদি সে শিলং যায় তবে আমি জানি যে, আপনি বারীনের ভার নেবেন এবং তাকে যত্ন করবেন।"

অরবিন্দ যে একজন কর্তব্যপরায়ণ স্বামী ও স্নেহপরায়ণ ভ্রাতা, তারই অভ্রান্ত নিদর্শন বহন করে এই পত্রখানি। এই চিঠির তারিখ ৮ই জুন, ১৯০৬। এর থেকে আমরা আরো জানতে পারি যে, দেশ-মাতৃকার আহ্বানে অরবিন্দ যখন বরোদা থেকে কলকাতায় চলে আসেন, তখন তাঁর স্ত্রী পিত্রালয়েই বাস করছিলেন। বিয়ের পর অল্পদিনই তিনি তাঁকে তাঁর কাছে রেখেছিলেন। দ্বিতীয় স্থান ছিল

দেওঘরে মামার বাড়ি। কলকাতায় অবশ্য কৃষ্ণধনের নিজস্ব একটা বাড়ি ছিল, পৈত্রিক-নিবাস কোন্নগরে ছিল না। বস্তুত কৃষ্ণধন ঘোষের জীবনের একটা বড় ট্র্যাজেডি এই ছিল যে, বিলেত থেকে আসার পর তাঁকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করেন, কনিষ্ঠ সহোদরেরা ত্যাগ করেন—ত্যাগ করেন নি শুধু তাঁর গর্ভধারিণী মা। মাতামহের পরিচয়েই তাই অরবিন্দ ও তাঁর ভাই-বোনদের পরিচয়। এঁদের জীবনে পিতামহ বা পিতামহীর সাক্ষাৎ আমরা আদৌ পাই না।

তেমনি পাই না অরবিন্দের গার্হস্থ্য-জীবনের একটি পূর্ণায়ত চিত্র।

তাঁর জীবনের এদিকটাও যেন একটা বিরাট শূন্য।

দেশের কাজে সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন অমন যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, তাঁরো গার্হস্থ্য জীবনের বিস্তারিত ইতিহাস আছে—তেমনি আছে আরো অনেকেরই যাঁরা অরবিন্দর সঙ্গে একত্রে স্বদেশী আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। নেই শুধু তাঁর নিজের। অথচ তিনি বিবাহিত ছিলেন। নিজে আগ্রহ করেই বিয়ে করেছিলেন এবং নিজেই পাত্রী পছন্দ করেছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু দেখতে পাই জন্ম-সন্ন্যাসী এই মানুষটি—উপার্জন যাঁর নিতান্ত সামান্য ছিল না—বরোদাতেও ঘর-সংসার তেমনভাবে পাতেন নি, ঠিক যেমনভাবে পাতা উচিৎ ছিল। অথচ স্ত্রীকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। ভালবাসবার পাত্রীও ছিলেন মৃণালিনী দেবী—রূপে-গুণে যেমন, বিদুষীও ছিলেন তিনি তেমনি। স্বামীর প্রতি তাঁর যেমন অনুরাগ, শ্রদ্ধাও ছিল তেমনি। ঘর-সংসার পাতবার ইচ্ছাটা তাঁরো পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু স্বামীর নিজস্ব আত্মীয়স্বজন—পিতা-পিতামহের দিক দিয়ে বলতে কেউ ছিল না। কলকাতায় স্কট লেনে শ্বশুরের একখানা বাড়ি ছিল যেখানে তিনি গৃহস্থালী পাততে পারতেন। কিন্তু সে বাড়ি কৃষ্ণধনের ছেলেরা কেউ পায় নি।

কলকাতায় অরবিন্দ এলেন।

থাকলেন তিনি চার বছর এখানে ওখানে।

কখনো চাঁপাতলায় যুগান্তরের আড্ডায়, কখনো সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে, কখনো বা কলেজ স্কোয়ারে মেসোমশাইয়ের বাড়িতে, কখনো দেওঘরে দাদামশাইয়ের বাড়িতে আর শেষের দিকে গ্রে ষ্ট্রীটের একটি ভাড়াটে বাড়িতে। এমন অবস্থায় মৃণালিনী দেবী স্বামীকে নিয়ে তাঁর মনের মতো ঘর-সংসার পাতবেন কি করে? দেশ-জননীর সেবা করবার স্বপ্ন ও আশা বুকে নিয়ে যিনি বরোদার নিশ্চিন্ত জীবন ত্যাগ করে কলকাতায় এসেছেন সেই অরবিন্দের ধরা-বাঁধা গার্হস্থ্যজীবন যাপন করবার তখন অবসরই বা কোথায়? বারীন্দ্র তবু শেষ জীবনে বিবাহ করে ঘর-সংসারে মন দিয়েছিলেন, তাঁর সেজদার কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না, দেখা যায়। কোষ্ঠীর ফল মিথ্যা হবার নয়—অরবিন্দের জীবনে গার্হস্থ্যসুখ নেই। তাই

দেখা যায় যে, অরবিন্দের সকল চরিতকারই তাঁর দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে নীরব। বোধ করি একমাত্র চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁর 'পুরানো কথা—উপসংহার' গ্রন্থে এই বিষয়ে কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং অরবিন্দের কলকাতা জীবনের উপর কিছুটা আলোকসম্পাত করেছেন।

কলকাতায় অরবিন্দের নিত্য পার্শ্বচর ও দেহরক্ষী যিনি ছিলেন সেই অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মুখে একটি ঘটনা শুনেছিলাম। সেটি এখানে উল্লেখ করছি, এর থেকে আমরা অরবিন্দের অনাসক্ত প্রকৃতির যে চিত্রটি পাই তা বিস্ময়কর। অরবিন্দ তখন কলেজ স্কোয়ারে তাঁর মেসোমশাইয়ের বাড়িতে আছেন সস্ত্রীক। সেই বাড়ির দোতলার ছাদে বিকালে বা সন্ধ্যায় মৃণালিনী দেবী যখন উঠে পায়চারী করতেন তাঁর মাসতুতো ননদ বাসন্তী চক্রবর্তীর সঙ্গে, তখন পাশের বাড়ির একটি তরুণ সেই সময়ে ছাদে উঠে মৃণালিনী দেবীর প্রতি এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো, কখনো সখনো মন্দ ইসারাও করত। এ রকম প্রায়ই হতো। মৃণালিনী দেবী ব্যাপারটা স্বামীর গোচরে আনলেন। তিনি শুনলেন মাত্র। কিছুদিন পরে তাঁর নিজের ননদ সরোজিনী দেবী যখন দেওঘর থেকে কলকাতায় এলেন তখন মৃণালিনী দেবী তাঁকে সব কথা বললেন এবং বিকেলবেলায় তাঁকে ছাদে নিয়ে গিয়ে তার চাক্ষুষ প্রমাণও দিলেন।

সেজদার উপর সরোজিনী দেবীর বিশেষ জোর খাটতো।

বৌদির হয়ে অনেক সময় তাঁর সঙ্গে ঝগড়াও করতেন তিনি।

তাই ছাদের ব্যাপারটা দাদার গোচরে আনবার জন্য তিনি সেদিন দুপুরবেলায় অরবিন্দের ঘরে এলেন। একটি মাদুরের উপর বসে উপুড় হয়ে তখন তিনি বন্দেমাতরম্ পত্রিকার জন্য একমনে প্রবন্ধ লিখছিলেন।

—সেজদা শুনেছ ব্যাপারটা?

—কিসের ব্যাপার?

—ঐ যে পাশের বাড়ির একটা ছেলে বৌদিকে ইসারা করে।

এমন সময়ে তাঁদের কথার মাঝখানে প্রবেশ করেন অবিনাশচন্দ্র। তাঁকে দেখেই মৃদুহাস্যে অরবিন্দ বললেন—"অবি, পাশের বাড়ির ছেলেটাকে একবার জিজ্ঞাসা করে ভাখো তো ও কি মৃণালিনীকে বিয়ে করতে চায়? যদি চায়, আমার আপত্তি নেই।"

এই বলে তিনি নীরব হলেন।

অবিনাশচন্দ্র বলেছেন, "অনেক দিন তাঁর দেহরক্ষীর কাজ করেছি, নিজের হাতে তাঁর পরিচর্যা করেছি, কিন্তু কখনো সংসার-জীবন সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে বিন্দুমাত্র আসক্তির পরিচয় পাই নি। আমার কেবলই মনে হতো, শ্রীঅরবিন্দ যেন জন্ম-সন্ন্যাসী।"

আর কোন মন্তব্যের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু বারীন্দ্র শিলং গিয়েছিলেন অসুস্থতার জন্য নয়।

গিয়েছিলেন একটি বিশেষ 'মিশন' নিয়ে এবং অরবিন্দই তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। অরবিন্দ বিপ্লবী। বিপ্লবীর প্রকৃতি স্বতন্ত্র। মন্ত্রগুপ্তি তার বৈশিষ্ট্য। কথাটা তাহলে খুলেই বলি। বলেছি, বরিশাল থেকে অরবিন্দ এমনি ফেরেন নি—ফিরেছিলেন একটা বিশেষ মানসিক অবস্থা নিয়ে। নিরস্ত্র কিশোরের রক্তপাত আর তার কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি—বৃথা হলো না। ফুলারকে—পূর্ববঙ্গের উদ্ধত লাট ফুলারকে সরাতে হবে পৃথিবী থেকে। ফুলার-বধ দিয়েই শুরু হবে বাংলায় বিপ্লবের পালা। গুপ্তসমিতির বৈঠক বসল। সেই বৈঠকেই সব কিছু ঠিক হয়ে যায়।

"মে মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতেই বারীন্দ্রের দল অরবিন্দের আদেশ মতো ছোটলাট ফুলারকে বধের জন্য পশ্চাদনুসরণ করিয়া বেড়াইতেছে। জুনের মাঝামাঝি বারীন্দ্রকে আমরা শিলং-এ দেখিতে পাই, তিনি টাঙ্গায় চড়িয়া বেড়াইতেছেন। তিনি চেঞ্জেও আসেন নাই, হাওয়া খাইয়াও বেড়াইতেছেন না। তিনি ফুলার-বধের জন্যই কলিকাতা হইতে শিলং আসিয়াছেন। কলিকাতাতেই ফুলার-বধের মন্ত্রণা পাশ হইয়াছিল।"

এই ফুলার বধ পর্বের সঠিক বিবরণ আছে হেমচন্দ্র কানুনগোর বইতে। তিনি যে ইতিহাস বিবৃত করেছেন তা পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে, ফুলার তখন শিলং-এ অবস্থান করছিলেন। শিলং নতুন পূর্ববঙ্গের ছোটলাটের গ্রীষ্মাবাস। বারীন্দ্রের প্রথমে এখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল একটা প্রাথমিক 'সার্ভে' করা ও তারপর তিনি কলকাতায় টেলিগ্রাম করলে এখান থেকে বোমা-রিভলবার দিয়ে উপযুক্ত একজনকে পাঠান হবে। শিলং থেকে যথাসময়ে 'তার' এলো—'ডেসপ্যাচ গুডস্'। প্রথমে ঠিক হয়েছিল ক্ষুদিরামকে এই কাজের জন্য পাঠানো হবে, কিন্তু বড্ড ছেলেমানুষ যে। অতঃপর হেমচন্দ্র নিজেই এই দায়িত্ব নিয়ে শিলং যাত্রা করেন। শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়। কিন্তু সরকারী চাকুরিয়া ভূপাল বসু ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না যে, তাঁর আপাতদৃষ্টিতে শান্ত-শিষ্ট নিরীহ প্রকৃতির জামাতাটি কি সাংঘাতিক। পরে অবশ্য জেনেছিলেন। প্রয়াস ব্যর্থ হলেও নেতার বৈপ্লবিক প্রতিভার প্রশংসা করতেই হয়।

চাঁপাতলায় যুগান্তর পত্রিকার অফিস মাত্র একটি সংবাদপত্রের কার্যালয় ছিল না। এটাই তখন হয়ে উঠেছিল বাংলায় বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্র।

এর অন্ধকার গুহার মধ্যে সেদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে যে-ইতিহাস রচিত হয়েছিল, তার স্রষ্টা ছিলেন অরবিন্দ। "প্রকাশ্য দিনের আলোকে জাতির যে

ইতিহাস রচিত হয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্ধকার গহ্বরেই তাহার উদ্ভব।" পৃথিবীর সকল জাতির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করে। এই প্রসঙ্গে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী যথার্থই লিখেছেন: "অরবিন্দের প্রেরণায় বাংলাদেশে গুপ্তসমিতির দ্বিতীয় পর্বের উদ্বোধন হয় এই যুগান্তরের আড্ডায়। সুতরাং ইহাই বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্র। মফঃস্বলের শাখা কেন্দ্রগুলির সহিত ইহার যোগাযোগ ছিল। শাখাকেন্দ্র হইতে এই প্রধান কেন্দ্রে টাকা আসিত।" ফুলার-বধের পরিকল্পনাটা, বরিশাল থেকে প্রত্যাবর্তনের পব, অরবিন্দ যে এখানে বসেই বচনা করেছিলেন, এমন অনুমান অসঙ্গত নাও হতে পাবে। এবং এর কথা তখন গুপ্তসমিতির সভ্যবৃন্দ ব্যতীত অপব কেহ অবগত ছিলেন না।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে ফুলার-বধ সম্পর্কে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, প্রসঙ্গক্রমে এখানে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বদেশীযুগের তিনি একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন এবং মডারেটপন্থী হলেও এই আন্দোলনে তাঁর একটি নিজস্ব ভূমিকা ছিল। তাঁব 'এ নেশন ইন মেকিং' গ্রন্থখানি একাধারে সুরেন্দ্রনাথের আত্মচরিত ও একটি জাতিব জীবন চরিত। আর তা তিনি বচনা করেছেন যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই। তথাকথিত বিপ্লবী দাদাদের আবেগ-উত্তপ্ত ও উপন্যাসের ঢঙে মনোরম সাহিত্যের ভাষায় রচিত বিবরণ অপেক্ষা সুরেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত সমসাময়িক ইতিহাসের ঘটনা-বিশেষের বিবরণ অনেক মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য। তিনি লিখেছেন: "বরিশালের ঘটনার কয়েক মাস পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় দুইজন যুবক ব্যারাকপুরে আমার বাসভবনে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদেব মধ্যে একজন আমাকে বললেন—স্যর ব্যাসফিল্ড ফুলারকে গুলি করে মারার জন্য আমরা একটি পরিকল্পনা ঠিক করেছি। এবং এই উদ্দেশ্যেই আমরা আজ রাত্রে রওনা হচ্ছি। আপনি এ বিষযে কি বলেন? আমি এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না এবং প্রস্তাবটি আমার কাছে এমনই অস্বাভাবিক বোধ হয়েছিল যে আমি কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। আমি বললাম—আপনারা স্যর ব্যাসফিল্ড ফুলারকে গুলি করে মারতে চান কেন? তিনি কি করেছেন? যে যুবকটি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনিই কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উত্তব দিলেন—বানরীপাড়ায় তাঁর গুর্খাসৈন্যরা সেখানকার স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করেছে—তাঁদের শ্লীলতা হানি করেছে। আমরা তাই তাঁর উপর প্রতিশোধ নিতে চাই। আমি বললাম—আপনারা কি অবগত আছেন যে ব্যাসফিল্ড ফুলার পদত্যাগ করেছেন? একজন মৃত ব্যক্তিকে গুলি করে মারার কোন যুক্তি আছে? আমার কাছে এই কথা শুনে যুবক দুটি এই গুপ্তহত্যার কাজ থেকে বিরত থাকতে সম্মত হন এবং পরিকল্পনাটি বর্জন করেন।"

সুরেন্দ্রনাথ তখন জানতেন না যে অরবিন্দের মস্তিষ্কই সক্রিয় ছিল ফুলার-বধের পিছনে। ফুলার-বধের চেষ্টা ব্যর্থ হলো বটে কিন্তু বিপ্লবের আগুন নিভল না। নিভল না কারণ এ আগুন যিনি জ্বেলেছিলেন, তিনি—অরবিন্দ ঘোষ—শুধু জন্ম-বিপ্লবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত সাগ্নিক বিপ্লবী। "একক, সম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র, স্বাধীন।"

১৯০৬, ২রা আগস্ট।

বাংলার জাতীয়তাবাদের অন্যতম পুরোহিত আনন্দমোহন বসুর মৃত্যু হলো।

ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে তিনিই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম র‍্যাংলার হন। ১৮৯৮ সালে তিনি মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি হন। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় (২০শে আগস্ট তারিখের সংখ্যা) তাঁর মৃত্যুসংবাদ বিনা মন্তব্যে প্রকাশিত হয়েছিল। আনন্দমোহন নরমপন্থী ছিলেন সত্য, কিন্তু দেশপ্রেমে তিনি যে কারো চেয়ে ন্যূন ছিলেন না, সেকথা মুক্ত কণ্ঠে বলে গিয়েছেন নিবেদিতা।* মিলন-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন, তাই-ই তাঁর জীবনের শেষ বক্তৃতা—আগের একটি অধ্যায়ে আমরা এই ঘটনার উল্লেখ করেছি। বাগ্মীশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, এমন বক্তৃতা তিনি জীবনে শোনেন নি। তাঁর এই শেষ বক্তৃতায় আনন্দমোহন বসু দেশাত্মবোধের যে স্বর্ণ বেদী রচনা করে গিয়েছেন, "বাঙালি জাতি সেই বেদীমূলে চিরদিন ভক্তির অঞ্জলি অবনত শিরে প্রদান করিবে।"

বিস্মৃতকীর্তি আনন্দমোহন বসুর (জন্ম ১৮৪৭) জীবনের গৌরব তাঁর প্রতিভা বা পাণ্ডিত্যে নয়, দেশপ্রেমেও নয়—তাঁর গৌরব তাঁর চরিত্রে। চরিত্রগুণেই তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে একটি অনন্যলব্ধ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এই চরিত্রবলেই স্বদেশীযুগের বাংলায় তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছিলেন। বিপিনচন্দ্র যথার্থই বলেছেন: "সেকালের কোন বিলাত-ফেরৎ বাঙালি আনন্দমোহনের মতো দেশের লোকের এমন অকৃত্রিম শ্রদ্ধা লাভ করেন নি।"† বিশুদ্ধ চরিত্রের সঙ্গে মিলেছিল আদর্শবাদিতা। নিবেদিতার মতে, এমন সংযত চরিত্র ও উচ্চ আদর্শবাদী পুরুষ সে যুগে আর বড় একটা দেখা যায় নি। স্বামী বিবেকানন্দও আনন্দমোহনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। আশ্চর্যের বিষয়, এ হেন ঋষিতুল্য মানুষটি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের কোন বক্তব্য আমরা কোথাও পাই নি।

---

* লেখকের 'নিবেদিতা-নৈবেদ্য' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

† বাংলার নবযুগের কথা: বিপিনচন্দ্র পাল।

॥ আটাশ ॥

বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দের লেখনীকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হলো 'বন্দেমাতরম্।' আগেই বলেছি, আসরে আগে দেখা দিয়েছিল 'সন্ধ্যা'। প্রতিবাদ আন্দোলনের ধূমায়িত অবস্থায় 'সন্ধ্যা' বাঙালিকে প্রেরণা দিয়েছে কড়াপাকের উগ্র রাজনীতি পরিবেশন করে। তারপরে আসরে নামলো 'যুগান্তর' এবং তার সঙ্গে সঙ্গে 'নবশক্তি'। সবশেষে রণভেরী বাজিয়ে এলো 'বন্দেমাতরম্'। এইভাবে দেশজননী তখন একসঙ্গে চারমুখে জাতির সঙ্গে কথা বললেন।

যুগান্তরের আসর ছিল একেবারে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। গুপ্তসমিতির আড্ডা এখানেই ছিল। এটাই তখন হয়ে উঠেছিল বঙ্কিমের আনন্দমঠ, অরবিন্দের ভবানী-মন্দির। এর একটি সরস চিত্র পাই উপেন্দ্রনাথের লেখায়:

"১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের তখন শীতকাল। কলিকাতায় যুগান্তর অফিসে আসিয়া দেখিলাম তিন-চারটি যুবক মিলিয়া একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ভারত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের আসবাবের অভাব দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল বটে, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য? গুলিগোলার অভাব তাঁহারা বাক্যের দ্বারাই পূরণ করিয়া দিলেন। দেখিলাম, লড়াই করিয়া ইংরেজকে দেশ হইতে হটাইয়া দেওয়া যে একটা বেশি কিছু বড় কথা নয়, এবিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত।... দেবব্রত যুগান্তরের সম্পাদকতায় লাগিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেনও সম্পাদকদের মধ্যে একজন। অবিনাশ এই পাগলদের সংসারের গৃহিনী বিশেষ। বারীন্দ্র তখন দেওঘরে পলাতক। পরে বারীনের সহিত দেখা হইবার পর তিন কথায় সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই হইবে। ভূপেনের কারাদণ্ডের পর যুগান্তর সম্পাদনার ভার বারীন্দ্র ও আমার উপরেই আসিয়া পড়িল। নিজেদের লেখা দেখিয়া নিজেরাই চমকিয়া উঠিতাম, মনে হইত যেন দেশের প্রাণ-পুরুষ আমাদের হাত দিয়া তাহার অন্তরের কথা বাহির করিতেছেন। হু হু করিয়া দিন দিন যুগান্তরের গ্রাহক সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হইতে দশ, দশ হইতে এক বৎসরের মধ্যে বিশ হাজারে ঠেকিল। একদিন সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে একখানা চিঠি আসিয়া হাজির হইল যে, যুগান্তরের যেরূপ লেখা বাহির হইতেছে তাহা রাজদ্রোহসূচক; ভবিষ্যতে এরূপ করিলে আইনের কবলে পড়িতে

হইবে। আমরা তো হাসিয়াই অস্থির। আইন কিরে বাবা! আমরা ভারতের ভাবী সম্রাট, গভর্নমেণ্ট হাউসের উত্তরাধিকারী, আমাদের আইন দেখায় কেটা?"*

কি সন্ধ্যা, কি নবশক্তি, কি যুগান্তর—সব কটি কাগজের রচনাই ছিল রীতিমত রাজদ্রোহমূলক—একথা মিথ্যা নয়। তার সঙ্গে বিদ্বেষের মাত্রাটা নেহাৎ কম ছিল না। কিন্তু বন্দেমাতরম্ ইংরেজি কাগজ। ইংরেজি ভাষায় সুবিধা অনেক, মারপ্যাঁচ অনেক। আইন বাঁচিয়ে কেমন করে তীব্র বেআইনী সম্পাদকীয় রচনা করতে হয় সে কৌশলটা অরবিন্দ বিশেষভাবেই আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দ—তিনজনেই ইংরেজি রচনায় সমান দক্ষ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অরবিন্দের দক্ষতা ছিল স্বতন্ত্র রকমের, কারণ তিনি ছিলেন গ্রীক ও লাতিন ভাষায় সুপণ্ডিত। আবার অন্যদিকে, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দ যেন এক সুরে বাঁধা তিনটি প্রাণ। এই তিনজনের হৃদয়তন্ত্রীতে দেশপ্রেমের একই সুর বাজতো, জাতীয়তার একই আদর্শে এঁরা ছিলেন উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। এঁদের কাছে ধর্ম ও জাতীয়তা ছিল এক ও অভিন্ন। এঁরা যে রাজনীতির ধারক ও বাহক ছিলেন তা ধর্মকে বাদ দিয়ে নয়। সমধর্মী ছিলেন বলেই না বন্দেমাতরমের রূপরেখা রচনায় এই তিনজনের ভূমিকা সমানই ছিল। বন্দেমাতরমের কথা পরে আরো বলব, এবার কংগ্রেসের প্রসঙ্গে আসা যাক।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন বসল কলকাতায়। অরবিন্দ এ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। শুধু উপস্থিত থাকা নয়। স্বদেশী মণ্ডলীর নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে টিলক মহারাজকে যাতে এবার সভাপতি করা যায় সেই-রকম একটা প্রয়াসও পেয়েছিলেন তিনি। সে তাঁর দেশপ্রেমের জন্য, পাণ্ডিত্যের জন্য আর সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি যে নির্যাতন ভোগ করেছিলেন সেই কারণে। টিলকের 'কেশরী' পত্রিকাই তো সেদিন বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে সর্বভারতীয় 'ইস্যু' করে তুলেছিল। বাংলার চরমপন্থী নেতারা এবার তাই টিলককেই কংগ্রেসের সভাপতি করতে চাইলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ। অধিবেশন বসবার অনেক আগে থেকেই বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় টিলকের নির্বাচন সমর্থন করে জোর প্রচারকার্য শুরু হয়। তখন অন্যতম মডারেট নেতা "ভূপেন্দ্রনাথ বসু গোপনে বিলাতে দাদাভাই নৌরোজিকে সভাপতি হইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া চিঠি লিখিলেন, কেননা চরমপন্থীরা তাঁহার বিরুদ্ধে হয়ত কোন আপত্তি করিবে না। নৌরোজি সাহেব সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন।"

* নির্বাসিতের আত্মকথা: উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্বাচিত সভাপতি বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ হলেও মামুলি বক্তৃতা করলেন—আবেদন-নিবেদন নীতির কথাই বললেন, বয়কটের কথা বললেন না। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন চাইলেন, কিন্তু ইংরেজবর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বললেন না। মোট কথা, "বাংলার চরমপন্থী জাতীয়দল যে আদর্শ ও উপায় লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, দাদাভাই-এর অভিভাষণে তাহার প্রতিধ্বনি শুনা গেল না।" বলা বাহুল্য, বন্দেমাতরম্ তীব্রভাবেই রাসবিহারী ঘোষ ও নৌরোজির ভাষণের সমালোচনা করল। তারপর বিষয়-নির্বাচনী সভায় স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ উত্থাপন করলেন বয়কট প্রস্তাব—যার উপর দাঁড়িয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন। কিন্তু কেউ সমর্থন করলেন না এই প্রস্তাব। এমন কি, বিপিনচন্দ্রের অমন যে জোরালো সংশোধনী প্রস্তাব তাও সভাপতি সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন। তাঁর বক্তৃতায় বিপিনচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন: "আমাদের এই বয়কট শুধু বিলাতি নুন চিনি বা কাপড় বয়কট নয়, পূর্ববঙ্গে সরকার যে দমননীতি চালাচ্ছেন তাতে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক বর্জন করাই নতুন জাতীয় দলের উদ্দেশ্য। অতএব বাংলার বয়কট সকল প্রদেশেরই গ্রহণযোগ্য।" কিন্তু মডারেটরা এই যুক্তি মানতে চাইলেন না। তখন চরমপন্থী নেতারা বিষয়-নির্বাচনী সভা পরিত্যাগ করে চলে এলেন।

দেখতে দেখতে বাংলার আন্দোলনে এলো নতুন প্রাণের জোয়ার।

স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ তীব্রতর হয়ে ওঠে।

অরবিন্দ বললেন: কংগ্রেস যে স্বরাজ চায় তা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন—তার বেশি কিছু নয়। আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা—ইংরেজের নিয়ন্ত্রণমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য। দিকে দিকে গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠতে থাকে অনুশীলন সমিতি। দেহের শক্তি, মনের শক্তি, চরিত্রের শক্তি—এই তিনশক্তির অনুশীলনে মেতে উঠলো তরুণ বাঙালি। গীতা তাদের দিলো এই শক্তির সন্ধান। এই গীতাকে সেদিন সকলের আগে নব-ক্ষত্রিয়দের হাতে তুলে দিয়েছিলেন রণগুরু অরবিন্দ। তরুণ বাংলা, তরুণ ভারত ভয়মুক্ত অন্তরে ক্ষত্রিয়ের কাম্য রণে-মৃত্যু বরণ করতে ছুটলো।

বাংলার বিপ্লবের আয়োজন ছিল সেদিন সামান্যই। কিন্তু তাই দিয়ে হিমালয়-প্রমাণ বাধাকে সে কেমন করে টলাতে পেরেছিল? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, একমাত্র অরবিন্দের প্রেরণায় তারা বুঝতে শিখলো—দেহের শক্তি নির্ভর করে চরিত্রের শক্তির ওপর। বুঝলো, দেহের প্রত্যেক শোণিতবিন্দুর আজ প্রয়োজন দেশের। বাংলার তরুণ বিপ্লবীদের জীবনের মূল ভিত্তি ছিল শক্তিচর্চা—শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনং।

বাংলাদেশে বিপ্লবের বেদী রচনা করেছিল প্রধানত দুটি দল—যুগান্তর দল ও অনুশীলন সমিতি। কিন্তু আদর্শগত পার্থক্যের জন্য এই দুটি দল কোনদিনই মিলতে পারে নি। যে যার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই কাজ করেছে। "যুগান্তরের দলে ছিল মস্তিষ্ক, ভাবুকতা এবং একটা আকাশকুসুম আদর্শ। তাঁহারা ভাবের উন্মাদনায় আগুনের ফুলকী যুগান্তর পত্রিকার মারফৎ দেশময় ছড়াইয়া দিয়াছেন। আর পুলিন দাস বাস্তবক্ষেত্রে সমগ্র দেশময় একটা বিরাট বাহিনী সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি যাহাব কোন তুলনা হয় না।" এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯০৬ সালে শিবাজী উৎসবের সময়ে টিলক, মুঞ্জে প্রভৃতি সমাগত নেতাদের সামনে লাঠিখেলা দেখাবার জন্য কলকাতার জাতীয়তাবাদী নেতারা বিশেষভাবে ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিন দাসকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর দলবল নিয়ে আসার জন্য। পুলিন দাসের লাঠিচালনার নৈপুণ্য দেখে টিলক বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছিলেন।

কলকাতা কংগ্রেসে যোগদান করে অরবিন্দ আবার দেওঘরে ফিরে এলেন। শরীর তখনো সম্পূর্ণ সুস্থ নয। কিন্তু বেশিদিন বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারলেন না। কারণ বড়দিন ও নববর্ষের ছুটির পর কলেজ খুলতে বেশি দেরী নয়। আরো একটা বিশেষ কাবণে তাঁকে দেওঘর থেকে শীঘ্রই কলকাতায় চলে আসতে হয়। বন্দেমাতরম্ অফিস থেকে বিপিনচন্দ্র তাঁকে এক পত্রে লিখে জানালেন যে, সদ্য ভূমিষ্ঠ মুসলিম লীগের চাল-চলন দেখে মনে হচ্ছে বাংলার রাজনীতিতে এই দলটি অচিরেই জটিলতার সৃষ্টি করবে। সুতরাং আর বিলম্ব না করে তিনি কলকাতায় চলে এলেন।

কলকাতা কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই ঢাকায় নবাব সলিমুল্লার প্রাসাদে সরকারের নেপথ্য উৎসাহ ও প্ররোচনায় ভূমিষ্ঠ হয় মুসলিম লীগ—ভারতীয় রাজনীতির বিষবৃক্ষ। পূর্ববঙ্গের বশম্বদ নবাব বাহাদুর খানবাহাদুরের দল তাঁদের সম্প্রদায়গত স্বার্থটাকেই সেদিন বড় করে দেখলেন, দেশের বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রতি তাঁরা একবার ফিরেও তাকালেন না। তা যদি তাঁরা করতে পারতেন, তা'হলে ভারতের ইতিহাস অন্য রূপ নিত—ভারত-বিভাগের পরিকল্পনা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কোন দিনই রচনা করতে সাহস করত না। মুসলিম লীগ জন্ম নেবার অল্প দিনের মধ্যেই, ১৯০৭ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে কুমিল্লা ও জামালপুরে পর-পর যেসব ঘটনা ঘটেছিল তা "পূর্ববঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসকে চিরদিনের জন্য মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছে।" হিন্দু-মুসলমানের সেই কলঙ্কিত দাঙ্গার বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। নেভিনসনের 'দি নিউ স্পিরিট ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে এর বিশদ উল্লেখ পাঠক দেখতে পাবেন।

কুমিল্লা ও জামালপুরের দাঙ্গা উপলক্ষ করে দিনের পর দিন—প্রায় একমাস ধরে বন্দেমাতরমে অরবিন্দ কয়েকটি মর্মস্পর্শী ও অগ্নিবর্ষী সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। তার একটি উদ্ধৃতি এখানে দিলাম, "কুমিল্লা মেঘে ঢাকিয়াছে। গভর্নমেণ্ট বলে স্বরাজ-দম্ভকারী বাঙালিরা নিজেরাই নিজেদিগকে রক্ষা করুক। হে বাংলার পদলেহনকারী ক্রীতদাসেরা! যদি তোমাদের দক্ষিণ বাহুতে শক্তি না থাকে তবে তোমরা তোমাদের সন্তানদের জীবন ও স্ত্রীলোকদিগের ইজ্জৎ রক্ষা করিতে পারিবে না।...গভর্নমেণ্ট অথবা অপর কোন সম্প্রদায় যে আমাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে তাহার কারণ তাহারা জানে যে, আমরা শক্তিহীন, দুর্বল এবং কুমিল্লার দাঙ্গা হইতে আমরা এই শিক্ষা পাইতেছি যে হিন্দুদিগকে সমস্ত রকম দুর্বলতা পরিহার পূর্বক শক্তিমান হইতে হইবে।"* এই ভাবেই স্বজাতিকে, বাঙালি হিন্দুকে ভীরুতা ও দুর্বলতা পরিত্যাগ করে, শক্তি অর্জন করার কথা সেদিন বন্দেমাতরমের স্তম্ভে প্রদীপ্ত ভাষায় অরবিন্দ আমাদের শুনিয়েছিলেন। জামালপুরের ঘটনা ছিল আরো মর্মন্তুদ। এখানে গৌরীপুর কাছারি লুঠ হয়, দয়াময়ীর মন্দির আক্রান্ত ও দুর্গা প্রতিমার বিগ্রহ বিধ্বস্ত হয় এবং হিন্দুরা ছেলেমেয়ে নিয়ে শহর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পুলিশ অফিসারের সামনেই লুটতরাজ হয়। উপদ্রবের সময় দেখা গেল যে, ম্যাজিস্ট্রেট টাউনে নেই। ১লা মে থেকে ১০ই মে পর্যন্ত প্রতিদিন অরবিন্দ এই দাঙ্গা সম্পর্কে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় তাহার লেখনীমুখে অগ্নি বর্ষণ করিয়াছিলেন।

এইভাবে সেদিন বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় তাঁর লেখনী মুখে অগ্নিবর্ষী যেসব রচনা বেরুতো সেগুলি বিশেষ যত্নের সঙ্গে পাঠ না করলে এই সময়ের যে বিপ্লবী অরবিন্দ তার স্বরূপটা ঠিকমত বুঝা যাবে না। এই লেখাগুলির মধ্যেই আছে তাঁর এই সময়কার জীবন-চরিত। এইভাবে সেদিন তাঁর হাতে বন্দেমাতরম্ হয়ে উঠেছিল যেন অগ্নিবীণা। দেশে কাগজ অনেক ছিল, কিন্তু এমন জীবন্ত কাগজ আর একটিও ছিল না। পরেও আর হয় নি। নতুন স্বর, নতুন ভাব আর নতুন ভাষা। প্রতিদিনের ঘটনার পিছনে যে চিরদিনের কথা আছে, তাই ফুটে উঠত বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দের লেখনীমুখে, অবিরাম অজস্র ধারায়। পরবর্তীকালে একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তাই বলেছেন যে, বন্দেমাতরম্ শ্রীঅরবিন্দর প্রতিভা আর মনীষার অপূর্ব সৃষ্টি। বন্দেমাতরম্ ভারতের অন্তরের ইতিহাস এবং জাতীয়তার এক নব-দর্শন।

প্রতিদিনের মানুষকে তার প্রত্যক্ষ কর্মে উদ্বুদ্ধ করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ জাতির চিরন্তন স্বধর্মের কথা নতুন করে তার সামনে তুলে ধরলেন।

* বন্দেমাতরম্, ৬ই মার্চ, ১৯০৭

ভারতের স্বধর্মের ইতিহাস ব্যাখ্যা করার সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক কর্মের আদর্শকে প্রথম স্পষ্ট ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন। এক নতুন চেতনার সৃষ্টি করলেন অচেতন এই জাতির অন্তরে। এমন অসাধারণ ছিল তাঁর লেখনী-কৌশল যে বিদেশী শাসকেরা তাদের সমস্ত আইন নিয়ে শত চেষ্টা করেও অরবিন্দের রচনাকে আইনের শৃঙ্খলে বাঁধতে পারত না। এইভাবেই সেদিন প্রাণধর্মী জাতীয়তার সৃষ্টি করেছিল বন্দেমাতরম্। এমনিভাবেই নববীর্যের অনুভূতির বন্যাধারা ভারতবর্ষে তিনিই প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে আর কোন সংবাদপত্রের ললাটে গৌরবের এমন উজ্জ্বল জয়টিকা আঁকা নেই। "সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়" আর কোন সংবাদপত্রে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবী এমনভাবে ঘোষিত ও প্রচারিত হয় নি।

শাসকবর্গ এইবার চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করতে কৃতসংকল্প হলেন। প্রথম আঘাত নেমে এলো যুগান্তরের ওপর। "২রা জুলাই পুলিশ সদলবলে আসিয়া যুগান্তর অফিসে হানা দিল, খানাতল্লাস করিল। ৫ই জুলাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদক হিসাবে গ্রেপ্তার হইলেন। ২২শে জুলাই বিচার আরম্ভ হইল।" যে দুইটি প্রবন্ধের জন্য যুগান্তরের বিরুদ্ধে মামলা আনা হয়েছিল, বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দ তার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। যুগান্তর ও বন্দেমাতরম্ আসলে একই টাকার এপিঠ-ওপিঠ। বিচারে ভূপেন্দ্রনাথের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হলো। তিনি হাসিমুখে কারাবরণ করলেন। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দ ভূপেন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করে একটি সম্পাদকীয় লিখলেন—তাঁর নির্ভীকতার প্রশংসা করলেন।

এবার সরকারের দৃষ্টি পড়ল বন্দেমাতরম্ ও সন্ধ্যা পত্রিকা দুটির উপর।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে না পারলে দেশে অশান্তির আগুন নিভবে না—প্রশমিত হবে না এই আন্দোলন। "৩০শে জুলাই বন্দেমাতরম্ অফিসে খানা-তল্লাসী হইল। অফিসে তখন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন, অরবিন্দ ছিলেন না। পুলিশ কতকগুলি বাজে কাগজপত্র হাতড়াইয়া লইয়া গেল।" ২৭শে ও ২৮শে জুন তারিখের বন্দেমাতরমে দুটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়; তার একটির শিরোনামা ছিল 'ভারতবাসীর জন্য ভারতবর্ষ' আর অপরটি 'দি যুগান্তর কেস' অর্থাৎ যুগান্তরের মামলা নিয়ে লেখা। পত্রিকার সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ এই অনুমানে এই দুটি আপত্তিজনক প্রবন্ধের জন্য ১৬ই আগস্ট তারিখে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু অরবিন্দই যে প্রবন্ধ দুটি লিখেছেন সেটা প্রমাণ করা দরকার। দরকার এই জন্য যে, সম্পাদক হিসাবে তাঁর নাম তখন ছাপা হত না। প্রমাণ করতে গেলে বড় সাক্ষী দরকার। বিপিনচন্দ্র পাল এই

পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অতএব সরকার পক্ষ থেকে তাঁকেই সাক্ষীরূপে আহ্বান করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ অভিযোগ আনা হয়েছে, এই সংবাদ পেয়েই রবীন্দ্রনাথ সেই রাজ-বিদ্রোহীর উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা করেন। সেই অবিস্মরণীয় কবিতাটির নাম 'নমস্কার'। অরবিন্দের বিপুল ত্যাগ ও দেশপ্রেমের অপূর্ব স্বীকৃতি এই বিখ্যাত কবিতাটি। এর ভিতর দিয়ে কবিগুরু অরবিন্দকে জানালেন তাঁর অকুণ্ঠ অভিনন্দন আর অন্তরের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা :

> "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার
> হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
> বাণীমূর্তি তুমি।"

২৬শে আগস্ট বন্দেমাতরমের মামলা উঠলো। চিত্তরঞ্জন এগিয়ে এলেন বিপিনচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করতে। আদালতে উপস্থিত হলেন বিপিনচন্দ্র। সাক্ষীকে চিরাচরিত প্রথামত শপথ নিতে বলা হলো। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিপিনচন্দ্র জলদগম্ভীর স্বরে বললেন: "এই মোকদ্দমায় সাহায্য করতে ও শপথ গ্রহণ করতে আমার আপত্তি আছে।" বিপিনচন্দ্র যখন কিছুতেই সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হলেন না, তখন আদালত অবমাননার দায়ে তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হলেন। বিচারে তাঁর ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। তিনি সাক্ষ্য না দেওয়াতে পুলিশের পক্ষে প্রমাণ করা কঠিন হলো যে, আপত্তিজনক প্রবন্ধ দুটির লেখক অরবিন্দ ঘোষ। সুতরাং তিনি সসম্মানে মুক্তিলাভ করলেন।

এর পরেই এলো সন্ধ্যার চাঞ্চল্যকর মামলা।

রাজদ্রোহের অভিযোগে ৩১শে আগস্ট উপাধ্যায় গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর সঙ্গে সন্ধ্যার ম্যানেজার সারদাচরণ সেনও গ্রেপ্তার হলেন।

'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে'—সন্ধ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটির জন্যই এর সম্পাদকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা আনা হয়। চিত্তরঞ্জন আসামীর পক্ষ সমর্থনে দাঁড়ালেন। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের এজলাসে এই মামলার বিচার আরম্ভ হয়। মামলার প্রথম দিনে প্রধান আসামীর জবানবন্দী হিসাবে আদালতের সামনে কৌসুলি চিত্তরঞ্জন তাঁর বক্তব্য রাখলেন এইভাবে: "আমি সন্ধ্যার এবং সন্ধ্যার প্রকাশিত আপত্তিজনক প্রবন্ধটির সমগ্র দায়িত্ব স্বীকার করছি, কিন্তু এই বিচারে আমি কোন অংশ গ্রহণ করতে নারাজ, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর-নির্দিষ্ট স্বরাজ ব্রতের সাধনে আমি সামান্য যেটুকু অংশ গ্রহণ করেছি সেজন্য আমি বিদেশী শাসকের কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত নই।" "ফিরিঙ্গির সাধ্য নেই আমাকে জেলে পাঠায়"—

এই কথা বলেছিলেন তিনি তাঁর বন্ধুদের। তাই হলো। মামলা চলবার সময়েই ১৯০৭, ২৭শে অক্টোবর ক্যাম্বেল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বন্দেমাতরমের মামলার পর স্বভাবতই অরবিন্দ জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ পদে আর প্রতিষ্ঠিত থাকা সমীচীন বোধ করলেন না। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থটিকেই তিনি বড় করে দেখলেন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদকে অন্যান্যের মতো তিনিও রাজনীতির সংস্রব থেকে মুক্ত রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। তাই আগস্ট মাসেই তিনি তাঁর পদত্যাগ পত্রখানি পরিষদের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বিদায়-অভিনন্দনের উত্তরে তিনি ছাত্রদের বললেন: "হে আমার প্রিয় ছাত্রবন্ধুগণ! তোমরা রাজনীতির সংস্রব থেকে দূরে না থেকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে, এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে দেশকে মাতৃভূমিকে সাক্ষাৎ জীবন্ত মা বলে জেনে সেবা করবে। মাতৃভূমির উন্নতি বিধানের জন্য কাজ করবে আর তাঁর আনন্দবর্ধনের জন্য দুঃখ বরণ করবে।"

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সৃষ্টি থেকে প্রথম এক বৎসরকাল অরবিন্দ এর অধ্যক্ষ ছিলেন। সেই একই সময়ে তিনি নিজেকে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট রেখেছিলেন। বিপিনচন্দ্রের কারাদণ্ডের পর স্বভাবতই বন্দেমাতরম্ সম্পাদনার প্রধান দায়িত্ব এখন অরবিন্দের উপর এসে পড়ল এবং তিনি যখন বক্তৃতা-সফরে কলকাতার বাইরে চলে যেতেন তখন এই দায়িত্ব তিনি ন্যস্ত করতেন শ্যামসুন্দরের উপর। বন্দেমাতরমের এই দ্বিতীয় পর্যায়ই এই পত্রিকার স্বল্পকাল-স্থায়ী জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবার অরবিন্দের নিজের জীবনেও এই সময়টা (১৯০৭-১৯০৮) ছিল তেমনি গুরুত্বপূর্ণ।

-কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বিপিনচন্দ্র বক্সার জেলে চলে গেলেন। আর রাজশক্তিকে কলা দেখিয়ে উপাধ্যায় লোকান্তর গমন করলেন। এমন অবস্থায় বাংলায় চরমপন্থীদের নেতৃত্ব অরবিন্দকেই গ্রহণ করতে হলো। ঘটনার স্রোত দ্রুত প্রবাহিত হয়ে চললো। ঠিক এই সময়ে বাংলার রাজনীতি আচম্বিতে এক নতুন মোড় নিলো—মডারেট ও চরমপন্থীদের মধ্যে সৃষ্টি হলো দারুণ বিভেদ এবং এর পিছনে ছিল ভারত সচিব লর্ড মর্লির বিষাক্ত হাত। সেই হাত দিয়েই চরমপন্থীদের শায়েস্তা করবার জন্য সরকার প্রয়োগ করলেন এই অভিনব ভেদনীতি। এবার দেশের রাজশক্তির কাছ থেকে এলো নতুন অত্যাচার। পয়লা নভেম্বর 'সিডিসন মিটিং এ্যাক্ট' পাশ হয়ে গেল। পরের দিনই অরবিন্দ বন্দেমাতরমে লিখলেন: 'হাউ টু মীট দি ইনএভিটেবল রিপ্রেসন'—কেমন করে এই অবশ্যম্ভাবী অত্যাচারের মোকাবিলা করতে হয়? এ স্বপ্নবিলাসীর কথা নয়, প্রকৃত বিপ্লবীর কথা। বুঝা গেল, বাংলাদেশে বিপ্লব আসতে আর বেশি বিলম্ব নেই। পয়লা নভেম্বরের বন্দেমাতরমেই এই আসন্ন সংগ্রামের সংবাদ ছিল। সেই সংবাদের মর্মার্থ ছিল এই:

"বারীন্দ্রের দল 'যুগান্তর' কাগজখানি প্রকাশের দায়িত্ব অন্য এক হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা মাতৃভূমির জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইলেন এবং চাঁপাতলায় যুগান্তর অফিসে যে গুপ্তসমিতির আড্ডা ছিল, তাহা অরবিন্দের পৈতৃক ভিটা মুরারীপুকুরের বাগানে উঠাইয়া লইয়া গেলেন।"

এই সময় থেকে সুরাট কংগ্রেস পর্যন্ত বন্দেমাতরমের পৃষ্ঠায় প্রায় প্রতিদিন অরবিন্দের লেখনীমুখে যেসব সম্পাদকীয় বেরুতো সেগুলির মধ্যে শোনা যেত আসন্ন বিপ্লবের আগমনী। দেশের অবস্থা ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দেখে, সরকার রাজদ্রোহ-উদ্দীপক সমস্ত সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করে দেবার জন্য এবার অগ্রসর হলেন। ইতিপূর্বে যেসব সংবাদপত্রে রাজদ্রোহ-মূলক লেখা প্রকাশিত হচ্ছিল, সরকার কঠিন হস্তেই সেগুলির কণ্ঠরোধ করেছেন। প্রকাশ্য বক্তৃতায় রাজদ্রোহের তুবড়ি ছোটে, অতএব সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে আইন পাশ হলো: "কোন সভা করিতে হইলে এক সপ্তাহ পূর্বে আবেদন করিতে হইবে। সভা করিতে দেওয়া হইবে কি হইবে না, তাহা স্থানীয় পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেটই সাব্যস্ত করিবেন।" গোখলের মতো মডারেট নেতা পর্যন্ত এই আইনের তীব্র নিন্দা করলেন।

কলম বন্ধ হলো। কণ্ঠরোধ হলো। অত্যাচার ও বিপ্লব এবার মুখোমুখী দাঁড়াল। এইবার আমরা প্রত্যক্ষ করব ইতিহাসের উদ্বেলিত তরঙ্গ। উপেন্দ্রনাথ লিখছেন: "এই সময় হইতে রাজদ্রোহের মামলার খুব ধূম লাগিয়া গেল। দুই সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই যুগান্তরের উপর আবার মামলা শুরু হইল এবং যুগান্তরের প্রিন্টার বসন্তকুমারকে জেলে যাইতে হইল। একে একে এরূপে অনেকগুলি ছেলে জেলে যাইতে লাগিল। তখন বারীন্দ্র বলিল, এরূপ বৃথা শক্তিক্ষয় করিয়া লাভ নাই। বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া গভর্নমেণ্টকে ধরাশায়ী করিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। এতদিন যাহা প্রচার করিয়া আসিলাম, তাহা এইবার কাজে করিয়া দেখাইতে হইবে। এই সঙ্কল্প হইতেই মাণিকতলার বাগানের সৃষ্টি।"*

ফ্রেজার-বধের পরিকল্পনা দিয়ে শুরু হয় বিপ্লবের উদ্বোধন। এণ্ড্রু ফ্রেজার তখন পশ্চিমবঙ্গের ছোট লাট। তাঁর মাথার দাম অনেক। ঘটনাস্থল মেদিনীপুর— ঘটনার তারিখ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯০৭। আরো একটি মাথা চিহ্নিত হয়েছিল— ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের মাথা। ইনিই তখন একে একে সমস্ত স্বদেশী সংবাদপত্রের সম্পাদকদের জেলে পুরবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন।

ফ্রেজার-বধের কাহিনী উপেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্র দুজনেই বর্ণনা করেছেন। তাঁদের উভয়ের বর্ণনা একত্রে মিলিয়ে যা পাওয়া যায় তার সারাংশ এই: মাণিকতলার

*নির্বাসিতের আত্মকথা: উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাগানে প্রথমে জন কুড়ি ছেলে এসে জুটেছিল বাংলাদেশের নানা জেলা থেকে। বারীন্দ্রই তখন বাগানের 'হেড মালি' অথবা বিপ্লবের ডেপুটি নেতা। ছেলে রিক্রুট করা, তাদের তৈরি করা, টাকা সংগ্রহ করা—প্রধানত এইসব কাজের দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। বোমা তৈরির কাজটা ছিল হেমচন্দ্রের নিজস্ব, তাঁর সহকারী ছিলেন উল্লাসকর দত্ত। বোমার আড্ডার যে পরামর্শ কমিটি ছিল তার প্রেসিডেণ্ট অবশ্য একজনই ছিলেন। তিনি অরবিন্দ ঘোষ। অবশ্য তিনি বাগানে ক্বচিৎ আসতেন।' তিনি সব সময়েই নেপথ্যের মানুষ। কারণ তিনিই তো আসল মস্তিষ্ক। ঠিক হলো ফ্রেজারকে মারতে হবে। কিন্তু তাঁর নাগাল পাওয়া কঠিন আর মারার পদ্ধতিটিই বা কিরকম হলে পরে প্রয়াসটায় ফুলার বধের পুনরুক্তি ঘটবে না।

অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করা হলো লাটের সেলুন ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিলেই কাজ হাসিল হতে বাধ্য। সংবাদ পাওয়া গেল যে, লাটসাহেব রাঁচি না কোথা থেকে কলকাতায় ফিরছেন স্পেশাল ট্রেনে। অনেক শলা পরামর্শের পর ঠিক হলো যে, মেদিনীপুরে গিয়ে নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে ঘাঁটি আগলাতে হবে। তারপর কোথায় কিভাবে কয়টা বোমা পুঁততে হবে তাও ঠিক হয়ে গেল। এবার হেমচন্দ্রের কথাতেই বাকীটুকু বিবৃত করি। তিনি লিখেছেন: "১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর বাংলার লাট ফ্রেজার সাহেবের গাড়ি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল—আমারই বাড়ির কাছে। বিভূতিকে খড়্গপুরের প্রায় দশ কি বারো মাইল দূরে নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত একটা নির্জন স্থানে রেল লাইনের তলায় কয়েক পাউণ্ড ডিনামাইট পুঁতে দিয়ে আসার জন্য পাঠানো হয়েছিল।" এরপর উপেন্দ্রনাথ বলেছেন: "বোমা ফাটিল, রেলও বাঁকিল—গাড়ি উড়িল না। তবে ইঞ্জিনখানা নাকি জখম হইল।"

প্রয়াস ব্যর্থ হলো, তবে দলের কেউ ধরা পড়ল না।

শুধু জনকয়েক রেলের নিরীহ কুলিকে ধরে সাজা দেওয়া হলো। কারণ, "বিপ্লববাদী বলে কোন জীবের অস্তিত্ব যে বাংলাদেশে থাকতে পারে, সে ধারণা তখনো বেঙ্গল পুলিশের গজায় নি।"

৭ই ডিসেম্বর। মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন বসল।

এই সম্মেলনে যোগদান করতে অরবিন্দ মেদিনীপুর রওনা হলেন। তিনিই তখন বাংলার চরমপন্থীদের অবিসম্বাদী নেতা। দেখা যাচ্ছে, "অরবিন্দ একই সময়ে এক হাতে প্রকাশ্য, আর এক হাতে অন্ধকারের রাজনীতি, সব্যসাচীর মতো পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। এমনটি আর কোন নেতা করেন নাই। বিপিন পালও নহেন, টিলকও নহেন।"

সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, মেদিনীপুর যাওয়ার আগে কলকাতায় চরমপন্থীদের এক বৈঠক হয়। সামনেই সুরাট কংগ্রেস। সেই কংগ্রেসে তাঁরা যোগদান করবেন কিনা, এটাই ছিল সেই বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কংগ্রেস তখনো পর্যন্ত মডারেটেদের দ্বারা কবলিত—তখনো পর্যন্ত ইহা নামে মাত্র কংগ্রেস, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'সেটা মজলিসের' অতিরিক্ত কিছু নয়। অরবিন্দ তাই মডারেট-অধ্যুষিত কংগ্রেস বর্জনের পক্ষে ছিলেন এবং এই সময়ে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় দুটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই মতবাদই প্রকাশ করেন এবং চরমপন্থীদের অনেকেই এর দ্বারা প্রভাবিত হন।

টিলক কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করতেন। "কংগ্রেস বর্জন করলে আত্মহত্যা করা হবে।"—এই কথা তিনি বাংলার চরমপন্থী নেতাদের লিখে পাঠালেন। কথাটা সকলের মনে লাগল। ঠিক হলো, কংগ্রেস বর্জন করার চেয়ে, বরং মডারেটদের কবল থেকে একে উদ্ধার করাই শ্রেয়। সুরাটেই এই শক্তি পরীক্ষা হবে।

"দরকার হলে মডারেটদের বাদ দিয়েই"—কনফারেন্সের কিছু আগেই বন্দে-মাতরম্ পত্রিকায় এই ধ্বনি তুলেছিলেন অরবিন্দ। মেদিনীপুরে তিনি নিজের এই কথা নিজেই প্রতিপন্ন করলেন। অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করলেন যে, পালে এখন নতুন হাওয়া লেগেছে। অর্থাৎ, সন্ত্রাসবাদ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্পষ্টতই এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। 'বেঙ্গলী' বনাম 'বন্দেমাতরম্' অর্থাৎ উভয় সংবাদপত্রে মসীযুদ্ধ সেদিন কম উপভোগ্য ছিল না। মেদিনীপুর সম্মেলনে তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। মডারেটরা বললেন আপসের কথা; জাতীয়তাবাদী দল বললেন বিপ্লবের কথা। ওঁরা বলেন রিফর্মের কথা, এঁরা বলেন পূর্ণ স্বাধীনতার কথা। শেষ পর্যন্ত পূর্ণ স্বাধীনতার জয়ধ্বনি করে চরমপন্থীরা কলকাতায় ফিরে এলেন।

॥ উনত্রিশ ॥

মেদিনীপুর থেকে ফিরে অবধি মুহূর্তের বিশ্রাম ছিল না অরবিন্দের। কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে সভাপতি পদের জন্য মডারেটরা নির্বাচিত করেছেন রাসবিহারী ঘোষকে। জাতীয়তাবাদী দল এর বিরোধিতা করে লোকমান্যকে সভাপতি করতে উদ্যত হলেন। তাই এবার বহুসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে যেতে হবে সেখানে। মফঃস্বলের জেলায় জেলায় চিঠি চলে গেল 'ডেলিগেট' পাঠাবার জন্য, টাকা পাঠাবার জন্য। সেই চিঠিতে স্বাক্ষর দিলেন অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি নেতারা। সুরাট কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদী দলের যোগদান শুধু শক্তি পরীক্ষার জন্য নয়, এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র। বাংলার বুকের উপর দিয়ে এই যে বিরাট আন্দোলন তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে বয়ে চলেছে, এসব দেখেও কংগ্রেসের মডারেট নেতাদের মনোভাবের কোন পরিবর্তনই হলো না।

জাতীয়তাবাদী নেতাদের নিয়ে অরবিন্দ সুরাট যাত্রা করলেন। তাঁর সুরাট গমনের একটি সুন্দর চিত্র পাই তাঁর কনিষ্ঠের লেখার মধ্যে: "আমি অরবিন্দ ও শ্যামসুন্দরবাবুর সহিত সুরাট যাত্রা করিলাম। বোম্বে মেল খড়্গপুরে আসিয়া থামিল। এমন সময় অরবিন্দ তাঁহার গাড়িতে আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন, গিয়া দেখি সেটাও তৃতীয় শ্রেণী, ভিতরে নরক গুলজার। প্রতি স্টেশনে ফুলের মালা, লুচি-মণ্ডা-মেঠাই ও চা। অনেক স্টেশনে বহুলোক নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল, অরবিন্দের সাক্ষাৎ বড় একটা কেহই প্রাণ ভরিয়া পায় নাই। কারণ সবারই ধারণা ছিল যে, দেশের একটা এতবড় গণ্যমান্য মানুষ নিশ্চয় প্রথম শ্রেণীতেই, অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসিতেছেন। কাজেই প্রথম শ্রেণী হইতে খুঁজিতে খুঁজিতে এই ক্ষীণজীবী নিরীহ মানুষটিকে তৃতীয় শ্রেণী হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে করিতে, এদিকে ট্রেন ছাড়িবার সময় হইয়া যায়।...বোধ হয় নাগপুর আর অমরাবতীতে কয়েক ঘণ্টার জন্য নামিতে হইয়াছিল। সেখানে সেজদার বক্তৃতা হইল, কিন্তু বক্তৃতাস্থানে লোক-সমুদ্র ঠেলিয়া যায় কার সাধ্য।...তাহার পর সুরাট। সে এক ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড। নবজাগ্রত ভারতের সে সকল স্বপ্নছবি ভুলিবার নয়।"

তাঁর এক জীবনীকার যথার্থই বলেছেন: "সুরাটের রঙ্গমঞ্চে অরবিন্দ একটা বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। সুরাটে নীরব অরবিন্দের নেতৃত্ব ইতিহাস রচনা করিয়াছিল। সুরাট কংগ্রেসে মডারেটদের সংস্রব ত্যাগ করা প্রয়োজন

হইয়াছিল। এই সংস্রব ত্যাগ করার দায়িত্ব অরবিন্দ নিজের স্কন্ধে বহন করিলেন।"

এইভাবেই সেদিন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুরাট নগরীতে 'সমবেতা যুযুৎসবঃ'—কৌরব ও পাণ্ডব—মডারেট ও চরমপন্থী পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। "স্টেশনের কাছেই কংগ্রেসের বড় তাঁবু। আর তার নিকটেই কৌরব শিবির—মডারেটদের ছোট ছোট তাঁবু। সাহেবীকেতায় সাজান; মিঃ মেটা—(বোম্বাইয়ের বিখ্যাত জননেতা ও কংগ্রেস-সভাপতি স্যর ফিরোজ শাহ মেটা) থাকিবেন, মিঃ সুরেন্দ্র ব্যানার্জি থাকিবেন। আর সুরাট নগরীর মাঝখানে পাণ্ডব শিবির—চরমপন্থী নেতাদের বসিবার জন্য কতকগুলি সেকেলে ভাঙা দেবমন্দির আর বাড়ি। একটা মন্দিরে টিলকের স্থান, আর একটা মন্দিরে অরবিন্দের স্থান।"

জাতীয়তাবাদী দলের সকল নেতাই—টিলক, খাপার্দে, মুঞ্জে, চিদম্বরম্ পিলে, হায়দার রেজা প্রভৃতি—এসেছেন সুরাট কংগ্রেসে। সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ দুটি মানুষের উপর—টিলক ও অরবিন্দ। কংগ্রেস বসবার তিন দিন আগেই টিলক ও অরবিন্দ সুরাটে এসে পৌঁছলেন। পৌঁছেই ঐদিন সন্ধ্যায় সুরাটবাসীদের আয়োজিত এক মহতী সভায় টিলক তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন যে, কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত চারটি প্রস্তাবই—স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা—যেন সুরাট কংগ্রেসেও অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। এর একটা কারণ ছিল। অরবিন্দ প্রমুখ নেতাদের আশঙ্কা ছিল, হয়ত বোম্বাইয়ের মডারেট-রথীবৃন্দ ঐ চারটি প্রস্তাব সুরাট কংগ্রেসে প্রত্যাহার করে নেবার জন্য প্রয়াস পাবেন। রাজনীতির পালের হাওয়াতে যেন তারই একটা ইঙ্গিত ছিল। ২৫শে ডিসেম্বর সকালে কংগ্রেসের মণ্ডপের নীচে প্রতিনিধিদের নিয়ে টিলক আর একটা সভা করলেন। আপসের কথা উঠল। কংগ্রেস হাজার হলেও আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। অনৈক্য জাতীয় সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করবে। তাই শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী দলের নেতারা ঠিক করলেন, মডারেটরা যদি কলকাতা কংগ্রেসের ঐ চারটি প্রস্তাব এই সুরাট কংগ্রেসে সমর্থন ও গ্রহণ করেন তাহলে জাতীয় দল ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের নির্বাচনে কোন বাধা দেবেন না। কথিত আছে, এই মর্মে অরবিন্দের স্বাক্ষরিত একটি 'চরমপত্র' কংগ্রেসের নেতাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মেঘ কিন্তু কাটল না। আপস-চেষ্টা ব্যর্থ হলো। ব্যর্থ হলো এই কারণে যে, কৌরব শিবির থেকে স্পষ্টত কোন আহ্বান বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো না। মেদিনীপুরের জয়লাভকে সামনে রেখেই অরবিন্দ বাংলার জাতীয়তাবাদী দলকে সুরাট কংগ্রেসে জয়যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ওদিকে প্রবীণ নেতারাও কংগ্রেসের উপর তাঁদের অধিকার অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। এমন অবস্থায় সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। সংঘর্ষের ক্ষেত্রটা প্রস্তুতই ছিল।

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯০৭।

সূর্যালোকিত মধ্যাহ্নে যথাবিধি কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হবার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ একজন সিন্ধী প্রতিনিধির মৃত্যুতে অধিবেশনের সময় পিছিয়ে যায় এবং বেলা আড়াইটা নাগাদ ইহা আরম্ভ হয়।

দুই শিবিরের নেতৃবর্গ একটা যেন উৎকণ্ঠার ভাব নিয়ে সভামণ্ডপে প্রবেশ করলেন ধীর মন্থর গতিতে। "সভাপতি যথাবিধি প্রস্তাবিত হইলেন। প্রস্তাবিত হইবার সময়েই মিঃ গোখলে নিজহাতে মিঃ টিলককে একখণ্ড প্রস্তাব-তালিকা দিলেন। এই প্রস্তাব তালিকায় কংগ্রেসের চারটি প্রস্তাব ছিল বটে, কিন্তু উহা আদি ও অকৃত্রিমভাবে ছিল না। সভাপতি প্রস্তাবিত হইলেন, কিন্তু সমর্থিত হওয়া তো চাই। অতএব সুরেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান হইলেন। যেই দণ্ডায়মান হওয়া, অমনি সভাস্থ বঙ্গদেশ চীৎকার করিয়া উঠিল—'রিমেমবার মেদিনীপুর'—কি সর্বনাশ! মধ্যপ্রদেশ চীৎকার করিয়া উঠিল—'রিমেমবার নাগপুর!'—কি বিপদ! নাগপুরেই এইবার কংগ্রেস হইবার কথা ছিল, মিঃ মেটা চালাকি করিয়া কংগ্রেসকে সুরাটে টানিয়া আনিয়াছেন।"

অতঃপর? প্রত্যক্ষদর্শী নেভিনসন লিখছেন: "সুরেন্দ্রনাথ বেগতিক দেখে লাফ দিয়ে টেবিলের উপর উঠলেন ও সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কেউই তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ মালভি গোলমাল থামাবার জন্য ঘণ্টা বাজালেন। কোন ফল হলো না। তিনি ঘোষণা করলেন—অধিবেশন স্থগিত রইল। পরের দিন, ২৭শে ডিসেম্বর, আবার কংগ্রেস বসল। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ তাঁর ভাষণ পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু বেশি দূর বলতে হলো না। মিঃ টিলক গম্ভীরভাবে গিয়ে মঞ্চের উপর উঠলেন, সভাপতির সম্মুখে দাঁড়ালেন এবং কিছু বলবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।"

সে এক অভিনব দৃশ্য। বাইশ বছরের কংগ্রেসের ইতিহাসে এমন দৃশ্যের অবতারণা কখনো কোন অধিবেশনে হয় নি। অতঃপর? নেভিনসন লিখছেন: "হঠাৎ বাতাসে ভেসে কি একটা বস্তু এসে পড়ল মঞ্চের উপরই—একটা জুতো—মারাঠী জুতো! লাল চামড়ায় তৈরি, সুঁচলো গোড়ালি, সেই জুতোর তলদেশ আগা গোড়া সীসা দিয়ে মোড়া। জুতোটি এসে সোজাসুজি প্রথমে সুরেন্দ্রনাথের গণ্ডদেশে আঘাত করল। তারপর সেখান থেকে ছিটকে ফিরোজ শাহ মেটার গায়ে লাগল। আমার দৃষ্টির সামনেই তুমুল গোলমাল ও উত্তেজনার মধ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে গেল। সুরাটে সেদিন আমি ভারতীয় রাজনীতিতে যেন একটা নতুন যুগের সূচনাই প্রত্যক্ষ করেছিলাম।"

নাটক কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মেদিনীপুরের পুনরুক্তি সুরাটেও হলো।

মডারেটরা পৃথক সভা করলেন। জাতীয়তাবাদীর দলও পৃথক সভা করলেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন অরবিন্দ। আর বক্তা টিলক। নেভিনসনের বর্ণনায় পাই: "গম্ভীর এবং নির্বাক—মিঃ অরবিন্দ ঘোষ এসে চেয়ারে বসলেন অবিচলিতভাব। তাঁর মুখে একটি কথাও শোনা গেল না। তাঁর দৃষ্টি ছিল দূর ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ। আর কোন রকম আবেগ বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে, ছোট ছোট বাক্যে মিঃ টিলক বক্তৃতা করতে লাগলেন ধীরভাবে। আকাশে নক্ষত্র দেখা না দেওয়া পর্যন্ত তিনি বক্তৃতা করেছিলেন—তখন কে যেন এসে তাঁর টেবিলের উপর একটি লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।"

সুরাটে চরমপন্থীদের বক্তব্য ছিল যে, জাতীয় কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতি অনুযায়ী যে রাজনৈতিক আন্দোলন তা মরীচিকা মাত্র। এই মতবাদকে আশ্রয় করেই জাতীয়তাবাদী দল টিলককে সম্মুখে রেখে যুদ্ধ করেছিলেন। ফলে মডারেট দলের নামজাদা রথীরা এখানে রীতিমত নাজেহাল হয়েছিলেন। এইভাবে সুরাট অধিবেশন পণ্ড হলো বটে, কিন্তু এর থেকেই সেদিন নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছিল। সে-ইতিহাসে মডারেটপন্থীদের আর কোন ভূমিকাই ছিল না। নেভিনসন যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "জুতো ছোঁড়াছুঁড়ির পর চক্ষের নিমেষে যেন কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটল আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে জেগে উঠলো একটা নতুন ভাব, একটা নতুন আদর্শ।" পনর বছর আগে অরবিন্দ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন—আবেদন নিবেদনের কংগ্রেসকে ভেঙে ফেলার স্বপ্ন—তাঁর সেই স্বপ্ন আজ যেন সফল হলো। তিনি সবলে আঘাত করে কংগ্রেসকে ভেঙে দিলেন।

সুরাটের কংগ্রেস ভেঙে দেওয়ার সকল দায়িত্ব ছিল স্বয়ং অরবিন্দের। এ কথাটা তাঁর একটি চিঠিতেই প্রকাশ পেয়েছে। এখানকার দক্ষযজ্ঞের সমগ্র বিষয়টি একটি পত্রে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করে তিনি লিখছেন: "যবনিকার অন্তরালে যেসব ঘটনা ঘটেছিল এবং যেসব ঘটনা সুনিশ্চিত ছিল, ইতিহাস কচিৎ সেসব বিবরণ লিপিবদ্ধ করে থাকে। ইতিহাস শুধু পর্দার সামনের ঘটনাকেই আমাদের সামনে উদ্ভাসিত করে তোলে। খুব কম লোকেই অবগত আছে যে, টিলকের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে আমিই যেসব নির্দেশ দিয়েছিলাম তারই ফলে কংগ্রেস ভেঙে যায়।" কী নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন তা জানা যায় না। তবে তাঁর এই উক্তির সমর্থন পাই ডাঃ মুঞ্জের লেখার মধ্যে। তিনি লিখেছেন: "অধিবেশনের প্রথম দিনেই সুরেন্দ্রনাথকে নাজেহাল করা হয়েছিল এবং তাঁকে বক্তৃতা করতে বাধা দেওয়া হয়। বাঙালি প্রতিনিধি দল তাঁর প্রতি একবাক্যে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—'মেদিনীপুরের বিশ্বাস ঘাতক' এই বলে। আমরা সেই ঐকতানে যোগ দিয়েছিলাম। অধিবেশন স্থগিত থাকার পর আমরা যখন শিবিরে ফিরে গেলাম, তখন সভায়

এইভাবে গোলমাল করার জন্য লোকমান্য আমাদের উপর একটু ক্রুদ্ধভাব প্রকাশ করলেন। অরবিন্দ তখন বললেন গোলমালটা আমারই নির্দেশে করা হয়েছিল এবং এটা করার প্রয়োজন ছিল। ভারতের রাজনীতি থেকে রাজভক্ত মডারেটরা একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যাক—ইতিহাস এই-ই চায়।"*

অরবিন্দ ইতিহাসের ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছিলেন। তাই কংগ্রেসকে ভেঙে ফেলতে তিনি দ্বিধা করেন নি। সুরাট কংগ্রেস সেদিন তাঁরই ললাটে জয়ের তিলক এঁকে দিয়েছিল।

সুরাট থেকে অরবিন্দ সরাসরি কলকাতায ফিবলেন না। ঐ অঞ্চলের কযেকটি স্থানে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। জাতীয়তাবাদী দলের নেতা হিসাবে তাঁর নাম তখন সকলের মুখে মুখে—তিনি কি বলেন তাই শুনবার জন্য সারা ভাবতেব লোক উৎকর্ণ হয়ে থাকতো। প্রকাশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে যদিও তিনি অল্পদিনই ছিলেন, তথাপি ঐ সমযের মধ্যে তিনি যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, ভারতবর্ষের খুব অল্প নেতাই (একমাত্র দেশবন্ধু ভিন্ন) তা করতে সক্ষম হয়েছেন। সুবাট থেকে তিনি প্রথমে যান বরোদায়। তাঁব কনিষ্ঠ সহোদর এই ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন। তাঁর বর্ণনা থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে দিলাম:

"সুরাট হইতে অববিন্দ আসিলেন গায়কোবাড়ের রাজধানী বরোদায়। অরবিন্দ আসিতেছেন শুনিয়া বরোদা কলেজেব প্রিন্সিপ্যাল আদেশ জাবী করেছিলেন যে, কোন ছাত্র যেন তাঁর অভ্যর্থনায় না যায়। স্টেশন হইতে কলেজ-গেটের পাশ দিয়াই পথ। আমাদের গাড়ি ঐ অবধি আসিবামাত্র সমস্ত কলেজ ভাঙিয়া ছাত্র বাহিব হইয়া আসিল ও ঘোড়া খুলিয়া বন্দেমাতরম্ রবে গাড়ি টানিতে লাগিয়া গেল। বরোদা যাত্রাব পূর্বেই আমি লেলেকে 'তার' করি যে, অববিন্দ তাঁব দর্শনাভিলাষী। বেলা আটটায় লেলে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাতে ও অরবিন্দে একান্তে আধ ঘণ্টা আলাপ হইল। তারপর ববোদায় তিনটি সভায় অরবিন্দ বক্তৃতা দেন; একবার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তারপর অরবিন্দকে আর কেহ পায় নাই। তখন দেশময় তাঁহাকে চায়।"

এই লেলের পুরো নাম শ্রীবিষ্ণু-ভাস্কর লেলে। ইনিই অরবিন্দের আত্মসমর্পণ-মন্ত্রের গুরু ছিলেন। লেলের সঙ্গে এই তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি গোয়ালিয়র থেকে বরোদায় এসেছিলেন বারীন্দ্রের তারবার্তা পেয়ে। কথিত আছে, সেই সময় তিনি একাদিক্রমে সাতদিন লেলের সঙ্গ করেছিলেন—দিবারাত্র দুজনেই মুখোমুখি ধ্যানে কাটিয়েছিলেন। বারীন্দ্র লিখেছেন: "কয়েকদিনের অনন্যমন সাধনায় লেলের

* রেমিনিসেনসেস অব টিলক: মুঞ্জে।

সমস্ত যোগবল অরবিন্দে সঞ্চারিত হইয়া গেল, মাত্র তিনদিনে তিনি অচল নীরব ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করলেন।" এরপর দেখা যায় যে, অরবিন্দের বক্তৃতার ধারা একেবারে পালটিয়ে যায়। "লেলের উপদেশে আগে বক্তব্য বিষয় ভাবিয়া-চিন্তিয়া বক্তৃতা দেওয়া ছাড়িয়া দিলেন। শান্ত হইয়া শূন্য মন লইয়া বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইবা মাত্র, আপনি অনর্গল কথার পর কথা কে যেন অন্তরে যোগাইয়া দিত।" প্রথম সাক্ষাতেই লেলে অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইতিমধ্যেই অরবিন্দ তাঁর নিজের চেষ্টাতেই সাধনার পথে বহুদূর এগিয়ে গেছেন।

বরোদার পরে বোম্বাই, পুণা, নাসিক ও অমরাবতী গেলেন অরবিন্দ। প্রত্যেক স্থানেই জনসাধারণ তাঁকে জানালো সাদর অভ্যর্থনা আর তিনিও প্রত্যেক স্থানে শোনালেন ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর অন্তরস্পর্শী অমৃতবাণী। প্রত্যেক বক্তৃতায় থাকতো জাতীয়তার নতুন ব্যাখ্যা, দেশপ্রেমের নতুন ভাষা। আর থাকতো স্বাধীনতা সংগ্রামে অকুণ্ঠভাবে যোগদান করার উদাত্ত আহ্বান। যে শুনলো, সেই-ই মুগ্ধ হলো। এ তো মামুলি বক্তৃতা নয়, এ যেন আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ অমোঘ বাণী।

এই সময়ে তিনি বোম্বাইতে ন্যাশনাল ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল: 'বর্তমান অবস্থায় আমাদের কর্তব্য।' এটি তাঁর একটি বিখ্যাত বক্তৃতা। মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে ধীর স্থির ভাবে তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশে বলতে লাগলেন: "আপনারা নিজেদের ন্যাশনালিস্ট বলে থাকেন। জাতীয়তা শব্দটির অর্থ কি? এ তো একটা রাজনৈতিক প্রোগ্রাম মাত্র নয়। এ হলো একটা ধর্ম যা এসেছে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে; এ হলো একটা বিশ্বাস যার মধ্যে আপনাদের বাঁচতে হবে।... বাংলা দেশের লোকের কাছে জাতীয়তা এসেছে একটি ধর্ম হিসাবেই এবং তাদের কাছে ইহা একটি ধর্ম বলেই স্বীকৃত। কিন্তু এই ধর্মের বিরোধী কতকগুলি শক্তি এর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। ইতিহাসে এ রকম প্রায়ই ঘটে থাকে যে, যখনই একটি নতুন ধর্ম প্রচার করা হয়, যখন মানুষের মধ্যে ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করতে উদ্যত হন, তখন সেই ধর্মকে বিনষ্ট করবার জন্য হাতের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেইসব বিরোধী শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে থাকে।... কিন্তু এইভাবে ন্যাশনালিজমকে ধ্বংস করা যায় নি। এ ধ্বংস হবার নয়। ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির মধ্যেই ইহা বেঁচে থাকবে, তাই একে ধ্বংস করা সম্ভব নয়—যত অস্ত্র-শস্ত্রই এর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হোক না কেন। জাতীয়তার মৃত্যু নেই; ইহা মরতে পারে না। ঈশ্বরকে মেরে ফেলা যায় না—তাঁকে কারারুদ্ধ করা যায় না।"

কী অকৃত্রিম, কী আবেগময় আর কী মর্মস্পর্শী এই ভাষণ। বরোদা,

বোম্বাই, পুণা, নাসিক, অমরাবতী, নাগপুর—সর্বত্রই অরবিন্দ বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন এবং প্রত্যেক স্থানেই দর্শকবৃন্দ নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাঁর বক্তৃতা শুনতো। নাগপুরে তাঁর বক্তৃতা ডাক্তার মুঞ্জে হিন্দীতে অনুবাদ করে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। অমরাবতীর জাতীয় বিদ্যালয়ে 'বন্দেমাতরম্' সম্পর্কে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেছিলেন তিনি। দেশের লোকের মনে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই অরবিন্দ বলেছিলেন: "য়ুরোপীয়দের জাতীয় সঙ্গীতের মতো আমাদের 'বন্দ্রেমাতরম্' কেবলমাত্র একটি জাতীয় সঙ্গীত নয়। ইহা একটি সুপবিত্র মন্ত্র। অনন্ত শক্তি নিহিত আছে এই মন্ত্রটির প্রত্যেকটি কথার মধ্যে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানে এই মন্ত্রের প্রথম প্রকাশ। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন একদিন আসবে যখন সমগ্র ভারত মুখরিত হয়ে উঠবে এই প্রাণদ মন্ত্রে আর তা প্রতিধ্বনিত হবে ভাবন্তের আকাশে বাতাসে, জলে-স্থলে, পত্র-মর্মরে, নদীর স্রোতে আর সাগর তরঙ্গে। আজ তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। দেশ যে একটি ভৌগোলিক সত্তা মাত্র নয়, দেশের যে একটি জীবন্ত আত্মা আছে, সেই অনুভূতিকেই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আজ প্রবুদ্ধ করে তুলেছে এই মহামন্ত্র বন্দেমাতরম্। বন্দেমাতরম্ পত্রিকার মাধ্যমে আমি গত এক বছর ধরে এই কথাটাই আমার দেশবাসীর কাছে অনবরত প্রচার করে আসছি।" পুণাতেও অরবিন্দ বক্তৃতা দেন এবং এখানকার বক্তৃতায় তিনি বিশেষভাবে তাঁর বাংলা দেশের অভিজ্ঞতার কথাই উল্লেখ করেন। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, সুরাট কংগ্রেসের পরবর্তী একটি মাস অর্থাৎ ইংরেজি নববর্ষ ১৯০৮-এর জানুয়ারি মাসটা অরবিন্দ এই ভাবে বক্তৃতা করে অতিবাহিত করেন। জনতার জয়ধ্বনি লাভ করবার জন্য তিনি বক্তৃতা করতেন না। বিশেষভাবে জীবন-ধর্মী জাতীয়তাবাদের দর্শনটাকে—যা তিনি এতদিন তাঁর কাগজের মাধ্যমে প্রচার করে আসছিলেন—আজ তিনি সকলের সামনে তুলে ধরলেন।

অরবিন্দ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন ১৯০৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে। জাতীয়তাবাদী নেতারা একে একে এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। গুপ্ত-সমিতির নেতা ও কর্মীবৃন্দও এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। প্রায় এক মাসের উপর তিনি বাংলার বাইরে ছিলেন, তাই স্বভাবতই তিনি এখানকার বর্তমান পরিস্থিতি জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বিগত বৎসরটি যে রকম ঘটনা-বহুল ছিল বর্তমান বৎসরটিও তার চেয়ে বেশি ঘটনা-বহুল হবে—এই কথা তিনি সবাইকেই বললেন। ভারতবর্ষের রাজনীতি এবার একটা মহাসন্ধিক্ষণে

এসে উপনীত হবে—এমন কথাও তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর কোন কোন অন্তরঙ্গ সতীর্থদের কাছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বৎসরটিতে তাঁর আশে-পাশে সবাই ছিলেন। ছিলেন না শুধু একজন। তিনি ভগিনী নিবেদিতা। তিনি তখন ইংল্যাণ্ডে।

কলকাতায় ফিরে এসে তিনি আবার ডুবে গেলেন তাঁর অক্লান্ত কর্মবৈচিত্র্যের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে। এখন আর কেবল বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ই নয়, শুধু বাংলা দেশই নয়, সারা ভারতই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল প্রেরণা পাবার জন্য। এখন থেকে তাঁর লেখনী ও কণ্ঠকে আশ্রয় করে দেশপ্রেমের সঙ্গীত যেন সাগর-তরঙ্গের মতো গর্জন করে উঠলো। জনচিত্তে জেগে ওঠে একটা অপূর্ব শিহরণ আর অনাস্বাদিত উন্মাদনা। তখনকার বন্দেমাতরমের অরবিন্দ দেশপ্রেমের এক চারণ কবি।

১৯০৭ সাল থেকেই সরকারের চণ্ডনীতিকে অরবিন্দ তাঁর কাগজে আত্মঘাতী বলে নির্দেশ করে আসছিলেন। প্রত্যক্ষ অত্যাচারকে জাতি যে শান্ত বা অহিংসভাবে গ্রহণ করবে না, এমন কথাও তিনি বলেছিলেন। বলেছিলেন: "এই অত্যাচারকে আমরা মহৎ কষ্ট স্বীকার দ্বারা বরণ করিয়া লইব, ফলে এমন আগুন জ্বলিবে যে, সিন্ধু ও গঙ্গা এই দুই নদ নদীর জলেও এই আগুন নিভিবে না।" সেই প্রত্যাশিত অগ্নিকাণ্ড এইবার আসন্ন হয়ে এলো। এইবার নূতন দৃশ্যের যবনিকা উঠলো মানিকতলায়।

বত্রিশ নম্বর মুরারিপুকুর বাগান রোড। স্থানটি প্রায় জনমানবশূন্য বললেই হয়। উঁচু পাঁচিল দেওয়া একটি বিরাট পরিত্যক্ত বাগান বাড়ি। কৃষ্ণধন ঘোষ উত্তর কলকাতার এই জনবিরল স্থানে অবস্থিত বাগান বাড়িটি ক্রয় করেছিলেন। খোলা বারান্দার একধারে একটি মাদুর বিছানো রয়েছে। তার উপর জনকয়েক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী বসে। তাদের মধ্যে একজন গীতা পড়ছেন। ছেলেরা শুনছে। সন্ন্যাসী গীতার ব্যাখ্যা করছেন: তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, ততো যুধ্যস্ব—শত্রুকে নিধন করে বীরের যা প্রাপ্য গৌরব—সেই বিজিত বসুন্ধরা ভোগ কর।

ছেলেরা গীতা শুনে চলে যায়। সন্ন্যাসীরা ভিতরে গেলেন। এই নির্জন বাগান বাড়িতেই ছিন্নমস্তার পূজায় বসেছেন সাগ্নিক পুরোহিতের দল। বারীন্দ্র উপেন্দ্র, হেমচন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র, উল্লাসকর—এমনি আরো অনেক বিপ্লবী সন্তান। প্যারিস থেকে বোমা তৈরি করার পদ্ধতিটা আয়ত্ত করে সদ্য ফিরেছেন হেমচন্দ্র, অরবিন্দের সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য, সেই আদিপর্ব থেকে। ইনিই সেদিন প্যারিসে অবস্থিত ভারতীয়দের কাছে অরবিন্দকে শুধু ভারতের একমাত্র আদর্শ নেতা বলে ক্ষান্ত হন নি, সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ বলে, বিশেষ করে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে

অদ্বিতীয় বলেও জাহির করেছিলেন। বত্রিশ নম্বর মুরারিপুকুর রোড বাইরে থেকে দেখতে বাগান বাড়ি, ভিতরে কিন্তু ছোটখাটো একটি কারখানা। বোমা তৈরি হচ্ছে। টেবিলের উপর লেবেল-আঁটা কয়েকটি বোতল। লেবেলের গায়ে লেখা সালফিউরিক এসিড, পিকরিক এসিড। একটি কিশোর ছেলে একমনে সাহায্য করছে হেমচন্দ্রকে। টেবিলের একধারে স্তূপীকৃত বোমা তৈরির অন্যান্য মালমশলা। সেগুলি তিনি যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করছেন। কাজ হচ্ছে নিঃশব্দে, একাগ্র মনে—ঠিক বৈজ্ঞানিক যেমনভাবে তাঁর ল্যাবোরেটরিতে বসে কাজ করে থাকেন। বারীন্দ্রের কাজ ছিল ছেলে সংগ্রহ করা। এ কাজের জন্য যেমন-তেমন ছেলে হলে চলবে না—যাদের কাছে জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য—এমনি একদল বেপরোয়া কিশোর ও তরুণ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সারা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়িয়ে। একাজে তিনি খুবই দক্ষ ছিলেন। শুধু ছেলে সংগ্রহ করা নয়, এখান-ওখান থেকে হাজার হাজার টাকাও তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। কিছু রিভলবার কিনেও মজুত করা হয়েছিল এই পরিত্যক্ত বাগান বাড়িতে। যাঁরা এই কাজের জন্য টাকা দিয়েছিলেন, কথিত আছে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই সময়ে অধৈর্য্য হয়ে বারীন্দ্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন—ওহে বারীন, কবে বোমা ফাটাবে? উত্তরে তিনি বলতেন—ফাটব ফাটব হয়েছে, আর দেরী নেই।

অবশেষে একদিন বিস্ফোরণ ঘটলো চন্দননগরে।

১১ই এপ্রিল, ১৯০৮। এই সময়ে মঁসিয়ে তার্দিভেল এখানকার মেয়র ছিলেন। তিনি স্থানীয় শাসককে অপসারিত করে চন্দননগর থেকে স্বদেশী প্রচার বন্ধ করতে মনস্থ করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই ব্রিটিশ ভারতের এই ফরাসী উপনিবেশটি ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিল স্বদেশী প্রচারের একটি কেন্দ্র এবং বিপ্লবের একটি উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান। কানাইলাল দত্ত এখানকারই সন্তান। চন্দননগরের বিপ্লবী সমিতি থেকে তিনি মানিকতলার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। স্থানীয় তরুণদের মন তার্দিভেলের উপর তিক্ত হয়ে উঠলো। তাঁরা ঠিক করলেন—অত্যাচারী মঁসিয়ে তার্দিভেলকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে অপসারিত করতে হবে। "তারপর ১১ই এপ্রিল, ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে মঃ তার্দিভেল স্বগৃহে যখন নৈশভোজে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহার গৃহে বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু সে বোমা বিদীর্ণ হইল না। মঁসিয়ে তার্দিভেল প্রাণে বাঁচিলেন। সারা শহরে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল।...তিনি তল্পি-তল্পা বাঁধিয়া ফ্রান্সে প্রস্থান করিলেন।"*

* আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী : মতিলাল রায়।

এর পরেই কাল-বৈশাখীর ঝড় নিয়ে দেখা দিল সন্ত্রাসবাদ। বিপ্লবীরা নির্ভীকচিত্তে অগ্রসর হয় তাদের লক্ষ্যের পথে। বিপ্লবের যজ্ঞে শেষ আহুতি প্রদানের জন্য তারা প্রস্তুত হয়। ঠিক হলো এবার কিংসফোর্ডকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের অত্যাচারের মাত্রা তখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি কাগজের রাজদ্রোহের মামলায় তিনি অনেককে শাস্তি দিয়েছেন। চৌদ্দ বছরের বালক সুশীল সেনকে চৌদ্দ ঘা বেত মারবার হুকুম তিনিই দিয়েছিলেন। এই সুশীলও মানিকতলার কাজে যোগ দিয়েছিল। কিংসফোর্ডকে নিধন করবার প্রথম চেষ্টা হয় কলকাতায় 'বুক-বম্' দিয়ে। রাউলাট কমিটি বা সিডিসন কমিটির* রিপোর্টে বলা হয়েছে, "একখানি বড় বইয়ের মাঝখানে পাতা কাটিয়া ফেলিয়া জায়গা করিয়া একটা বোমা এমনভাবে রাখা হয় যে, বই খুলিতে গেলেই বোমাটি ফাটিয়া যাইবে। মিঃ কিংসফোর্ডের হাতে তাঁর টালিগঞ্জের বাড়িতে বোমাসমেত বইটি দেওয়া হয়। বইটি তিনি না খুলিয়াই আলমারীতে রাখিয়া দেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন তাঁহার নিকট হইতে হয়ত কেহ বই ধার করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাই তিনি পার্শেলটি আর খোলেন নাই।"

এই কিংসফোর্ড-বধের আদেশ দিয়েছিলেন স্বয়ং অরবিন্দ—একথা পরবর্তীকালে বারীন্দ্র নিজেই বলেছিলেন। বোমা ফাটল না, কিন্তু কিংসফোর্ড আর কলকাতায় থাকা কিছুতেই নিরাপদ মনে করলেন না। মৃত্যুকে এড়িয়ে তিনি বদলি হয়ে চলে গেলেন মজঃফরপুরে। বিপ্লবের হাত তখন প্রসারিত হলো মজঃফরপুর পর্যন্ত। কিন্তু এ-কাজের ভার নেবে কে? এগিয়ে আসে কিশোর ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী। মুরারিপুকুর বাগান বাড়ির অভ্যন্তরস্থ একটি গোপন মন্দির-কক্ষে বিরাজ করছেন দেশজননী, রুধির-রসনা কপালিনী খড়্গাধারিণী শবাসনা শ্যামা জননীর রূপে। সেই কালী মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে শপথ নিলো ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল—হয় কার্যসিদ্ধি, না হয় মৃত্যু। বারীন্দ্র একটি ছোট হ্যাণ্ড ব্যাগ তাদের হাতে তুলে দিয়ে বলেন, এর মধ্যে আছে। জয়ী হয়ে ফিরে এসো।

১লা মে, ১৯০৮।

বৈশাখের উজ্জ্বল প্রভাতে উজ্জ্বল কালির অক্ষরে মজঃফরপুরে বোমা বিদীর্ণ হওয়ার সংবাদ সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হলো। ৩০শে এপ্রিল। রাত্রিকাল। রাস্তার ধারে ছায়া নিবিড় একটি গাছের অন্তরালে দাঁড়িয়ে প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরাম। দূরে একটা ফিটনের শব্দ শোনা গেল। কিংসফোর্ডের ফিটন আসছে, বোধ হয়, অনুচ্চস্বরে প্রফুল্ল বলে তার সঙ্গীকে। দুজনেই প্রস্তুত হয়। দুজনেই পকেট থেকে

* বাংলায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তদন্তের জন্য ১৯১৮ সালে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল।

হাত বোমা বের করে নেয়। ঘন্টি বাজাতে বাজাতে ফিটনটি তাদের সামনে এসে পড়ল। দুদিক থেকে অন্ধকারে তারা গাড়িটিকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল আওয়াজ। দুজন দুদিকে ছুটে পালায়। গাড়িতে আগুন ধরে গেল। কিন্তু এমনই বরাত জোর, কিংসফোর্ড মরলেন না—মরলেন মিসেস কেনেডি ও তাঁর মেয়ে। ভাগ্যচক্রে এবারও কিংসফোর্ড বাঁচলেন। ফিটনটা তাঁরই ফিটনের মতো দেখতে ছিল এবং সেই ফিটনে চড়ে মিসেস কেনেডি কন্যাসহ স্থানীয় প্ল্যানটার্স ক্লাব থেকে স্বগৃহে ফিরছিলেন। কিংসফোর্ড প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই ক্লাবেই আসতেন। বোমার আঘাতে এই দু'জন নিরপরাধা মহিলার মৃত্যু হলো। অদৃষ্টের পরিহাস! মানিকতলার বিপ্লব প্রথম প্রচেষ্টায় অভিশপ্ত হলো।

প্রফুল্ল ধরা পড়বার সময় নিজের হাতেরই রিভলবার দিয়ে নিজের জীবন নষ্ট করেছিলেন। ক্ষুদিরামের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সে ধরা পড়ে। উনিশ বছরেব ছেলে ক্ষুদিরাম মজঃফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যানের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর জবানবন্দীতে বলেছিলেন: "আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু। আমার পিতার নাম ৺ত্রৈলোক্যনাথ বসু। জাতিতে আমি কায়স্থ এবং পেশায় আমি ছাত্র। আমার বাড়ি মেদিনীপুর জেলার হবিবপুরে। আমি মেদিনীপুর শহরে বাস করি।" মজঃফরপুরের দায়রা জজের বিচারে ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। হাইকোর্টে আপিল করেও কোন ফল হয় নি। ১১ই আগস্ট, ১৯০৮, মজঃফরপুর জেলে সকাল ছয়টায় ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। গণ্ডক নদের তীরে, সেই কিশোর বিপ্লবীর চিতাগ্নিতে কি ভারতের আকাশ সেদিন রাঙিয়ে উঠেছিল?

২রা মে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হলেন। ঐদিন বাংলার সর্বত্র এবং বাংলার বাইরে দেওঘরে পুলিশ বেড়াজাল ফেললো। সেদিন কে-কে কোথায়-কোথায় ধরা পড়েছিলেন, তা পাঠকদের জানার কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। এখানে আমরা তার তালিকা দিলাম। কারণ পাইকারি হারে এমন ধর-পাকড় এর আগে বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও দেখা যায় নি। কলকাতায় বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেপ্তার হলেন কানাইলাল দত্ত, নির্মল বা নিরাপদ রায়, ধরণীধর গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অশোক নন্দী, হেমচন্দ্র কানুনগো, অরবিন্দ ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন বসু, মানিকতলার বাগানে গ্রেপ্তার হলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, বিভূতিভূষণ সরকার, নলিনীকান্ত গুপ্ত, শচীন সেন, শিশির ঘোষ, নরেন বক্সী, পরেশ মৌলিক, বিজয় নাগ, কুঞ্জলাল সাহা, পূর্ণচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র ঘোষ; মেদিনীপুরে—সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এর কিছুদিন পরে, ধৃত আসামীদের স্বীকারোক্তি ও মুরারীপুকুর বাগানে অন্য কাগজপত্র দেখে বাংলার

বিভিন্ন স্থান থেকে যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন নরেন গোঁসাই, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, সুধীর সরকার, হেম সেন, সুশীল সেন ও বীরেন সেন। এরও পরে গ্রেপ্তার হন প্রভাসচন্দ্র সেন, কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ নন্দী, দেবব্রত বসু, বিজয় ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর রায়-মৌলিক, চারুচন্দ্র রায়। মুরারিপুকুর বাগানে পাওয়া যায় বোমার খোল-ঢালাইয়ের যন্ত্রপাতি, রিভলবার, বন্দুক, রাইফেল, ডিনামাইট, বিস্ফোরক শিক্ষার বই, গুপ্তসমিতির গঠনপ্রণালী। হ্যারিসন রোডে পুলিশ পায় কয়েক বাক্স বোমা, বিস্ফোরক তৈরির যন্ত্রপাতি ও মশলা।

অরবিন্দ তখন থাকতেন আট নম্বর গ্রে স্ট্রীটে (বর্তমানে অরবিন্দ সরণি)। পুলিশ যখন অতর্কিতে হানা দিয়ে অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে তখন ঐখানে তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নী সরোজিনী ব্যতীত তাঁর পত্নী মৃণালিনী দেবীও উপস্থিত ছিলেন। স্বামীর গ্রেপ্তারে তাঁর মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যের উপেক্ষিতার' মতো বাংলার বিপ্লব-ইতিহাসে মৃণালিনী দেবী শুধু উপেক্ষিতা নন, একেবারে বিস্মৃতাও। সে কথা থাক। পুলিশ এখানে কি কি মাল-মশলা পেয়েছিল তা জানবার কৌতূহল আমাদের থাকা স্বাভাবিক। সে-কৌতূহল নিরসন করে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই লিখেছেন: "মনে পড়ে ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধচিত্তে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে—এটা কী নূতন ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না। শেষে ইহা মাটি ভিন্ন আর কিছু নয় এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠান অনাবশ্যক—এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়।"* গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতে খানাতল্লাসী চলেছিল পাঁচ ঘণ্টা—ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত। বাড়িটা ছিল দোতলা। একতলায় থাকতেন অরবিন্দের দেহরক্ষী অবিনাশ ভট্টাচার্য ও শৈলেন্দ্রনাথ বসু। তাঁদেরও গ্রেপ্তার করে হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দিয়ে উপরে আনা হয়। আজ, এই সুদূর কালের ব্যবধানে, এই ঘটনা আমরা যখন স্মরণ করি, তখন আমরা ভেবে বিস্মিত হই কী অবিচলিত চিত্তেই না তিনি সেই পাঁচঘণ্টাব্যাপী খানাতল্লাসী-জনিত মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন। একেই বলে বিপ্লবী।

এইভাবেই শুরু হয় আলিপুর বোমার মামলা। ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে ইহাই সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক মামলা। এমন রোমাঞ্চকর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মামলা এর আগে বা পরে এই দেশে আর কখনো হয় নি। এই চাঞ্চল্য বা রোমাঞ্চের কেন্দ্র ছিলেন একজন। তিনি অরবিন্দ ঘোষ। এত বড় একজন

* কারাকাহিনী: শ্রীঅরবিন্দ।

দেশনেতা আজ দেশের জন্য গ্রেপ্তার হয়ে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়েছেন রাজশক্তি আর শাসকের বিরুদ্ধে, রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে যুদ্ধঘোষণা করার অপরাধে —এই সংবাদটা সেদিন যেন সারা ভারতবর্ষে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল।

ইতিহাসে আলিপুর বোমার মামলা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে প্রধানত দুটি কারণে— প্রথম, অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে প্রধান আসামী ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় ঋষিতুল্য একজন দেশপ্রেমিক। দ্বিতীয়—এই মামলার কৌসুলিরূপে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের অপূর্ব সওয়াল—রাজনৈতিক মামলার ইতিহাসে যা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। অরবিন্দের মুক্তি-কামনায় তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিভা নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু এই মামলাটি প্রাধান্য লাভ করেছে আরো একটি কারণে। বাংলার বিপ্লব-সাহিত্যে বা বিপ্লবীদের স্মৃতিকথায় তার বড় একটা উল্লেখও আমরা দেখি না। এই মামলার প্রথম শুনানী হয় মিঃ বার্লির কোর্টে—১৯শে মে থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর। পুলিশের প্রথম কাজ ছিল ধৃত আসামীদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা। পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট রামসদয় সেনের উপর সরকার এই কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, উল্লাস প্রভৃতি কয়েকজন অরবিন্দকে বাঁচিয়ে পুলিশের কাছে অপরাধ স্বীকার করেন এবং তাঁরা মুক্তকণ্ঠে বিপ্লবের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু একজন বিশ্বাসঘাতক, অরবিন্দকে জড়িয়েই, তার অপরাধ স্বীকার করল। তার নাম নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বা নরেন গোঁসাই। সে রাজসাক্ষী হয়েছিল এই প্রলোভনে যে, দণ্ড থেকে সে অব্যাহতি পাবে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক জানত না যে, তার সতীর্থদের হস্তেই তার মৃত্যুদণ্ড অবধারিত ছিল। তখন আলিপুর জেলের মধ্যেই বাংলার এই প্রথম বিশ্বাসঘাতকের প্রাণনাশের চেষ্টা হয়। বাংলার এই প্রথম বিভীষণের রক্ত-তর্পণ করবার দুঃসাহসিক প্রয়াস নিয়েছিলেন ধৃত আসামীদের মধ্যে দুজন তরুণ বিপ্লবী—কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তাঁরাই সেদিন তাঁদের প্রাণ দিয়ে প্রধান আসামীর জীবনরক্ষা করেছিলেন—রাজসাক্ষীর প্রদত্ত সকল সাক্ষ্য ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।

"১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর। ভাদ্রের তীক্ষ্ন সূর্যকিরণ্ সোনার বর্ণে দেখা দিয়েছে। এই দিনটি বিপ্লবেতিহাসের পৃষ্ঠায় রক্তাক্ষরে লেখা থাকিবে—বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্বাধীনতান্দোলনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার প্রথম বিশ্বাসঘাতক বিপ্লবী শহীদদের হস্তেই নিপাতিত হইয়াছে।" বিচারে কানাই ও সত্যেনের ফাঁসি হয়। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে শহীদ কানাইলালের মৃতদেহ সৎকারের সময় এক লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছিল। কানাইলালের ফাঁসি হয় ১০ই নভেম্বর, ১৯০৮। সত্যেনের ফাঁসি পরে হয়েছিল।

আর ৯ই নভেম্বর বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন পুলিশ ইনস্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি। ইনিই মোকামাঘাটে প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি থেকেই সেদিন সরকার বুঝতে পেরেছিলেন যে, কলকাতায় বিপ্লব-সংহতি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়েছে। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, ও সত্যেন—মৃত্যুঞ্জয়ী এই বিপ্লবী চতুষ্টয়কে বাঙালি কোনদিনই বিস্মৃত হবে না। '১৯শে মে থেকে বার্লি সাহেব ১২ই সেপ্টেম্বর অবধি তদন্ত চালিয়ে আটত্রিশজনকে দায়রায় সোপর্দ করলেন। আলিপুরের দায়রা জজ তখন ছিলেন সিভিলিয়ান বীচক্রফট। ইনি কেমব্রিজে অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন ও পরে তাঁরই সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯শে অক্টোবর দায়রার বিচার আরম্ভ হলো। সেসন্স কোর্টে মিঃ বীচক্রফটের সঙ্গে দুজন বাঙালি জুরি বা এসেসর ছিলেন।

এই মামলায় সরকার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন প্রখ্যাত ইংরেজ ব্যারিস্টার ইয়ার্ডলি নর্টন। আর সরকার পক্ষে এই মামলা পরিচালনা করেন শামসুল হুদা—তৎকালীন পুলিশের কুখ্যাত ডেপুটি সুপার। পুলিশের দিক থেকে অরবিন্দকে দেশব্যাপী বোমার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে দেবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। সাক্ষীসাবুদ, রাশিকৃত বিস্ফোরক পদার্থ ও কাগজপত্র সেইভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। কিন্তু তথাপি সরকার পক্ষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়, অরবিন্দ সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হন ও সগৌরবে মুক্তিলাভ করেন। ২৩শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ—একাদিক্রমে এই নয়দিন চিত্তরঞ্জন যে সওয়াল-জবাব করেছিলেন তা ইতিহাস হয়ে আছে। নর্টনের সঙ্গে তাঁর যে বাগ্‌যুদ্ধ হয়েছিল এবং তাতে চিত্তরঞ্জন যে নৈপুণ্য প্রকাশ করেছিলেন, ভারতবর্ষের কোন আদালতে আর কোন রাজনৈতিক মামলায় তা দেখা যায় নি। তাঁর শেষ নয়দিনের সওয়াল তথাকথিত সওয়ালমাত্র ছিল না—প্রকৃতপক্ষে তা ছিল মহাকাব্যের ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত এক অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি। তাঁর এই অভিভাষণ জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার অপূর্ব নিদর্শন হয়ে আছে। স্বদেশপ্রেম অথবা পরশাসন থেকে নিজের দেশকে মুক্ত করবার চেষ্টা, কোনো আইনেই এটা যে অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না—এই শাশ্বত সত্যটাকেই চিত্তরঞ্জন এই মামলাকে ও এই মামলার প্রধান আসামী অরবিন্দকে উপলক্ষ্য করে পৃথিবীর সামনে সেদিন জীবন্ত ভাষায় তুলে ধরেছিলেন। তাই ইতিহাসে আলিপুর বোমার মামলা, এর বিচারক, আসামী বা সাক্ষীসাবুদের স্থান গৌণ, মুখ্য হয়ে আছে শুধু চিত্তরঞ্জনের এই অপূর্ব সওয়াল। থাকবেও চিরকাল।

১৯০৯, ৩১শে মার্চ আজ বিচারের শেষ দিন। সওয়ালেরও শেষ দিন। সব্যসাচীর মতো দৃপ্তভঙ্গিতে আদালত-কক্ষে প্রবেশ করলেন ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ। উপস্থিত সকলের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে নিবদ্ধ হয় তাঁর উপর। তাঁর আজকের

অভিভাষণের উপর সবকিছু নির্ভর করছে—নির্ভর করছে প্রধান আসামী অরবিন্দের দণ্ড অথবা মুক্তি। যখন তিনি কখনো জজ, কখনো বা জুরি দুজনকে লক্ষ্য করে জলদগম্ভীরস্বরে ওজস্বিনীভাষায় তাঁর সওয়াল শেষ করেন, তখন সমস্ত আদালত-গৃহ কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ প্রতীয়মান হয়েছিল। প্রচুর জনসমাগম সত্ত্বেও মনে হয়েছিল সেখানে বুঝি একটি জনপ্রাণীও উপস্থিত নেই। আসামী, ফরিয়াদী, জজ, জুরি, উকিল, ব্যারিস্টার, দর্শকবৃন্দ যেন নিস্পন্দ মনে হয়েছিল। ১৩ই এপ্রিল জুরি দুজন তাঁদের অভিমত জানালেন বিচারককে—প্রধান আসামী অরবিন্দ ঘোষকে তাঁরা নির্দোষ বলে ঘোষণা করলেন। এর প্রায় একমাস পরে, ৬ই মে, রায় প্রকাশিত হলো। জুরিদের অভিমত গ্রহণ করে বীচক্রফট অরবিন্দকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করলেন এবং তিনি সসম্মানে মুক্তিলাভ করলেন।

আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে অরবিন্দ বলেছিলেন: "আমি দেশের স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করেছি, এইটি যদি আইন-বিরুদ্ধ হয় তাহলে আমি স্বীকার করছি যে আমি দোষী...স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা যদি অপরাধ হয় আমি তা করেছি, আর আমি যা করেছি তা আমি কেন অস্বীকার করব? এরই জন্য আমি আমার জীবনের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি, এরই জন্য আমি কলকাতায় এসেছিলাম, এরই জন্য জীবন ধারণ করেছি, শ্রম স্বীকার করেছি। এইটিই হয়েছে আমার জাগরণের, আমার নিদ্রার স্বপ্ন। এইটিই যদি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয় তাহলে আর সাক্ষীসাবুদের কি প্রয়োজন? আমি এখানে বর্তমান, আমি এ অভিযোগ স্বীকার করে নিচ্ছি।· পাশ্চাত্য রাজনীতির তত্ত্বগুলি আমি গ্রহণ করেছি এবং তাহাদের সহিত বেদান্তের অমর শিক্ষার সমন্বয় করেছি। আমার সকল লেখায় আমি এই আদর্শই প্রচার করেছি, ইহাই আমার জীবনের ব্রত বলে আমি অনুভব করেছি। আমি অনুভব করেছি, আমার কাজ হচ্ছে আমার দেশবাসীকে বলা, তাদের উপলব্ধি করান যে, জগতের জাতিসকলের মধ্যে ভারতের বিশিষ্ট অবদান আছে, ভারতের একটা মিশন আছে, সমগ্র মানবজাতির জন্য ভারতকে তা করতে হবে। এইটিই যদি আমাব অপরাধ হয়, আপনাদের আইনে যে শাস্তি আছে আমাকে দিন, আপনারা আমাকে কারারুদ্ধ করতে পারেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারেন। কিন্তু আমার এই অপরাধ আমি কিছুতেই অস্বীকার করব না। আমি অকুণ্ঠভাবে বলতে চাই যে, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা আইনের কোন ধারা মতেই অপরাধ নয়।"

আলিপুর বোমার মামলায় প্রধান আসামীর এই বলিষ্ঠ স্বীকারোক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল সেদিন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে—তা হিংসার

পথেই হোক বা অহিংসার পথেই হোক—এই মৌলিক অধিকারকে শুধু প্রচার করে নয়, তাকে আমাদের রাজনৈতিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করে শ্রীঅরবিন্দ যে কত বড় একটা বৈপ্লবিক কাজ সমাধা করে গিয়েছেন, মহাকালের বিচারে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। মজঃফরপুরের বিস্ফোরণ হয়ত সাময়িক ছিল, কিন্তু তাঁর অগ্নিগর্ভ চিন্তার এই যে বিস্ফোরণ, এ যেমন সুদূরপ্রসারী তেমনি চিরস্থায়ী হয়েছিল। তাই একথা আজ মুক্তকণ্ঠে বলবার দিন এসেছে যে, "বাংলাব স্বদেশী যুগ অরবিন্দের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ দিয়াছে। এবং অরবিন্দের কৌঁসুলি চিত্তরঞ্জন দাশ এই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শকে ইংরেজের আদালতে বৈধ বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইয়াছেন।"

স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে যে অভিনব শক্তির উদ্বোধন অরবিন্দ করে দিয়েছিলেন, ভারতের পরবর্তী জাতীয় আন্দোলনকে তাই ই ধরে রেখেছিল। সেই শক্তির উৎস—পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অধিকারের দাবী। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে অরবিন্দের এই ভূমিকটি অনুধাবন করেই না রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নমস্কার জানিয়ে লিখেছিলেন:

"তোমা লাগি নহে মান
নহে ধন, নহে সুখ, কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষালাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছো জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন।"

॥ ত্রিশ ॥

১৯০৯, ৬ই মে কারামুক্ত হলেন অরবিন্দ।

নতুন মানুষ হয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন আলিপুর আশ্রম থেকে।

বাইরে এসে দেখেন যজ্ঞানল প্রায় নির্বাপিত হয়ে এসেছে। জেলে থাকতেই তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন যে বাংলার জাতীয়তাবাদী নয়জন নেতা রেগুলেশন আইনে ধৃত হয়ে বিনা বিচারে নির্বাসিত হয়েছেন। এই স্মরণীয় নয়জনের নাম: শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, পুলিনবিহারী দাস ও ভূপেন্দ্রচন্দ্র নাগ। পুলিনদাসের নির্বাসনে পূর্ববঙ্গের অনুশীলন সমিতির মেরুদণ্ড ভেঙে গেল। এঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ১৯০৮ সালের ১১ই/১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে। এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য এবং রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো নতুন দফা শাসন সংস্কার। ১৭ই ডিসেম্বর ভারতসচিব লর্ড মর্লি ভারতবর্ষের জন্য শাসন সংস্কার প্রকাশ করেন। মডারেটরা স্বভাবতই এতে আশ্বস্ত হলেন। ১৯০৮-এর কংগ্রেস অধিবেশন যথারীতি বসল মাদ্রাজে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। সভাপতি ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ। সভাপতির ভাষণে বিনাবিচারে নির্বাসনকে "অতীতের বর্বরতার চিহ্ন" বলে নিন্দা করা হলো। সেই সঙ্গে তিনি সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা রাজনৈতিক গুপ্তহত্যারও নিন্দা করলেন।

নেতারা নির্বাসনে, কর্মীরা জেলে বা দ্বীপান্তরে—এমন অবস্থায় স্বদেশী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসাই স্বাভাবিক ছিল। মুরারিপুকুর বাগানে হানা দেবার পর থেকেই পুলিশের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশের সর্বত্র যেন গ্রেপ্তারের ধূম পড়ে গেল। এখানে-ওখানে বহুলোক গ্রেপ্তার হয়। এক মেদিনীপুরেই প্রায় একশো লোক ধরা হলো। শুধু কি মানুষ ধরা হলো? সারা বাংলার অনুশীলন সমিতি, কলকাতার আত্মোন্নতি-সমিতি, বরিশালের বান্ধব-সমিতি প্রভৃতি যেখানে যত সমিতি ছিল সেগুলিও রেহাই পেল না। ব্যাপক ধর-পাকড়ের সঙ্গে বাংলাদেশে অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ভারত-সরকার তখন তাঁদের অস্ত্রশালায় একটি নতুন অস্ত্র নির্মাণ করলেন যার নাম হলো ১৯০৮-এর ক্রিমিন্যাল ল য়্যামেণ্ডমেণ্ট য়্যাক্ট অর্থাৎ সংশোধিত ফৌজদারি কার্যবিধি। সমিতিগুলি এই আইনের দ্বারা বে-আইনী ঘোষিত হয়। বিশেষ আদালতে

বিচারের ব্যবস্থা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করে সোজাসুজি বিশেষ আদালতে মামলা পাঠাবেন। তিনজন হাইকোর্টের জজ একত্রে রায় দেবেন। এর পর আর আপীল করার রাস্তা থাকল না। যুগান্তর, বন্দেমাতরম্, সন্ধ্যা, নবশক্তি—জাতীয়দলের মুখপত্রগুলি সবই একে একে উঠে গেল। এ যেন "বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল" অবস্থা।

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে পরে মনে হবে—এত উদ্যোগ, এত আয়োজন, এত আশা, এত ত্যাগস্বীকার—স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এত কিছু যে করা হলো—তা সবই ব্যর্থ হলো। কিন্তু এ হলো আমাদের সাধারণ বিচার-বুদ্ধির কথা। ইতিহাসের স্রোতো-ধারার মধ্যে বিভিন্ন স্তর থাকে। আমরা সব সময় উপরের স্তর ভেদ করে নীচের স্তরে দৃষ্টি দিতে পারি না বলেই ইতিহাসের প্রত্যক্ষ গতি-পথে সাধারণতঃ যা ঘটে তাই দেখি আর তাই দিয়ে সফলতা-বিফলতার বিচার করি। কিন্তু প্রবাহের গভীর তলদেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে কি ঘটল, তা বড়-একটা আমাদের বিবেচনার পরিধির মধ্যে আনি না, আর আনি না বলেই ইতিহাসের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় আমরা প্রায়ই ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারি না। আলিপুর বোমার মামলায় যবনিকা-পাত নিশ্চয়ই ইতিহাসের সবটুকু নয়। এ ঘটনা তো রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনের ঘটনা। কিন্তু সেই একই সময়ে নেপথ্যে একটি মানুষের জীবনে কি বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হলো—তার সম্পূর্ণ সংবাদ সেদিন খুব অল্পলোকেই জানতেন বা রাখতেন। শ্রীঅরবিন্দ মিথ্যা বলেন নি যে, আলিপুর আশ্রম থেকে তিনি এক নতুন মানুষ হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন।

"আলিপুর থেকে বেরিয়ে শ্রীঅরবিন্দ এক নতুন মানুষ হয়ে নতুন রকমের ভারতের মাটিতে এসে পা দিলেন। কারাবাস তাঁকে কেবল ভগবৎ দর্শনই করায় নি, অগ্নিবাণী আন্দোলনকারীর বদলে তাঁকে পরিপক্ক ও প্রশান্ত রাজনীতিজ্ঞ-দার্শনিকে পরিণত করেছে। যতদিন জেলে কাটিয়েছেন ততদিন যাবৎ গীতা ও তার সূত্রগুলি তাঁর চেতনার প্রতি অংশে প্রতি কোণে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে থাকত। যখন তিনি জেল থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তিনি ভগবৎদ্রষ্টা। ভগবানকে সামনাসামনি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পরমাণুতে পর্যন্ত তাঁকে উপলব্ধি করছেন।"* এই উপলব্ধি—এই অপূর্ব অনুভূতির কথা তিনি কারো কাছে গোপন রাখেন নি। নিজের স্ত্রীর কাছে নয়, অন্তরঙ্গ সতীর্থদের কাছেও নয়। কারামুক্তির তিন সপ্তাহ পরে, অরবিন্দ প্রথম প্রকাশ্য ভাষণ দিলেন উত্তরপাড়ায়। তাঁর এই বক্তৃতাটির তারিখ ৩০ মে, ১৯০৯। এ বক্তৃতা কোন রাজনৈতিক সভায় প্রদত্ত হয় নি। স্থানীয় ধর্মরক্ষিণী সভায় তিনি এই স্মরণীয় বক্তৃতাটি করেছিলেন। এইটি থেকেই

---

* মহাযোগী : দিবাকর।

আমরা লক্ষ্য করি এই রাজবিদ্রোহীর মহিমান্বিত জীবনের দিক্-পরিবর্তন। সেই বক্তৃতার কিছু অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। এটি কোন সাধারণ রাজনৈতিক বক্তৃতা ছিল না, কাজেই পাঠককে এর বক্তব্য গ্রহণ করতে হবে শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিশ্বাসের সঙ্গে। সদ্য কারামুক্ত অরবিন্দ বলেছিলেন :

"এই নির্জনবাসেই এল আমার সর্বপ্রথম অনুভূতি, প্রথম শিক্ষা।...আমি অনুভব করলাম, হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম কি? আমরা অনেক সময়েই হিন্দুধর্মের কথা, সনাতন ধর্মের কথা বলি, কিন্তু সে ধর্ম যে কি বস্তু তা আমাদের মধ্যে ক'জন জানে?...আমি দেখলাম আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। তিনি আমার গভীরতর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন।...আমি ভিতরের বাণী শুনেছিলাম—'তোমাকে যে কাজের জন্য আমি জেলে এনেছি সেই দিকে তুমি মনোযোগ দাও, আর যখন তুমি জেল থেকে বেরিয়ে আসবে, কখনো আর যেন ভয় করো না, কখনো দ্বিধা করো না। মনে রেখো আমিই এইসব করছি, তুমিও নও আর অন্য কেউই নয়।... জাতির মধ্যে, জাতির উত্থানের মধ্যে আমি রয়েছি, আমি বাসুদেব, আমি নারায়ণ, আমি যা ইচ্ছা করি তাই হবে, অপরে যা ইচ্ছা করে তা নয়।'...পূর্বে আমার অনেক সন্দেহ, অনেক সংশয় ছিল। এখন দিনের পর দিন আমি মনের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে হিন্দু-ধর্মের সত্যগুলি উপলব্ধি করতে লাগলাম।

"ইতিপূর্বে বলেছিলাম যে, এই আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, আর জাতীয়তা রাজনীতি নয়, পরন্তু একটা ধর্ম, একটা বিশ্বাস, একটা নিষ্ঠা। আজ আবার আমি সেই কথাই বলছি, কেবল অন্যভাবে। আর আমি বলি না যে, জাতীয়তা একটা বিশ্বাস, একটা ধর্ম, একটা নিষ্ঠা; আমি বলছি, আমাদের পক্ষে সনাতন ধর্মই হচ্ছে জাতীয়তা। এই হিন্দুজাতি জন্মেছিল সনাতন ধর্ম নিয়ে, এর সঙ্গেই সে চলে, এর সঙ্গেই সে বিকাশ লাভ করে। যখন সনাতন ধর্মের অবনতি হয় তখনি জাতির অবনতি হয়, আর যদি সনাতন ধর্মের ধ্বংস হওয়া সম্ভব হতো তাহলে সনাতন ধর্মের সঙ্গে এই জাতিটাও ধ্বংস হতো। সনতন ধর্ম, এইটিই হচ্ছে জাতীয়তা। আপনাদের নিকট এই আমার বাণী।"*

কারামুক্তির পর বাংলাদেশে কলকাতায় অরবিন্দের কর্মজীবনের পরিধি মাত্র দশটি মাস। রাজনীতি থেকে তিনি এখন আকৃষ্ট হলেন সনাতন হিন্দুধর্মের দিকে। "এই পরিবর্তন অরবিন্দের জীবনে এক অতি গুরুতর পরিবর্তন। ভবিষ্যৎ পণ্ডিচেরী জীবনের বীজ তাঁহার উত্তরপাড়া বক্তৃতার মধ্যে অঙ্কুরোদ্গম করিয়াছে।" টিলক কারাগারে. বিপিনচন্দ্র অনুপস্থিত, শ্যামসুন্দর নির্বাসনে, এমন অবস্থায় অরবিন্দকে

* উত্তরপাড়া অভিভাষণ : শ্রীঅরবিন্দ।

একাকী কর্মক্ষেত্রে নামতে হলো মডারেটদের সঙ্গে বিরোধিতা করবার জন্য ও চরমপন্থী দলের নেতৃত্ব করবার জন্য। ১৩ই জুন তিনি বিডন স্কোয়ারে বক্তৃতা করলেন। সেই বক্তৃতার প্রথমেই তিনি সরকারের দমননীতির কথা বললেন ; দেশের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করলেন। নয়জন নেতার নির্বাসনের কথা উল্লেখ করলেন। তারপর বললেন, "অতীতে আমরা দেশের প্রতি কর্তব্য করি নাই, এখন তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই অত্যাচার বুক পাতিয়া লইতে হইবে। অন্য জাতিরা স্বাধীনতা লাভের জন্য যে মূল্য দিয়াছে, ইহা তাহার তুলনায় কিছুই নহে।" তারপর মর্লির প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার প্রসঙ্গে বললেন যে—এ সংস্কার "অত্যন্ত ভুয়া, মেকী এবং ফাঁকি।" মোট কথা, অরবিন্দের "এই বক্তৃতাটি উত্তরপাড়া-ভাষণের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে পৃথক। অরবিন্দের নেতৃত্বের ক্ষমতার পরিচয় আছে এর মধ্যে।

তাঁর কারামুক্তির পর জাতীয়তাবাদী দলের কেউ কেউ প্রস্তাব করেন যে, আবার 'বন্দেমাতরম্' প্রকাশ করা হোক। অরবিন্দ রাজী হলেন না। উনিশে জুন তাঁর সম্পাদনায় 'কর্মযোগিন্' নামে একটি নতুন ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করল। পত্রিকার প্রচ্ছদপটে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে অশ্বরজ্জু-হস্তে রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ। "বন্দেমাতরম্ হইতে কর্মযোগিনের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি যতটা পৃথক, ঠিক ততটাই পরিবর্তন তাঁহার জীবনে তখন আসিয়া গিয়াছে।"

'কর্মযোগিন্' অরবিন্দের সাংবাদিক প্রতিভার এক নবদিগন্ত। এবার নতুন আদর্শ, নতুন চিন্তা। মহত্তম জীবনের পথে আরো এক ধাপ অগ্রসর হওয়ার আদর্শ। জাতীয় জীবনের সর্বোত্তম আদর্শের সন্ধান তিনি দিলেন এইবার। বন্দেমাতরমের অরবিন্দ কর্মযোগিনের অরবিন্দ থেকে স্বতন্ত্র। বন্দেমাতরমের চেয়েও একটা গভীরতর সুর এই নতুন কাগজের লেখায় ধ্বনিত হতে লাগলো। লেখার ভঙ্গিও এখন যেন কিছু বদলে গেল। দেশবাসী উৎকর্ণ হয়েছিল কারামুক্তির পর তাঁর মুখে নির্দেশের নববাণী শুনবার জন্য। বহু শতাব্দীর ইতিহাস অতিক্রম করে কুরুক্ষেত্রের রণভূমি থেকে নেমে এলো সেই মহামানবের বাণী : হে অর্জুন! তুমি যোগী হও—যোগই কর্মের কৌশল। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের এই বাণীই নতুন করে নবীন করে শোনালেন অরবিন্দ কর্মযোগিন্ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর অনবদ্য রচনার মাধ্যমে। ভারতবর্ষকে—তার চিরন্তন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে—নতুন করে তিনি তুলে ধরলেন দেশবাসীর সামনে। কর্মযোগিনের লেখা অনেকের অন্তরকে স্পর্শ করলো, আবার অনেকে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করলেন।

জেল থেকে বেরিয়ে প্রকাশ্যে অনেক স্থানে—বিডন স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার, হাওড়া, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে অরবিন্দ কয়েকটি বক্তৃতা করেছিলেন। সেইসব

বক্তৃতা এবং কর্মযোগিনের রচনা থেকে এই কথাটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, তখনো এই দেশপ্রেমিকের সমস্ত চিন্তা আচ্ছন্ন করে রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা। তখনো তিনি তাই তাঁর দেশবাসীকে বার বার বলতে লাগলেন : "স্বাধীনতার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়। অনেক ত্যাগ দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের ভিতর দিয়ে অর্জন করতে হয় স্বাধীনতা। অতীত গৌরব এবং গৌরবময় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে স্বাধীনতার লক্ষ্যে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।" তাঁর মুখে এই সব কথা শুনে স্বভাবতই জাতির স্তিমিত প্রাণে আবার উদ্দীপনার সঞ্চার হতে থাকে। তিনি যে তখনো রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান নি তা পরিষ্কার বুঝা যায় তাঁর বিডন স্কোয়ার বা ঝালকাঠির বক্তৃতা দুটি থেকে। স্বাধীনতা—রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করাই যে তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র, তা আদালতে দাঁড়িয়ে যেমন অকুণ্ঠভাবে ঘোষণা করেছিলেন, দেখা গেল, কারামুক্তির পর, কি 'কর্মযোগিন্' পত্রিকাব লেখায়, কি প্রকাশ্য বক্তৃতায়, ঠিক তেমনিভাবেই তা তিনি প্রচার করতে থাকলেন।

'কর্মযোগিন্' প্রকাশিত হওয়ার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহার সম্পাদনায় 'ধর্ম' নামে আর একখানি নতুন বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরুল।

এখানেও সেই গীতার আদর্শ। এই পত্রিকাব পৃষ্ঠায় তিনি পরিবেশন করলেন ভারতাত্মার চিরন্তন কাহিনী। সুর হয়ে উঠলো আবো গভীরতর। ধর্মকে আশ্রয় করে আত্ম উৎসর্গের শক্তি অর্জন করার কথাই অরবিন্দ বলতে লাগলেন 'ধর্ম' পত্রিকায়। ধীরে ধীরে তিনি রাজনীতির কল-কোলাহল থেকে ভারতের আত্মদ্রষ্টা ও সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের আশ্রম অভিমুখে চলেছেন। সমসাময়িক ঘটনার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে চিন্তাপূর্ণ কত বিচিত্র প্রবন্ধ বেরুতে লাগল 'ধর্ম' পত্রিকায়। 'জগন্নাথের রথ' একটি আশ্চর্য প্রবন্ধ। জগন্নাথের রথ আমরা অনেকেই দেখেছি, কিন্তু কখনো কি আমাদের মনে হয়েছে এই যে বিরাট রথ—এর পিছনে কি সত্য নিহিত রয়েছে? সেই সত্যটি উদ্‌ঘাটন করে অরবিন্দ লিখলেন :

"আদর্শ সমাজ মনুষ্য-সমষ্টির অন্তরাত্মা ভগবানের বাহন, জগন্নাথের যাত্রার রথ। ঐক্য, স্বাধীনতা, জ্ঞান, শক্তি—সেই রথের চারি চক্র। জগন্নাথের রথের প্রকৃত আকৃতি বা নমুনা কেহ জানে না, কোন জীবন-শিল্পী আঁকিতে সমর্থ নয়। জগন্নাথের এই রথের আসল নাম সমাজ নয়, সংঘ। বহুমুখী শিথিল জনসংঘ বা জনতা নয়, আত্ম-জ্ঞানের, ভাগবত-জ্ঞানে ঐক্যমুখী শক্তির বলে গঠিত বন্ধন-রহিত অচ্ছেদ্য সংহতি, ভাগবত-সংঘ। যেদিন জ্ঞান, কর্ম ও ভাবের সামঞ্জস্যে ও একীকরণে আত্মগত ঐক্য দেখা দিবে সমষ্টিগত বিরাট পুরুষের ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায়, সেদিন জগন্নাথের রথ জগতের রাস্তায় বাহির হইয়া দশদিক আলোকিত করিবে। সত্যযুগ

নামিবে পৃথিবীর বক্ষে, মর্ত্য-মানুষের পৃথিবী হইবে দেবতার খেলার শিবির, ভগবানের মন্দির-নগরী—আনন্দপুরী।"

বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের আখ্যায়িকা নিয়ে লেখা 'ক্ষমার আদর্শ' আর একটি সুন্দর রচনা। এই প্রবন্ধের শেষে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন: "ভারতে এমন ঋষি ছিলেন, এমন সাধু ছিলেন, এমন ক্ষমার আদর্শ ছিল, এমন তপস্যার বল ছিল, যাহার দ্বারা পৃথিবী ধারণ করা যায়। ভারতে আবার সেইরূপ ঋষি জন্মগ্রহণ করিতেছেন, যাঁহাদের বিদ্যুৎপ্রভায় পূর্বতন ঋষিদিগের জ্যোতি হীনপ্রভ হইয়া যাইবে, যাঁহারা আবার ভারতকে পূর্ব-গৌরব হইতে অধিকতর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।" কে বলতে পারে, এই কথার মধ্যেই তিনি তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের স্বরূপ পরিচয় রেখে গিয়েছেন কি না?

'ধর্ম' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র পাই। তিনি লিখলেন: "আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা—মতির একতা নেই, গতির স্থিরতা নেই।...অগ্রগামী, পশ্চাদগামী, বিপ্লববাদী, শান্তিপ্রিয়, তেজস্বী নিস্তেজ হয়।...তরঙ্গের গায়ে তরঙ্গ উঠে, যাঁহারা সর্বোচ্চ তরঙ্গের চূড়ায় আরূঢ় তাঁহারা তরঙ্গের সঙ্গে ভাসিতেছেন, তরঙ্গ চালাইতেছেন না। সেই উদ্বেলিত শক্তিই বিপ্লবের একমাত্র নেতা ও কর্তা। কয়েকজন ভাসমান নেতাকে আকর্ষণ সমুদ্রের অতলগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছেন এবং উদ্ধত বায়ুকুলকে আইন-কানুন নিগড়াবদ্ধ গুহা-গহ্বরে নিগৃহীত করিয়াছেন। কিন্তু যে পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত গোল থামিবার নয়। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। আমাদের দেশে এইরূপ নিয়ম পাঁচ বৎসর হইতে চলিতেছে। এই সময় অগ্রসর হইবার দিন নহে, আত্ম-রক্ষার দিন। যেন উদ্দাম আচরণে বিপক্ষকে সুযোগ দান না করি, কিংবা ভীরুতা প্রকাশে নিগ্রহনীতিকে সফল না করি।"

দেশের সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে অরবিন্দ যে অভিমত এখানে ব্যক্ত করেছেন, এ শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব। এর থেকে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে, "নেতারা আন্দোলন সৃষ্টি করেন না, তাঁহারা আন্দোলনের তরঙ্গের উপর কখনো ভাসেন এবং কখনো ডুবিয়া যান। জাতীয় জীবনের আন্দোলন মহাশক্তির খেলা। আন্দোলনের প্রতি এই গভীর 'মিষ্টিক' দৃষ্টি অরবিন্দের যেরূপ আছে, অন্য কোন নেতার তাহা নাই।" কথাটি সত্য।

১৯০৯। বিক্ষুব্ধ ভারতবাসী তথা বাঙালিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট একদফা শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলেন এই বছরে। ইহাই মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার। লর্ড মিণ্টো তখন ভারতের রাজপ্রতিনিধি আর লর্ড মর্লি ভারতসচিব।

বড়লাটের ও প্রাদেশিক লাটের এগজিকিউটিভ কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্যের মনোনয়ন ও বিলাতে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্যের নিয়োগ—প্রস্তাবিত নতুন সংস্কারের মূল কথা ছিল এই। কিন্তু এর কার্যকারিতা সম্পর্কে সকল নেতাই সন্দেহ প্রকাশ করলেন। জাতীয় দলের নেতা হিসাবে অরবিন্দ তাঁর 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় দেশবাসীকে এই রিফর্ম সম্পর্কে সাবধান করে লিখলেন: "এক হাতে কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া আর অন্য হাতে নিরঙ্কুশ দমননীতি চালানো—এটা একটা সাংঘাতিক দ্বি-ধারী নীতি। এ শাসন সংস্কার একটা পরিহাস মাত্র—শুধু পরিহাস নয়, একটা ফাঁদও বটে। আর জনসাধারণের কাছ থেকে যে সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হয়েছে—তা সহযোগিতা নয়, তা এর প্যারডি মাত্র।" এবং সেই সময়ে দেশের সামনে ছয় দফা কার্যসূচী-সম্বলিত যে নির্দেশ অরবিন্দ দিয়েছিলেন, তার মূল কথাটা ছিল—স্বাবলম্বন, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আর অসহযোগ। 'নো কণ্ট্রোল, নো কো-অপারেশন' অর্থাৎ যদি দেশবাসীর হাতে শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা না দেওয়া হয়, তাহলে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই ইঙ্গিতটির মধ্যে অরবিন্দের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় যেমন পাই, অন্য দিকে দেখি এর দ্বারা একটা নতুন প্রেরণাও তিনি এনে দিলেন দেশের রাজনীতিতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মডারেটরাও এই ভুয়া শাসন সংস্কার দ্বারা কিছুমাত্র প্রলুব্ধ হলেন না। সুরেন্দ্রনাথের মতো মডারেটও এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য কিছু দেখতে পান নি। শেষ পর্যন্ত মর্লি-মিণ্টো সংস্কার প্রত্যাখ্যাত হয়। তাঁর 'ধর্ম' পত্রিকায় অরবিন্দ এই শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে এই চমৎকার মন্তব্যটি করেছিলেন: "শাসন-সংস্কারের ছায়ায় যে ভেদনীতি বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, লর্ড মর্লি তাহা রোপণ করিয়াছেন; দেশহিতৈষী গোখ্‌লে মহাশয় জল সিঞ্চন করিয়া তাহা সযত্নে পালন করিতেছেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়কে ছলনা করা—ভেদনীতির ইহাই দ্বিতীয় অঙ্গ এবং শাসন-সংস্কারের বিষময় ফল। এই সংস্কারে বাঙালির লেশমাত্র আস্থা নাই।"

কারামুক্তির পর দেখতে-দেখতে পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হলো। ঝড়-তুফানের মধ্যেই তিনি একা জাতীয়দলের তরণীর হাল ধরে আছেন। আবার এরই মধ্যে কানাঘুঁষা শোনা যাচ্ছিল যে, অরবিন্দকে আবার নির্বাসিত করা হবে। ৩১শে জুলাই 'কর্মযোগিন্' পত্রিকার স্তম্ভে প্রকাশিত হয়—'দেশবাসীর প্রতি তাঁর চরমপত্র' যাতে তিনি খোলাখুলি সব লিখে আসন্ন নির্বাসনের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলেন। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তাঁর দিন শেষ হতে মাত্র আর পাঁচ মাস দেরী আছে।

বাংলা দু'টুকরো হবার পর একে একে পাঁচটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়ে বহু ঝড়-তুফান বয়ে গিয়েছে। বিপ্লবের অগ্নিশিখা ভাঙা-বাংলার ফাটলে ফাটলে সাপের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। আঘাতে-সংঘাতে জেগে উঠেছে ভারতের চিরতিক্ত প্রাণ। মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারকে ইংরেজের একটা রাজনৈতিক চাল বলে নির্দেশ করে তাঁর 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় অরবিন্দ যে খোলা চিঠিখানি লিখেছিলেন, বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে তাকে অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের উইল বলা যেতে পারে। তাঁর এই 'খোলা চিঠি' শাসকবর্গকেও অরবিন্দ সম্পর্কে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছিল। কাগজে লিখে, বক্তৃতা করে, অরবিন্দ দেশবাসীকে তাদের সংকল্পে দৃঢ় থাকতে বললেন এবং যতদিন না ভাঙা-বাংলা জোড়া লাগছে ততদিন কোন সংস্কারের প্রস্তাবে তাঁরা যেন কর্ণপাত না করেন, ইংরেজের ধাপ্পায় যেন না ভোলেন।

এই সময় একদিন কুমারটুলির এক জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অরবিন্দ বললেন : "জনরব উঠেছে আমাকে নির্বাসন দেবার কথা সরকার নাকি চিন্তা করছেন। নির্বাসন বা দেশান্তরের কথায় আমার শুধু হাসিই পায়। স্বরাজ ও স্বদেশী—এই যদি নির্বাসনের কারণ হয়, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের এই আন্দোলন ব্যর্থ হয় নি। আমার অনেক হৈতৈষী বন্ধু আমাকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, যদি আমি এইসব স্বদেশী কাজ ছেড়ে না দিই ত নির্বাসন অবধারিত। কিন্তু নির্জন কারাবাসের অভিজ্ঞতার পর আমার মনের মধ্যে কোন ভয়ই আজ নেই। সামনে স্বরাজ আর হৃদয়ে বন্দেমাতরম্—এ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ জেল কিংবা দেশান্তর কোনটাই আমার কাছে ভয়ের বিষয় নয়।"

১৯০৯ বিদায় নিলো। এলো স্মরণীয় ১৯১০। উনিশ শো দশের বাংলা উনিশ শো পাঁচের বাংলাকে পিছনে ফেলে আজ অনেক দূর এগিয়ে এসেছে তার জয়যাত্রার পথে। সে দুর্গম পথের দিশারী ছিলেন একা অরবিন্দ নন, তাঁর সঙ্গে আরো অনেকেই। এই পাঁচ বছরের আন্দোলনের ফলে দেশের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে, দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনা কতখানি দৃপ্ত ও প্রবুদ্ধ হয়ে উঠেছে তাই-ই বিশ্লেষণ করে 'কর্মযোগিনে' একটি প্রবন্ধ লিখলেন অরবিন্দ। সেই প্রবন্ধটির মধ্যে সরকার রাজদ্রোহিতার আভাস পেলেন যেন। অমনি নেপথ্যে চলে সরকারী চক্রান্ত তাঁকে আবার কুক্ষিগত করবার জন্য। আর সকলের অলক্ষ্যে তাঁর জীবন-দেবতার আয়োজন চলে তাঁকে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের এক নবতীর্থে নিয়ে যাবার জন্য। এইবার ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকে যবনিকা অরবিন্দের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের উপর। তাঁর কলকাতা ত্যাগ করে প্রথমে চন্দননগর এবং পরে পণ্ডিচেরী (এই দুটিই ছিল তখন ভারতে ফরাসী-শাসিত রাজ্য) চলে যাওয়া সম্পর্কে

নানাজনের নানা বিবরণ দেখা যায়। এই বিষয়ে অরবিন্দ স্বয়ং যা বলেছেন, এখানে আমরা তাই-ই উদ্ধৃত করে দিলাম :

"ভগিনী নিবেদিতার পরামর্শক্রমেই আমি চন্দননগর যাই নি। আমার যাওয়া সম্পর্কে তিনি বা অন্য কেউ কিছুই অবগত ছিলেন না। গঙ্গার ঘাটেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না। ইতিপূর্বে একবার তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, সরকার আমাকে নির্বাসনে পাঠাবার মতলব করছেন এবং ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে সেখান থেকে কাজ করার জন্য তিনি আমাকে পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, এর দরকার হবে না ; বরং আমি কাগজে আমার বক্তব্য এমনভাবে লিখে প্রকাশ কবব যার ফলে সরকার তাঁদের মতলব ত্যাগ করবেন। এই অবস্থাতেই আমি 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় 'আমার শেষ উইল ও চরমপত্র' নামে একটি স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ প্রকাশ করি। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পরে নিবেদিতা আমাকে বলেছিলেন যে, এতে কাজ হয়েছে এবং সরকার নাকি আমাকে নির্বাসনে পাঠাবার মতলব পরিত্যাগ করেছেন। কাজেই দেশত্যাগ করার পরামর্শ পুনরায় দেবার মত আর কোন অবস্থার উদ্ভব হয় নি। তাছাড়া আমি যে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করব তেমন সম্ভাবনাও ছিল না। কি অবস্থায় আমি চন্দননগর গেলাম, তার কোন পূর্বাভাষই তিনি জানতেন না।

"আমার দেশত্যাগ সম্পর্কে প্রকৃত বিবরণ এই। আমি তখন 'কর্মযোগিন্' অফিসে বসে কাজ করছিলাম, যখন জনৈক উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার প্রদত্ত সংবাদ-সূত্রে আমি জানতে পারলাম যে, পরের দিন অফিসে খানাতল্লাসী হবে এবং আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে। (অফিসে সত্যিই খানা-তল্লাসী হয়েছিল, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কোন গ্রেপ্তারী পরওয়ানা প্রদর্শিত হয় নি। কাগজের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হওয়ার আগে পর্যন্ত এ বিষয়ে আমি আর কিছুই শুনি নি—কিন্তু তখন আমি চন্দননগর ত্যাগ করে পণ্ডিচেরীর পথে যাত্রা করেছি।) আসন্ন ঘটনা সম্পর্কে আমার আশেপাশের লোকদের কাছ থেকে উৎসাহপূর্ণ মন্তব্যগুলি যখন শুনছিলাম তখন সহসা উপর থেকে, সেই পরিচিত কণ্ঠস্বরে, একটি আদেশ পেলাম, তিনটি বাক্য-সমন্বিত আদেশ—'চন্দননগর চলে যাও।' ঠিক এর দশ মিনিটের মধ্যেই নৌকাযোগে আমি চন্দননগর যাত্রা করি। রামচন্দ্র মজুমদার* ঘাট পর্যন্ত আমার সঙ্গী ছিলেন। নৌকা তিনিই ডেকে দেন। চন্দননগর যাওয়ার সঙ্গী ছিল আমার আত্মীয় বীরেন ঘোষ ও মণি (সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী)। সোজা গঙ্গার ঘাটেই গিয়েছিলাম ; বাগবাজার বা অন্য

* 'কর্মযোগিন্' পত্রিকার মুদ্রাকর। অরবিন্দ চলে যাওয়ার পর পুলিশ এঁর বিরুদ্ধেই মামলা এনেছিল।

কোথাও যাই নি। প্রত্যুষের অন্ধকারেই আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম। সঙ্গী দুজন সকালেই কলকাতায় ফিরে যায়। পরে, সেই একই উপরের আদেশে আমি চন্দননগর ত্যাগ করি ও ৪ঠা এপ্রিল, ১৯১০, পণ্ডিচেরী পৌঁছই।"*

এই ভাবেই ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষাশেষি একদিন শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নালোকিত গভীর রাত্রে, গোয়েন্দা পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে নৌকাযোগে গঙ্গা পার হয়ে অরবিন্দ কলকাতা থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। এর ঠিক একত্রিশ বছর পরে অনুরূপ ঘটনার পুনরুক্তি দেখতে পাই সুভাচন্দ্রের জীবনে— তিনিও ঠিক ঐ ভাবে তাঁর এলগিন রোডের বাসভবন থেকে অন্তর্হিত হন। চন্দননগরে মতিলাল রায়ের গৃহে কম-বেশি একমাস কাল অজ্ঞাতবাসের পর তিনি অবশেষে পণ্ডিচেরী চলে যান।

ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার কিছু পূর্বে দেশবাসীদের উদ্দেশে অরবিন্দ তাঁর খোলা চিঠিতে (যেটিকে বলা হয় তাঁর রাজনৈতিক উইল ও চরমপত্র এবং যেটির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার সর্বোত্তম বিকাশ) বললেন: "মহৎ আন্দোলন মাত্রই ঈশ্বর-প্রেরিত নেতার অপেক্ষায় থাকে, যিনি ভগবৎ নির্দেশেই চলবেন, আর এমন নেতা এসে পড়লেই সে আন্দোলন সার্থকতার দিকে অগ্রসর হয়।...তাই বলি ভবিষ্যতের আশা স্বরূপ এই স্বাধীনতাকামীদের আপাতত এমনি একজন নেতার আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।" এব থেকেই তাঁর সতীর্থদের অনেকেই অনুমান করেছিলেন যে, ভারতের রাজনীতিতে অরবিন্দের নেতৃত্বে এবার পূর্ণচ্ছেদ পড়বে। তাঁদের এই অনুমান মিথ্যা হয় নি। একটা কথা। তাঁর এই খোলা চিঠিতে অরবিন্দ যে নতুন নেতার আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করেছেন, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীই কি সেই প্রত্যাশিত নেতা ছিলেন?

---

* জন হিমসেলক: শ্রীঅরবিন্দ।

॥ একত্রিশ ॥

এই কাহিনীর যবনিকা এবার উঠবে অন্যত্র। বঙ্কিম-পুজিত বাংলায় নয়, ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত একটি ফরাসি উপনিবেশে। ভারতমহাসমুদ্রের তীরে অবস্থিত এই উপনিবেশটির নাম পণ্ডিচেরী। এইখানেই ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল অপরাহ্নবেলায় 'ডুপ্লে' জাহাজে চড়ে ছদ্মনামে উপনীত হলেন অরবিন্দ। এখন থেকেই শুরু হয় তাঁর জীবন-নাট্যের চতুর্থ বা শেষ অঙ্ক।

অরবিন্দের জীবনের এই পর্বটিকে আমরা দুটি অধ্যায়ে ভাগ করতে পারি, যথা—১৯১০ থেকে ১৯২৬ আর ১৯২৬ থেকে ১৯৫০—তাঁর মহাপ্রয়াণের দিন পর্যন্ত। পণ্ডীচেরীতে এসে প্রথমে তিনি কিছু দিন দশ নম্বর রু্য স্যাঁ লুই রাস্তার উপর একটি ছোট বাড়িতে অবস্থান করেন। ক্রমে তাঁর অন্তরঙ্গ সহচরদের কয়েকজন এখানে চলে আসেন। তারপর তিনি স্থান পরিবর্তন করলেন—উঠে এলেন একুশ নম্বর র্যু ফ্রাঁসোয়া মারত্যাঁর উপর অপেক্ষাকৃত একটি বড় বাড়িতে। "প্রথম দশটা মাস নানাস্থানে কাটিয়ে তিনি এক স্থায়ী আশ্রয় পেয়ে গেলেন। যে বাড়িতে রইলেন তা নিভৃতবাস ও সাধনার পক্ষে বেশ উপযুক্ত। এইখানেই তিনি তাঁর অপূর্ব সাধনার দ্বারা শেষ পর্যন্ত চরম সিদ্ধিলাভ করেন। তাই এইস্থানই অতঃপর তাঁর নতুন ধরনের পূর্ণযোগ প্রচার করবার কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে উঠেছিল, আর যাঁরা তাঁর কাছে নতুন আলোর সন্ধান পেতে চেয়েছে তাদের আশ্রয়স্থলও হয়েছিল।" আবার সম্পূর্ণ নতুন আদর্শে নব-যুগের উপযোগী করে মানুষ গড়ে তোলার একটি আশ্চর্য পরীক্ষাগারও এটি বটে। তাঁর জীবনের চল্লিশ বছরের সাধনাপূত ও সিদ্ধির গরিমায় উদ্ভাসিত এই তপঃক্ষেত্রটি আজ তাই সারা পৃথিবীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আধ্যাত্মিক ভারতের নবজন্ম আমরা এইখানেই প্রত্যক্ষ করলাম—দেখলাম প্রাচীন ভারতের এক প্রদীপ্ত নবীন রূপ। এর স্রষ্টা যুগমানব শ্রীঅরবিন্দ।

পণ্ডিচেরীতে গোড়ার দিকে তাঁর দিনগুলি আদৌ নিরুদ্বেগে বা সহজে অতিবাহিত হয় নি। হওয়ার কথাও নয়। পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি তাঁকে তো অনুসরণ করতই, তার উপর ছিল আর্থিক অনটন। এই সময় তাঁর সঙ্গে আরো তিনজন সঙ্গী হিসাবে বাস করতেন। আর্থিক অনটন হেতু অনেকদিন তাঁদের

চরম কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। এ ছাড়া, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের চেষ্টা ও পরিকল্পনার ত্রুটি ছিল না শ্রীঅরবিন্দকে পণ্ডিচেরী থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে নির্বাসনে পাঠাবার জন্য। এর থেকেই বুঝা যায়, এই মানুষটি তাঁদের কি রকম শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিলেন। অরবিন্দকে "ভারতবর্ষের সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি" বলে নেভিনসন এমনি বর্ণনা করেন নি। এর যথেষ্ট কারণ ছিল। ভারতবাসীর মনে বিপ্লবের যে আগুন তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন—স্বাধীনতার চিরন্তন অধিকার দাবী করা—সে আগুন তো আর নেভেনি। জাতীয়তার যে অমোঘ মন্ত্র তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন তা তাঁর অনুপস্থিতিতেও সমানভাবে কার্যকর ছিল। সরকারের আসল দুশ্চিন্তা তো এইজন্যই। ১৯১২ সালে তাঁকে ধরিয়ে দেবার একবার একটা চেষ্টা হয়েছিল। সে চেষ্টা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। নলিনীকান্ত গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বিজয়কুমার নাগ ও সৌরীন্দ্রমোহন বসু—তাঁর এই চারজন বিশ্বস্ত সঙ্গী এই সময় সর্বদা শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরে থাকতেন।

এইভাবে তাঁকে ধরবার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হলেও, সন্দিগ্ধ ইংরেজ সরকারের সতর্ক দৃষ্টি অরবিন্দের উপর সমানভাবেই অব্যাহত থাকে, কারণ তাঁদের চক্ষে এই পলাতক মানুষটি তখনো পর্যন্ত একজন বিপজ্জনক বিপ্লবী বলেই গণ্য হতেন। এই অবস্থা দীর্ঘকাল চলেছিল। ১৯৩৭ সালে যখন নতুন শাসন-সংস্কারে কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে, তখন থেকে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের চারিদিক পুলিশ-প্রহরা মুক্ত হয় এবং আশ্রম অধিবাসী ও দর্শনার্থীদের গতিবিধি পুলিশ আর অনুসরণ করত না। পুলিশ রিপোর্টে তখনো পর্যন্ত আশ্রমের প্রত্যেকটি মানুষকে "বোমা তৈরি করার একটি বিপজ্জনক গোষ্ঠী" বলেই উল্লেখ করা হতো। ১৯১৫ সালে লর্ড কারমাইকেল যখন বাংলার গভর্নর, তখন তাঁর মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের মাধ্যমে অরবিন্দকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল। সরকার থেকে তখন বলা হয়েছিল যে, অরবিন্দ যদি ইচ্ছা করেন, বাংলাদেশে ফিরে আসতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁর-উপর থেকে সমস্ত সরকারী বিধিনিষেধ উঠিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সে প্রস্তাবে সম্মত হন নি। এরপর আরো একবার সোজাসুজিভাবে এই চেষ্টা করা হয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে একজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীকে পণ্ডিচেরীতে পাঠান হয়। উক্ত অফিসারের সেলুনটিকে তখন পণ্ডিচেরী রেল স্টেশনের একটি নিভৃত স্থানে রেখে দেওয়া হয় এবং একটা বিশেষ প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে সেলুনে এসে একবার সাক্ষাৎ করবার অনুরোধ জানিয়ে অরবিন্দের নিকট তিনি একজন দূতকে প্রেরণ করেন। কি জন্য এই অনুরোধ, দূত সে কথা তাঁকে জানায় নি। এই অনুরোধও অরবিন্দ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দূতটি আবার তাঁর কাছে ফিরে এলো

এবং তাঁকে বললে যে সরকার তাঁর কাছে এই প্রস্তাব করছেন যে, যদি অরবিন্দ পণ্ডিচেরী ত্যাগ করেন তা'হলে তাঁকে দার্জিলিঙ-এ রাখার সমস্ত ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হবে। সেখানে তাঁর বাসের জন্য একটা প্রকাণ্ড বাড়ি দেওয়া হবে, সেখানে সবরকম সুখ-সুবিধার আয়োজন-উপকরণ থাকবে—তাঁর লেখাপড়ার কাজ বা আধ্যাত্মিক সাধনার কোন অসুবিধাই সেই শৈলনিবাসে হবে না। অরবিন্দ এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। এই প্রস্তাবের আসল মতলবটা ছিল ব্রিটিশ ভারতের এলাকার মধ্যে ও সরকারের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির পরিধির মধ্যে তাঁকে অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখা।

এই প্রয়াস যখন ব্যর্থ হলো তখন ইংল্যাণ্ডে চেষ্টা চলতে লাগল। ব্রিটিশ সরকাব প্যারিসে ফরাসী সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে এই মর্মে একটি অনুবোধ করলেন যে, ভারতের পণ্ডিচেরী রাজ্য থেকে অরবিন্দ ঘোষকে যেন বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয। ফরাসী সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর তখন বিষয়টি ঔপনিবেশিক দপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নিকট পাঠিয়ে দিলেন তাঁর অভিমতের জন্য। সৌভাগ্যক্রমে সেই অফিসারটি শ্রীঅরবিন্দকে জানতেন এবং তিনি সাহস করে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে এমন একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন যার ফলে ব্রিটিশ সরকারেব এই চালটিও শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে যায়। কিন্তু শ্রীঅববিন্দ সম্পর্কে ভারত তথা ব্রিটিশ সরকারের দুশ্চিন্তা ও তাঁকে কুক্ষিগত করার কাহিনী এইখানেই শেষ নয়। তখন থেকে ব্রিটিশ পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ তাঁর উপর তাদের তত্ত্বাবধান আরো জোরদার করতে থাকে এবং তাঁর সঙ্গীদের গতিবিধির উপর আরো সতর্ক দৃষ্টি রাখতে থাকে। শুধু তাই নয়। তাঁদের সম্পর্কে অনেক আজগুবি গল্পও তৈরি করতে থাকে যাতে বলা হলো যে, এঁরা এখনো বিপজ্জনক কর্মে লিপ্ত আছেন ও ভূগর্ভস্থ কক্ষে বোমা তৈরি করছেন। একবার তাই ভারত সরকার স্থানীয় ফরাসী কর্তৃপক্ষকে বলে অরবিন্দ যেখানে বাস করতেন সেই বাড়িটা খানাতল্লাসী করেন। কিন্তু এই চেষ্টাও ফলপ্রসূ হলো না, কারণ দোষারোপ করা যেতে পারে এমন কোন বস্তুর সন্ধান সেখানে পাওয়া যায় নি।

"ঋষি পলাতক"—তাঁর দেশত্যাগের পর বাংলাদেশ থেকে এই রকম একটা অপবাদ শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে রটেছিল। কিন্তু এই অপবাদ ছিল নিতান্তই ভিত্তিহীন এবং যাঁরা এটা তখন রটিয়েছিলেন, তাঁরা খুব বুদ্ধির পরিচয় দেন নি, বলতে হবে। কেন, তা বলছি। রাজনীতি থেকে নিজেকে তিনি মধ্যপথে সরিয়ে নিলেও, বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির উপর শ্রীঅবরিন্দ সর্বদাই তাঁর সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন—এ কথা সকলেরই জানা আছে। তবে এ কথাও সত্য যে, তিনি এখান থেকে আকস্মিকভাবে চলে যাওয়ার পর, তাঁর একান্ত অনুরাগী দু'একজন ব্যতীত বাংলাদেশে সকলেই শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে

দীর্ঘকাল একটা উপেক্ষার ভাবই দেখিয়ে এসেছেন। তাই তাঁর এক অন্তরঙ্গ অনুগামী আক্ষেপ করে লিখেছেন: "শ্রীঅরবিন্দ বাংলার হইয়াও বাঙালির নহেন, সেই ভাগবত মানবকে বাঙালি—আজকের বাঙালি ভুলিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" এ কথা হাজারবার সত্য।

সৌভাগ্যের বিষয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোক তা করে নি। দক্ষিণ ভারতের লোক শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তাদের সশ্রদ্ধ সমাদর প্রদর্শন করে এসেছে সেই তাঁর পণ্ডিচেরী আসার প্রথম দিন থেকেই। সরকার যখন অরবিন্দকে তাঁদের শত্রু বলেই মনে করছিলেন, সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, সেই সময় লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী তাঁকে তাদের সর্বোত্তম বান্ধব এবং তাদের স্বাধীনতার একজন প্রবুদ্ধ যোদ্ধা ও রক্ষক বলেই গণ্য করতেন। অরবিন্দ তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে চলে এলেন, দেশ নায়কহীন হলো। তখন লোকমান্য টিলকই সর্বপ্রথম স্মরণ করেন তাঁর অন্যতম সহকর্মী অরবিন্দকে এবং তিনিই অনুভব করলেন যে কাণ্ডারীহীন কংগ্রেসের পক্ষে এখন একটি শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন। তাঁর মনের কথা লিখে জানিয়ে তিনি অরবিন্দের কাছে তাঁব এক বিশ্বস্ত লোককে পাঠালেন। সেই পত্রে টিলক বিশেষভাবেই অনুরোধ করেন যে, তাঁর নির্জনাবাস পরিত্যাগ করে জাতীয়তাবাদী দলের নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা যেন অবিলম্বে চলে এসে কংগ্রেসের হাল ধরেন, এর সব ব্যবস্থাই তিনি করেছেন। এ হলো ১৯১৬ থেকে ১৯১৮ সালের কোন এক সময়ের কথা। টিলক তখন মহারাষ্ট্রে হোমরুল আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন। অরবিন্দের জাতীয়তাবাদী দলের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখেই টিলক এই নতুন আন্দোলনে অগ্রণী হয়েছিলেন। তারপর লাজপত রায় এবং পরে মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু পর্যন্ত অনুরূপ প্রস্তাব করেছিলেন অরবিন্দের কাছে। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হন নি। কংগ্রেস ব্যতীত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় অনেকেই হয় পত্রযোগে, নতুবা ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য অরবিন্দকে বার বার অনুরোধ করেছিলেন বলে জানা যায়। হিন্দু মহাসভার অন্যতম নেতা, ডঃ মুঞ্জেও একবার পণ্ডিচেরী এসে তাঁকে অনুরূপ অনুরোধ করেছিলেন।

কি কারণে রাজনীতিতে তাঁর প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়, তার একটি সুন্দর ও সুযুক্তিপূর্ণ বক্তব্য অরবিন্দ রেখেছেন তাঁর একটি পত্রে। এই চিঠির তারিখ জানুয়ারি ৫, ১৯২০। এটি তিনি লিখেছিলেন যোসেফ ব্যাপটিস্টাকে তাঁর এক পত্রের উত্তরে। নতুন একটি রাজনৈতিক পত্রিকা সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে ব্যাপটিস্টা শ্রীঅরবিন্দকে একটি পত্র লিখেছিলেন। তারই উত্তরে তিনি লিখেছিলেন:

"বাংলা সরকার এবং মাদ্রাজ সরকার কেঁউই চান না যে, আমি ব্রিটিশ ভারতে ফিরে যাই। আমার হাতে এখন অনেক কাজ, অনিচ্ছুক সরকারের অতিথি হয়ে নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে সময়ের অপব্যবহার করা আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। যদিও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলাফেরা বা কাজ করতে পারার আশ্বাসও আমাকে দেওয়া হয়, তা'হলেও আমার পক্ষে এখন যাওয়া উচিত হবে না। বর্তমান রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক-বর্জিত একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনের উপযোগী স্বাধীনতা ও চিত্তের প্রশান্তি লাভের জন্যই আমি পণ্ডিচেরী এসেছিলাম। এখানে চলে আসার পর থেকে বর্তমানের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমি কোন অংশই গ্রহণ করি নি—যদিও আমার নিজস্ব আদর্শ অনুসারে দেশের জন্য যা করা উচিত তা আমি সর্বক্ষণই করে আসছি—এবং এটা যতদিন না সম্পন্ন হচ্ছে ততদিন আমার পক্ষে জনসাধারণের কাজে যোগদান করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখন আমি যদি ব্রিটিশ ভারতে অবস্থান করতাম, তা'হলে ইহা সুনিশ্চিত যে আমাকে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ পৃথক ধবণেব কাজকর্মেব মধ্যে ঝাঁপ দিতে হতো। পণ্ডিচেবী আমার অবকাশ যাপনেব স্থল, আমাব তপস্যাব গুহা—সাধারণ সাধু-সন্ন্যাসীর তপস্যা নয়—আমারই উদ্ভাবিত এক নতুন ধরণেব তপস্যা। সেটা আমাকে অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে সাধন করতে হবে এবং এটা পরিত্যাগ করার আগে আমাকে ভিতবেব দিক থেকে সুসজ্জিত হতেই হবে।

"তারপর কাজেব প্রসঙ্গে আসা যাক। আমি রাজনীতিকে বা রাজনৈতিক কাজকর্মকে আদৌ লঘু করে দেখি না কিংবা আমি মনে করি না যে, আমি এখন তাব উর্ধ্বে চলে গেছি। আমি চিবকালই আধ্যাত্মিক জীবনেব উপর জোর দিয়ে এসেছি এবং এখনো দিয়ে থাকি। বরং এখন আগের চেয়ে বেশি জোর দিয়ে থাকি। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে আমাব যে ধারণা তা সাধারণ সাধু-সন্ন্যাসীদের ধারণা থেকে পৃথক। পার্থিব বিষয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া, বা ঐগুলি সম্পর্কে ঘৃণা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করা—আমি এসবের পক্ষপাতী নই। আমার কাছে সেকুলার বা ধর্ম-নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই। মানবিক সমস্ত কাজকর্মই আমার কাছে একটি সুসম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয় এবং সেই হিসাবে বর্তমান সময়ে রাজনীতির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে বৈকি। কিন্তু এখন দেশে যে প্রকার রাজনীতি প্রচলিত রয়েছে, আমার রাজনৈতিক কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তার থেকে পৃথক। ১৯০৩ সালে আমি রাজনীতিতে প্রবেশ করি এবং ১৯১০ সাল পর্যন্ত সমানে একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই আমি রাজনৈতিক কর্ম চালিয়ে এসেছি। সেই উদ্দেশ্য হলো: লোকের মনের মধ্যে স্বাধীনতার সংকল্প জাগিয়ে দেওয়া এবং তখন

পর্যন্ত কংগ্রেসের যেসব ব্যর্থ ও মন্থর কর্মপদ্ধতি প্রচলিত ছিল সেগুলির পরিবর্তে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বোধ করা। আমার সেই উদ্দেশ্য এখন সিদ্ধ হয়েছে এবং অমৃতসর কংগ্রেসই তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে।...নতুন শাসন সংস্কারের* অপ্রতুলতা সত্ত্বেও, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প—যদি দেশের বর্তমান মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকে, আমার বিশ্বাস তা থাকবেই—ভবিষ্যতে জয়লাভ করবেই। যে প্রশ্নটা এখন আমার মনের মধ্যে জাগছে সেটা হলো এই: আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দেশ করবে কি, কিভাবে সে তার স্বাধীনতা ব্যবহার করবে এবং কোন্ পথেই বা সে তার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করবে?"

শ্রীঅরবিন্দের এই পত্রখানির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। এর থেকেই আমরা বেশ বুঝতে পারি যে, "ঋষি পলাতক"—তাঁর সম্পর্কে এই অপবাদ একেবারেই ভিত্তিহীন ছিল। যে ভারতবর্ষকে তিনি আশৈশব মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন, যার স্বাধীনতার জন্য দিবারাত্র চিন্তা করেছেন, কাজ করেছেন, দুঃখকষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আপসহীন সংগ্রামের নেতৃত্ব করেছেন, সেই তাঁর প্রিয় জন্মভূমিকে—যে জন্মভূমি তাঁর কাছে একটা ভৌগোলিক সত্তা মাত্র ছিল না, ছিল তদতিরিক্ত কিছু—সেই ভারতবর্ষকে তিনি যে তাঁর তপস্যার আসনে বসেও একদিনের জন্যও বিস্মৃত হন নি—এইটাই তো অরবিন্দের প্রগাঢ় দেশপ্রেমের পরিচায়ক। কনিষ্ঠ বারীন্দ্রকুমারকেও লেখা একটি পত্রে তিনি অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায়।

তাঁর পণ্ডিচেরী-জীবনের প্রথম পর্বের আনুপূর্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন শ্রীঅরবিন্দেরই দু'জন বিশ্বস্ত সঙ্গী—নলিনীকান্ত গুপ্ত ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। কৌতূহলী পাঠক তাঁদের লেখা বই দু'খানি পড়তে পারেন। আসল কথা হলো, রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করে, কেন তিনি নিভৃত তপস্যার আসনে এসে বসলেন? তিনি তো নিজেই একাধিক পত্রে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন: "আমার সেখানে আর কিছু করবার ছিল না বলেই আমি রাজনীতি বর্জন করেছিলাম, এ কথা আদৌ সত্য নয়; আমার মনের মধ্যে এমন চিন্তা কখনো জাগে নি। আমি চলে এসেছিলাম, কারণ ঊর্ধ্বলোক থেকে আমি এই বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট আদেশ পেয়েছিলাম। সেইজন্যই এখন আমি রাজনীতির সঙ্গে সকল সংস্রব ছিন্ন করেছি।" তেমনি দেশবন্ধুকে লেখা একটি পত্রে তিনি আরো সুস্পষ্টভাবে বলেছেন: "আমি এখন সুনিশ্চিত ভূমি পেয়েছি। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি সুসম্পূর্ণ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে কাজ করবার এই নতুন শক্তি আমার করায়ত্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরের কর্মক্ষেত্রে গিয়ে কাজ না করতে আমি এখন দৃঢ়সংকল্প করেছি।"

---

* মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মস।

চার বছর নীরবে যোগসাধনা করার পর শ্রীঅরবিন্দ 'আর্য' নাম দিয়ে ইংরেজিতে একটি নতুন মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এবার রাজনীতি নয়, দর্শন। 'আর্য' ছিল শ্রীঅরবিন্দের একক প্রয়াস। অবশ্য ঠিক একক ছিল না; একজন বিদগ্ধ ফরাসী দার্শনিকের সহযোগিতা ছিল এর সূচনাকালে। তাঁর সাহিত্যিক ও দার্শনিক প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ পরিলক্ষিত হয় এই 'আর্য' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই। 'বন্দেমাতরম্' এবং 'কর্মযোগিন্'-এর পরবর্তী স্তরে এই 'আর্য' পত্রিকার অভ্যুদয় সমকালীন ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, সন্দেহ নেই। শ্রীঅরবিন্দের মানস-জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, তাঁর মন চিরকালই অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। বাইরে তিনি কাজ করেছেন খুব কম, মানসিক নিঃশব্দতার মধ্য দিয়েই তিনি যেন কাজ করেছেন সবচেয়ে বেশি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মনটা ছিল বৈদ্যুতিক শক্তির একটি আধার বিশেষ এবং সেই আধার থেকে একের পর এক যেসব ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হতো, তাঁর লেখনীমুখে তাই ফুটে উঠতো শাশ্বত সত্যের উজ্জ্বল বিভায়। কি 'বন্দেমাতরম্' কি 'কর্মযোগিন্', কি 'ধর্ম', আর কি 'আর্য'—শ্রীঅরবিন্দের চিরন্তন চিন্তা ও কল্পনার দানে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট এই পত্রিকা-চতুষ্টয়ের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়ে আছে তাঁর মানস-জীবনের বিভিন্ন পর্বের পরমাশ্চর্য ইতিহাস। তাঁর অক্লান্ত লেখনী যে বিপুল স্বর্ণ-শস্য প্রসব করেছিল, তা চিরকালের মতো সঞ্চিত হয়ে আছে এই পত্রিকাগুলির আধারে। এই পত্রিকা চারখানিকে তাঁর মানস-জীবনের চারটি উন্নত স্তম্ভ বললেই হয়।

শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী-জীবনে শ্রীমায়ের কথা অবশ্যই উল্লেখ্য।

শ্রীঅরবিন্দ নিজেই লিখেছেন: "পণ্ডিচেরীতে যখন এলাম, অন্তর থেকে একটি কার্যসূচীর নিদেশ পেলাম আমার সাধনার সম্পর্কে। আমার দিক থেকে তা আমি পালন করে চললাম, কিন্তু তার সাহায্যে অন্যদের বিশেষ সাহায্য করতে পারছিলাম না, এমন সময় এলেন মীরা এবং তাঁরই সাহায্যে আমি বাঞ্ছিত পন্থাটি আবিষ্কার করলাম। তাঁকে যখন দেখি, তখনই প্রথম বুঝলাম যে নিঃশেষে নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়া বাস্তবিকই সম্ভব এবং তাঁরই সাহায্যে আমার উদ্দিষ্ট যোগসাধনা কার্যত সম্ভব হয়ে উঠলো এই পৃথিবীতে।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার কয়েক মাস আগে পল-রিশার সস্ত্রীক এলেন পণ্ডিচেরীতে। এখানকার ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচন-প্রার্থী হয়ে তিনি এসেছিলেন। নির্বাচনে অবশ্য তিনি জয়লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। এখানে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর সাক্ষাৎকারটাই ছিল বড় কথা। প্রথমে পল-রিশার সাক্ষাৎ করেন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে এবং জানা যায় যে, এই প্রথম সাক্ষাতে

উভয়ের মধ্যে বেশ কয়েক ঘণ্টা কথাবার্তা হয়েছিল। রাজনীতির মানুষ হলেও, পল-রিশার প্রকৃতপক্ষে ছিলেন একজন চিন্তাশীল দার্শনিক ও ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের একান্ত অনুরাগী। প্রথম দর্শনেই শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর মনে হয়েছিল—ইনিই তাঁর সেই বহু-অন্বেষিত ব্যক্তি যাঁকে তিনি সারা জীবন ধরে সারা পৃথিবীতে খুঁজে বেড়িয়েছেন। মনে হয়েছিল ইনি একজন পরম জ্ঞানী ব্যক্তি। এর চার বছর পরে, তিনি তাঁর একটি গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দকে 'এশিয়ার উদীয়মান সূর্য' বলে অভিনন্দন জানালেন।*

বিশার-পত্নী মীবাদেবী ছিলেন শৈশবাবধি একজন সাধিকা। ১৯১৪, ২৯শে মার্চ তিনি প্রথম সাক্ষাৎ করেন শ্রীঅরবিন্দকে। সাক্ষাৎ করলেন তাঁর দীর্ঘকালের অন্বেষিত মহাপুরুষকে। এ যেন দুইটি আত্মার সাক্ষাৎ। পরের দিনই শ্রীমতী মীরা তাঁর ডায়েরীতে এই কয়টি কথা লিপিবদ্ধ করলেন: "গতকাল যাঁকে এখানে আমরা দেখলাম তিনি তো এই মাটির পৃথিবীতেই রয়েছেন; তাঁর উপস্থিতিই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে এমন একদিন আসছে যখন এখানকার সব কিছু অন্ধকারই রূপান্তরিত হয়ে যাবে আলোতে; যখন ওগো প্রভু, তোমারই স্বর্গরাজ্য এখানে—এই পৃথিবীর বুকে—প্রতিষ্ঠিত হবে।" এই সাক্ষাৎকার শ্রীঅরবিন্দের জীবনে যেমন, তেমনি ভারতবর্ষের পক্ষে এবং বৃহত্তর জগতের পক্ষেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রিশার-দম্পতী সেই সময় দীর্ঘকাল পণ্ডিচেরীতে অবস্থান করেছিলেন। তখন এঁদেরই সহযোগিতায় 'আর্য' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। পলই প্রথম প্রস্তাব করেন যে, তারা একখানি দার্শনিক পত্রিকা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন এবং শ্রীঅরবিন্দ যদি তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাহলে খুব ভাল হয়। এর যাবতীয় ব্যয়ভার রিশারই বহন করতে সম্মত হন।

১৯১৪, ১৫ই আগস্ট।

প্রথম সংখ্যা 'আর্য' প্রকাশিত হলো।

দেশ-বিদেশের মনীষিদের কাছে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

সবাই একবাক্যে জানায় তাদের অভিনন্দন এই নবজাত পত্রিকাকে যার ললাটে অঙ্কিত ছিল বেদ, গীতা, তন্ত্রের আলো আর সর্ব-সমন্বয়ী চেতনার উজ্জ্বল দীপ্তি। যে পড়ে সেই-ই মুগ্ধ হয়, হয় উদ্বুদ্ধ। প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতা, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ বলতেন—"আর্য সাধারণ কাগজ ছিল না, এ ছিল ভারতের জাতীয়তাবাদের নবশাস্ত্র। বেদগ্রন্থ বললেই হয়।" এরই পাতায় পাতায় একাদিক্রমে সাতটি বছর শ্রীঅরবিন্দের লেখনীমুখে আমরা পেলাম "বিশ্বমানবতার পরিত্রাণের মন্ত্র, নতুন মানবতার আগমনবার্তা, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর অভিযানের মানচিত্র এবং পাথেয়, আর

* ডন্ ওভার এশিয়া: পল-রিশার।

অফুরন্ত প্রগতির প্রেরণা।" একদিন পৃথিবীর মানুষ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধমুখে পেয়েছিল 'গীতা'। আর আজ বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের সূচনায় শ্রীঅরবিন্দ মানবজাতিকে উপহার দিলেন 'আর্য', যার মধ্যে শাশ্বতকালের জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে রইল মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিবর্তনের অভ্রান্ত সংবাদ। এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দের প্রতিভার এক নবদিগন্ত পরিলক্ষিত হয়। মাসিক পত্রিকার জগতে এমন উন্নত ধরণের চিন্তাগর্ভ মাসিক পত্রিকা আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় একখানি আর দেখা যায় নি। পণ্ডিচেরীতে তাঁর সেই নির্জন আশ্রমের শান্ত ও অনুকূল পবিবেশ ও রিশার-দম্পতীর প্রেরণা এবং উৎসাহ যেন নবীন সূর্যালোকের মতো অরবিন্দ-প্রতিভার উজ্জ্বলতম ও সার্থকতম বিকাশ চেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করে দিয়েছিল—যেমন একদিন স্বদেশীযুগের বাংলার উত্তাল পরিবেশের মধ্যে বিপিনচন্দ্র ও শ্যামসুন্দরের সহযোগিতায় বন্দেমাতরমের পৃষ্ঠায় তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভার বিকাশ প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। বাস্তবিক, অরবিন্দ-প্রতিভার একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, যুগ-পরিবেশ থেকে তিনি তাঁর মানসপ্রবণতা অনুযায়ী উপকরণ আহরণ করে নিতে পারতেন। তাই তো অরবিন্দ-সংস্কৃতি অথবা শ্রীঅরবিন্দের জীবনব্যাপী ধ্যান-ধারণা ও কবি-কল্পনা এমন পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করতে পেরেছিল। পৃথিবীর মানুষ আজ তারই উত্তরাধিকার ভোগ করছে। করবেও চিরকাল।

বিশাল অরবিন্দ-সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে উঠেছিল, ভারত সংস্কৃতির উপাদানকে আশ্রয় করেই। তাঁর জীবনেতিহাসে আমরা তাই দেখতে পাই যে, পণ্ডিচেরী আসার পর প্রথম চার বৎসর বেদাধ্যয়নে অতিবাহিত করেছিলেন তিনি। নলিনীকান্ত গুপ্ত এর সাক্ষ্য দিয়েছেন: "শ্রীঅরবিন্দ এক-একটা সূত্র ধরতেন—একবার পড়তেন এবং প্রত্যেকটি বাক্যের অর্থ বলে দিতেন, তারপর সমগ্রটির অনুবাদ।...ঋগ্বেদ ব্যাখ্যার এই ছিল তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি। মূল পাঠ করে, অন্তর্জ্ঞানে সাক্ষাৎভাবে তিনি প্রথমে অর্থ আবিষ্কার করতেন। পরে সে অর্থটি বাহ্যতর পরীক্ষা করে যুক্তিসহ করে ধরতেন এবং তদনুসারে প্রয়োজনমত পরিবর্তন সাধন করতেন।"

শুধু ইংরেজি ভাষায় নয়, ফরাসি ভাষাতেও এর একটা সংস্করণ সেই একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল 'রিভ্যু দ্য গ্রাণ্ড সিনথেসি' নামে। এটার মধ্যে বেশিরভাগ থাকত 'আর্য' পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধাবলির অনুবাদ। আগেই বলা হয়েছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে 'আর্য' পত্রিকা প্রকাশনের এই প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল; তাই প্রথম সাতটি সংখ্যা বেরুবার পর ফরাসি সংস্করণটি বন্ধ হয়ে যায়। কারণ রিশারদের তখন তাঁদের স্বদেশে ফিরে যেতে হয়েছিল। 'আর্য' অবশ্য চলতে থাকে এবং একাদিক্রমে প্রায় সাত বছর ধরে এটি নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২১ সালে এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। রিশারদের প্রস্তাবে শ্রীঅরবিন্দ

সম্মত হয়েছিলেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল যে, ১৯০৪ থেকে শুরু করে ১৯১৪ পর্যন্ত তাঁর জীবনে যত কিছু অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি এসে জমেছে সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বিবৃত করবার সুযোগ এতে মিলবে—সুযোগ মিলবে পৃথিবীর মানুষের জন্য কিছু কাজ করবার।

পত্রিকাটির প্রধান লেখক শ্রীঅরবিন্দই ছিলেন। পল-রিশার ও শ্রীমতী মীরা রিশার এবং আরো অনেকেই লিখতেন।

কিন্তু সম্পাদক স্বয়ং যেসব অমূল্য জিনিস দিতেন তাই-ই ছিল পত্রিকাটির ভিতরের সার বস্তু, ও সকলের কাছে তাই ছিল প্রধান আকর্ষণ। 'আর্য' পত্রিকার প্রকৃত হৃদয়, আত্মা ও মস্তিষ্ক বলতে যা কিছু বোঝায় শ্রীঅরবিন্দ এব তাই ছিলেন। সুতরাং এ কথা বলা যেতে পারে যে, স্বদেশীযুগে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদনায় তাঁর দক্ষিণে ও বামে বিপিনচন্দ্র ও শ্যামসুন্দর থাকলেও পত্রিকাটির কেন্দ্রীয় শক্তি ছিলেন অরবিন্দই; তেমনি এই নতুন পত্রিকাটির সম্পাদনার ব্যাপারে রিশার-দম্পতীর সহযোগিতা থাকলেও, এরও প্রাণপুরুষ ছিলেন তিনিই। তবে এখানে একটা প্রশ্ন আছে। একটি দার্শনিক পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব তিনি নিলেন কেন? শ্রীঅরবিন্দ নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন: "আমি আমার জীবনে কস্মিন্‌কালেও দার্শনিক ছিলাম না, এমন কি দর্শন সম্বন্ধে আমার একটুও বিদ্যে ছিল না—অবশ্য কবি ছিলাম, রাজনৈতিকও ছিলাম, কিন্তু দার্শনিক মোটেই নই। আমার একটা ধারণাই ছিল যে যোগী হতে হলে সকল বিষয়েই হাত লাগাতে পারা চাই, তাই রিশারের কথাতে আমি না বলতে পারলাম না।"* সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি যে, তাঁর যোগাভ্যাসলব্ধ অনুভূতিই আর্যের পৃষ্ঠায় তাঁর লেখনীমুখে সুগভীর দর্শনতত্ত্ব হয়ে ফুটে উঠেছিল।

শ্রীঅরবিন্দের ফরাসি জীবনীকার ডঃ গাব্রিয়েল মনো-হার্ৎসেন লিখেছেন: "দ্বিতীয় বছর থেকে প্রায় সবটুকুই শ্রীঅরবিন্দকে একা হাতে লিখতে হয়েছে, পরবর্তী সাড়ে পাঁচ বছরে, চার হাজার পৃষ্ঠার অনেক বেশি রচনা, যার মধ্যে গোটা চল্লিশ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ এবং দশটি সর্বপ্রধান গ্রন্থ অন্যতম।…সরাসরি টাইপরাইটারে লিখে যেতেন তিনি। রচনার বিষয়বস্তু এবং কত পৃষ্ঠা লেখা প্রয়োজন, মনে মনে স্থির করে তিনি টাইপ করতে শুরু করতেন, একটিবারও কাটাকুটি করতেন না, বিন্দুমাত্র অদলবদলও নয়। ফলে, দেখা যায় তাঁর প্রায় সব গ্রন্থেরই পরিচ্ছেদগুলির দৈর্ঘ্য মোটামুটি একই রকম—আনুমানিক বারো পৃষ্ঠা—এবং এক-একটি বিষয় নিয়ে এক-একটি পরিচ্ছেদ স্বয়ং-সম্পূর্ণ। এই দৈর্ঘ্যের মধ্যে সবিস্তারে সব কথা বলা যেত না ব'লেই গুরুতর বিষয়গুলি তিনি অনেকগুলি পরিচ্ছেদে ভাগ করে নিয়ে প্রত্যেক

---

*অন হিমসেলফ: শ্রীঅরবিন্দ।

পরিচ্ছেদে বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন ধারাকে সবশেষে নিয়ে গিয়ে প্রবাহিত করেছেন একই খাতে।

"মাসিক 'আর্য' প্রকাশিত হ'বার শেষ ছয় মাসে শ্রীঅরবিন্দ দুটি মাত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন: সাধারণতঃ তিনি একাদিক্রমে ছ'টি গ্রন্থ রচনা করতেন। সেগুলি বিভিন্ন প্রত্যেকটিই—তাদের বিষয়বস্তুতে যেমন, জ্ঞানসম্ভারের বৈচিত্র্যেও তেমনি—কিন্তু একই অন্তর্দৃষ্টির অভিব্যক্তি। একটিই যেন মহাগ্রন্থ—বিভিন্ন তার আঙ্গিক। কেন্দ্রীয় এক পরিস্থিতিতে রচনাকে উপনীত করে শ্রীঅরবিন্দ তারপর একাগ্র দৃষ্টিপাত করেন একে-একে বিচিত্র বিভিন্ন বিষয়বস্তুর প্রতি, এবং যা কিছু নয়নগোচর হয় তারই বর্ণনা দেন। কেন্দ্রীয় এই অবস্থিতি হ'ল যোগশক্তির বলে উদ্‌ঘাটিত পরম সত্যেরই স্বীয়করণ এবং সদ্ব্যবহার। সেই পরম সত্যেরই আলোক তিনি নিক্ষেপ করেন জগৎ আর মানুষের যাবতীয় সমস্যার ওপর, ভারতীয় ঐতিহ্যের ওপর, সামাজিক জীবনের ওপর, কাব্যের গতিবিধির ওপর।"*

'আর্য' পত্রিকার বৈশিষ্ট্য এবং গৌরব এখানেই।

পত্রিকাটির সূচনাকাল থেকেই এর প্রধান আকর্ষণই ছিল সম্পাদকের রচনা। প্রথম প্রথম এর গ্রাহকসংখ্যা দুশোর বেশি হয় নি, পরে অবশ্য দু'হাজার হয়েছিল। ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ যেসব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার মধ্যে ছিল গীতা-প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধমালা ('এসেজ্ অন্ দি গীতা'), দিব্য জীবন ('লাইফ ডিভাইন'), যোগসমন্বয় ('সিনথিসিস অব যোগ'), বেদরহস্য ('দি সিক্রেট অব দি বেদ'), মানব ঐক্যের আদর্শ ('দি আইডিয়াল অব হিউম্যান ইউনিটি'), ভারতীয় সংস্কৃতির মূলকথা, ('এ ডিফেনস্ অব ইণ্ডিয়ান কালচার' ; গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় এই নামটির পরিবর্তন করে রাখা হয় 'দি ফাউনেডেসনস্ অব ইণ্ডিয়ান কালচার'), সামাজিক উন্নতির মনস্তত্ব ('দি সাইকোলজি অব সোসাল ডেভলপমেণ্ট') ইত্যাদি।

"এইভাবে প্রতি মাসে ঐ পত্রিকার পাঠকেরা নানাদিক দিয়ে শ্রীঅরবিন্দের পরিণত মনের গভীর গবেষণাগুলির পরিচয় পেতে থাকতেন। দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, সমাজতন্ত্র, শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সকল বিষয়েই তাঁর অন্তর্দৃষ্টির অদ্ভুত পরিচয় ওতে পাওয়া যেত। ঐসব প্রবন্ধের অধিকাংশই এখন সংশোধিত ও সংকলিত হয়ে পুস্তকাকারে বেরিয়েছে। ব্যাপক বিশ্ব-ভাবনার দিক দিয়ে এগুলি যে অমূল্য, আর ভারতের অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।"†

* পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'সমসাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

† মহাযোগী: দিবাকর।

'আর্য' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইন ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়ান কালচার' গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতে যেমন রাষ্ট্রগঠন ও শাসনতন্ত্র ছিল, সেই জাতীয় ধারার বিকাশ সাধন করেই বর্তমান কালোপযোগী রাষ্ট্রের সৃজন করতে হবে। তবেই না ভারতের অতি জটিল রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাসমূহের সন্তোষজনক সমাধান হতে পারবে। উত্তরকালে শ্রীঅনিলবরণ রায় শ্রীঅরবিন্দের এই গ্রন্থের শেষাংশ বাংলায় অনুবাদ করে 'ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা' নাম দিয়ে একটি স্বল্পায়তন গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। গ্রন্থটির চতুর্থ অধ্যায় ('ভারতীয় ঐক্যসাধন সমস্যা') থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো। ভারতে মুঘল, মারাঠা ও শিখ রাষ্ট্রশক্তির উত্থান-পতনের পর, "আসিল নিশার অন্ধকার, সকল রাষ্ট্রনীতিক উদ্যম ও সৃষ্টি সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গেল। আমাদের এক পুরুষ পূর্বে পাশ্চাত্য আদর্শ ও অনুষ্ঠানগুলি দাসসুলভ নিষ্ঠার সহিত অনুকরণ ও গ্রহণ করিবার যে প্রাণহীন প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, তাহা হইতে ভারতবাসীর রাষ্ট্রনীতিক মণীষা ও প্রতিভার কোনো সত্য পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু আবার অনেক ভ্রান্তি কুজ্ঝটিকার মধ্যেও এক নূতন সন্ধ্যার আলোক দেখা যাইতেছে, প্রদোষের সন্ধ্যা নহে, প্রভাতেরই যুগসন্ধ্যা। যুগযুগান্তের ভারত মরে নাই, তাহার সৃষ্টির শেষ কথাও এখনো বলা হয় নাই ; সে জীবিত রহিয়াছে, নিজের জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য এখনো তাহার কিছু করিবার রহিয়াছে। আর এখন যাহা জাগ্রত হইতে চাহিতেছে, তাহা একটা ইংরাজি-ভাবাপন্ন প্রাচ্যজাতি নহে, পাশ্চাত্যের অনুগত শিষ্য হওয়া এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলাফলগুলির পুনরভিনয় করাই তাহার নিয়তি নহে, পরন্তু তাহা এখনো সেই প্রাচীন স্মরণাতীত কালেরই শক্তি পুনরায় নিজেরই গভীরতর আত্মার সন্ধান পাইতেছে, সকল জ্যোতি ও শক্তির পরম উৎসের দিকে নিজের মাথা আরো উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিতেছে, নিজের ধর্মের পূর্ণ অর্থ ও বিশালতার রূপ আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।"

জাতির জীবনবেদ গীতা।

কিন্তু নানা মতের ভাষ্য আর টীকায় সেই গীতার আলো আজ কতখানি আচ্ছন্ন হয়েছে। এইটা অনুভব করলেন শ্রীঅরবিন্দ। 'আর্য' পত্রিকায় লিখলেন কুরুক্ষেত্রের এই আলোকময়ী কাব্যের উপর এক নতুন আলোচনা। পৃথিবীর মানুষ চমকে উঠলো তাঁর গীতা-নিবন্ধগুলি মাসের পর মাস পাঠ করে। এমন স্বচ্ছ প্রাণময়ী ভাষায় এর আগে আর কেউ তো গীতার মর্মকথা এমনভাবে উদ্ঘাটন করতে পারেন নি। নিছক তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, এ যেন এক নতুন সৃষ্টি। এ শ্রীঅরবিন্দের গীতা। বহু শতাব্দীর পরপারে কুরুক্ষেত্রের সেই রণস্থল পরিত্যাগ করে, বিংশ শতকের ভারতে

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যেন আবার এসে নতুন করে গীতার মর্মবাণী আমাদের শোনালেন এই প্রবন্ধমালার ভিতর দিয়ে। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে গীতাটা শুধু বলা হয়েছিল, কিন্তু তার যথার্থ ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। যুগে যুগে যুগাচার্যগণ এর ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেইসব ব্যাখ্যার কোন কোনটির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত। তথাপি আমাদের মনে হয়, সেসব ব্যাখ্যার মধ্যে কোথায় যেন একটা অভাব, একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। ভাষ্যের পর ভাষ্যের কুজ্‌ঝটিকার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল গীতার সংবাদ। সেই শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদ নতুন করে নবীন রূপে আমাদের কালে বহন করে নিয়ে এলেন শ্রীঅরবিন্দ।

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির গণ্ডীর ভিতর থেকে বের করে নিয়ে এসে শ্রীঅরবিন্দ দেখালেন, এই গীতা সমগ্র মানবজাতিরই গ্রন্থ। ইহা মানব-প্রকৃতির স্বচ্ছ দর্পণ। জগতের যেখানে যে প্রকৃতির মানুষ থাকুক না কেন—গীতা-দর্পণে সকলেই আপন আপন মুখচ্ছবি দেখতে পাবেন—যদি আপনাকে আপনি কেউ বুঝতে চান। আসলে গীতা কি? গীতা হলো দেবাসুর-সম্বন্ধে মানব-প্রকৃতি স্পন্দনের ইতিহাস। এ ইতিহাসে কোথাও সাম্প্রদায়িকতা নেই। গীতা শুধু মানব-প্রকৃতিই দেখিয়ে দিচ্ছে না—কেমন করে মানুষ স্বীয় প্রকৃতি বুঝে উন্নতি লাভ করতে পারে—করে কিরূপে চিরশান্তি লাভ করতে পারে, গীতা তাও দেখিয়েছেন। এক কথায়, মানুষের যা প্রয়োজন, গীতা জ্বলন্ত অক্ষরে তাই-ই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

অপূর্ব গ্রন্থ এই গীতা। অপূর্ব এর উপদেশ। মানবজাতির পরিপূর্ণ সনাতন ধর্মগ্রন্থ এই গীতা। সকল জাতির ধর্মের সূত্র এর মধ্যে নিবদ্ধ। গীতা মানুষকে পূর্ণ করবারই গ্রন্থ। শ্রীভগবান যোগস্থ হয়ে গীতা উপদেশ করেছিলেন। এইজন্যই গীতার অপর নাম যোগশাস্ত্র। শ্রীঅরবিন্দও তেমনি যোগস্থ হয়ে একাগ্রচিত্তে রচনা করেছেন তাঁর গীতা-নিবন্ধ। তাইতো তিনি গীতার মর্ম উদ্ঘাটনে সফল হয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যার মধ্যে নতুনত্ব কোথায়?

"গীতার যুগে যোগসাধনায় যে সংকীর্ণতা আসিয়াছিল বর্তমানে কতকটা তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। তখন এই ধারণা খুবই প্রবল হইতেছিল যে, যোগের সহিত ব্যবহারিক জীবনের আধ্যাত্মিকতার সহিত সাংসারিক কর্মের কোন সমন্বয় হইতে পারে না—সেই শিক্ষার প্রভাবেই বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন তাঁহার ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুক হইতে চাহিয়াছিলেন। অর্জুনের এই সমস্যাকে লক্ষ্য করিয়াই সমগ্র গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে—বেদ ও উপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়া দেখান হইয়াছে যে, যোগের সহিত সাংসারিক কর্মের কোনই বিরোধ নাই, পরন্তু যোগই হইতেছে কর্মের প্রকৃত কৌশল, যোগঃ কর্মসু কৌশলম্, যোগসাধনার দ্বারাই আমাদের স্বাভাবিক শক্তিসকল তাহাদের পূর্ণতা ও উচ্চতম নিপুণতা লাভ করিতে পারে।"

"কিন্তু গীতার এই শিক্ষা বৌদ্ধধর্মের প্রবল বন্যায় ভারতবাসীর জীবনে যথাযথ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, পরে আচার্য শঙ্কর গীতার যে মায়াবাদমূলক ভাষ্য প্রণয়ন করিলেন তাহাতে গীতা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল।...কিন্তু শঙ্করের ন্যায় গীতা এই দুঃখময় সংসারকে ত্যাগ করিতে বলে নাই; সাধনার দ্বারা ভগবানকে লাভ করিয়া, দুঃখের সহিত সকল সংযোগের বিয়োগ ঘটাইয়া সংসারেই থাকিতে বলিয়াছে, সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম করিতে বলিয়াছে, সর্বকর্মাণি। ভগবানকে অস্বীকার করিয়া, আত্মার সন্ধান না করিয়া সাংসারিক জীবন যাপন করিতে থাকিলে তাহার কি ভীষণ পরিণাম হয় জড়বাদী য়ুরোপ তাহার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, আর মায়াবাদের প্রচার করিয়া লোকসকলকে সংসার বিমুখ, কর্মবিমুখ করিলে কি বিষময় ফল হয়, ব্যবহারিক জীবনে ভারতের চূড়ান্ত অধঃপতন তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মানবজাতিকে যদি রক্ষা পাইতে হয়, আবার সেই গীতার সত্য আদর্শে ফিরিয়া যাইতে হইবে—ভিতরে অধ্যাত্ম চৈতন্যে, ভাগবত চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিব্যভাবে বাহিরের সাংসারিক জীবনকে গ্রহণ করিতে হইবে।"

তাঁর গীতা-নিবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ গীতার অন্তর্নিহিত এই শিক্ষাকেই পৃথিবীর সামনে তুলে ধরলেন। বললেন প্রত্যয়ের ভঙ্গিতে—আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত "গীতার শিক্ষার অনুসরণ অমনি মুখের কথাতেই হয় না", অথবা, "গীতা যে আধ্যাত্মিকতার সহিত জীবনের সমন্বয়কেই মানবজীবনের আদর্শ বলিয়াছে, এইভাবে তাহা সিদ্ধ করা যায় না।" গীতার আলোকে তিনি যে আধ্যাত্মিকতার সন্ধান দিলেন তাই হলো তাঁর পূর্ণযোগের ভিত্তি। গীতার আলোকে তাঁর সত্তার ভিতর ও বাহির উদ্ভাসিত ছিল। তাই না শ্রীঅরবিন্দ বলতে পেরেছেন: "আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে আসি নি, আমার আধ্যাত্মিকতা সাধু সন্ন্যাসী হতেও বলে না। কিংবা জগতকে এড়িয়ে থাকতে বলে না। পার্থিব জীবনের প্রতি উপেক্ষা, ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা, এর আমি অনুমোদন করি না। জগতের সব কিছুকে অল্পাধিক মাত্রাতে আধ্যাত্মিক বলা যেতে পারে—আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সব কিছুরই স্থান আছে।"

'আর্য' শ্রীঅরবিন্দ-মানসের সর্বোত্তম অভিব্যক্তি।

আর্যের পৃষ্ঠায় গড়ে উঠেছিল একের পর এক চিন্তার বিশাল সৌধ।

ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের বিচিত্র সৌধ।

সেসব সৌধের ভিত্তিভূমি ছিল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা।

আর্য পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলি তাই কালকে অতিক্রম করে কালাতীত হয়ে আছে।

শ্রীঅরবিন্দের ঐন্দ্রজালিক গদ্যশৈলীর অপূর্ব নিদর্শন তাঁর এইসব প্রবন্ধসম্ভার।

চিন্তা ও প্রজ্ঞার কথা বাদ দিলেও, কি পরিমাণ কায়িক শ্রম ছিল এগুলির পিছনে তা ভাবলে পরে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর এক জীবনীকার যথার্থই বলেছেন : "তাঁর প্রতিভা-পুষ্ট 'আর্য' হলো মনুষ্যজাতির জন্য শ্রীঅরবিন্দের শ্রেষ্ঠ অধিকার।" এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আর্য পত্রিকার স্বর্ণ বেদীর উপরেই এর সম্পাদক প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন নিখিল-মানবের জন্য ভবিষ্যতের একটি নতুন সমাজ—আর্য সমাজ। শুধু ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন নয়, বৈদিক ঐতিহ্যের পুনঃপ্রবর্তন নয়, প্রচলিত হিন্দুসাধনার তাত্ত্বিক বিচার নয়, ভারতীয় সমন্বয়প্রবণতাকে আশ্রয় করেই শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীতে সত্যিই এক নবযুগের সূচনা করে গিয়েছেন। আর্য পত্রিকায় আমরা সেই অনাগত যুগেরই শঙ্খধ্বনি শুনেছি। শুনেছি, "এই পৃথিবীর মানুষই দেবতায় পরিণত হবে একদিন। দেবতা কেউই নয়, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন, তাঁকে প্রকট করা দেবজীবনের লক্ষ্য··· ভিতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে প্রত্যেক মানুষ ভগবৎ জীবন লাভ করুক, এইটাই আমি চাই।"

॥ বত্রিশ ॥

"পণ্ডিচেরী হলো আমার নির্জনবাস। এ আমার তপস্যা করবার গুহা, সে তপস্যা আমার নিজেরই ধরণে, তা সাধারণ তপস্যা নয়। সন্ন্যাস গ্রহণ করতে আমি আসি নি, আমার আধ্যাত্মিকতা সাধু-সন্ন্যাসী হতেও বলে না, কিংবা জগতকে এড়িয়ে থাকতেও বলে না। যে সাধনা আমি শুরু করেছি তাতে ভিতরের দিক থেকে আগে আমার সিদ্ধি মেলা চাই, তবেই এ-গুহা থেকে আমি বেরুতে পারি। ভারতের জন্য আমার যা করা উচিত তা আমি নিজের মতো উপায়েই করছি। আমার বিশ্বাস যে দেশ এখন স্বাধীনতার দিকেই অগ্রসর হয়ে চলেছে। আর সেই স্বাধীনতা তার মিলবেই।···আমার বিশ্বাস যে ভারতের আত্মা আছে, তার এক নিজস্ব প্রতিভা আছে। আমি কোন এক ধরণের সামাজিক গণতন্ত্রের অনুমোদন করি। কিন্তু ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার সঙ্গতি থাকা চাই। এই দিক দিয়ে অনেকেরই ধারণা এখনো সুস্পষ্ট হয় নি।"

এই কথা বলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে। মনে হয় তখন থেকেই তিনি যেন গভীরতার সাধনায় ডুবে যেতে থাকেন। তখন যাঁরা তাঁকে দর্শন করতে আসতেন তাঁদের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, সেই সময় থেকেই বাহ্যত তাঁর শারীরিক পরিবর্তন হতে শুরু করছে। একজনের বিবরণ থেকে একটু উদ্ধৃতি দিই এখানে। ইনি দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ যোগী সুব্বারাও। শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করতে ইনি পণ্ডিচেরী আশ্রমে এসেছিলেন ১৯২৩ সালের শীতঋতুর প্রারম্ভে। ইনি লিখেছেন: "শ্রীঅরবিন্দের গাত্রবর্ণে চোখ-ঝলসানো এক উজ্জ্বলতা দেখলাম।···চক্ষুদুটি অতিশয় আয়ত দৃষ্টি, অন্তর্ভেদী শায়কের মতোই তীক্ষ্ণ। কণ্ঠস্বর মৃদু, কিন্তু শ্রুতিগ্রাহ্য; দ্রুত এবং গীতময় তার রেশ। বাচনভঙ্গিও তাঁর স্বচ্ছন্দ, গতিময় এবং স্ফটিকের মতোই তার স্বচ্ছতা।" কিন্তু এই পরিবর্তনটা প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছিল সেই তাঁর আলিপুর আশ্রমবাসের সময় থেকেই।

এই পরিবর্তন শুধু তাঁর চক্ষের ঔজ্জ্বল্যে বা মাথার কেশে নয়, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, এমন কি তাঁর মনের মধ্যেও, তখন থেকেই এটা পরিলক্ষিত হয়েছিল। চিত্তবৃত্তি নিরোধের অবস্থাটা তখনি তাঁর মধ্যে পূর্ণভাবেই দেখা গিয়েছিল। তাঁর স্বচ্ছ চক্ষু দুটির পলকহীন স্থির প্রেক্ষণ আদালতের সবাইকে রীতিমত বিস্মিত

করেছিল। তখন থেকেই তিনি যোগী, তপস্বী। পণ্ডিচেরীর নির্জন আশ্রমে তারই পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখতে পাই। সুব্বারাও-প্রদত্ত বিবরণের মধ্যে আছে তারই সমর্থন। তেমনি পণ্ডিত কপালী শাস্ত্রী যখন শ্রীঅরবিন্দকে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করেন ১৯২৪ সালে তখন, শাস্ত্রীজী স্বয়ং বলেছেন, "তাঁর সর্বাঙ্গে এমন এক দ্যুতি দেখা গিয়েছে যার ফলে তাঁর গায়ের রঙ পর্যন্ত বদলে গিয়েছে; কেমন এক স্বচ্ছ শুভ্র আলোয় ভরে গিয়েছে তাঁর সর্বাঙ্গ।" এমন পরমাশ্চর্য রূপান্তরের সাক্ষ্য দিয়েছেন আরো একজন। তিনি অম্বুভাই পুরানী, শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম জীবনীকার এবং আশ্রমীদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন।

পুরানীজী যখন ১৯২১ সালে দ্বিতীয়বার দর্শন করেন তখন, তিনি লিখেছেন: "তাঁর শরীরে এমন এক আশ্চর্য রূপান্তর সাধিত হয়েছে যাকে অলৌকিক ছাড়া আর কোন নাম দেওয়া যায় না।...দেখি গালে তাঁর আপেলের মতো গোলাপী দ্যুতি আর সর্বাঙ্গে মৃদু সাদাটে ঘিয়ে রঙের আলো।"...মাত্র দু'বছর আগে যাঁকে তিনি দেখেছিলেন শ্যামবর্ণ, আজ দু'বছরের ব্যবধানে এই "আশাতীত এবং অসম্ভব" পরিবর্তন দেখে পুরানীজীও বিস্মিত হয়েছিলেন। এই রূপান্তর প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ বলতেন: "ঊর্ধ্বতন চেতনা যেমন মানসিক স্তর থেকে প্রাণিক স্তরে এবং তারো নীচে অবতরণ করে, বিরাট এক রূপান্তর সংঘটিত হয় তখন স্নায়ু এবং শরীরের সর্বত্র।" এই গ্রন্থের লেখকও ১৯৩৫ সালে যখন শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে পণ্ডিচেরী গিয়েছিলেন, তখন ফটোয় দেখা পূর্বেকার স্বদেশীযুগের সেই কৃশতনু ও শ্যামবর্ণের মানুষের পরিবর্তে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ও পরমাশ্চর্য এক জ্যোতির্ময় মূর্তি। সেই দেবতনু, সেই দিব্যমূর্তি কোনদিনই ভুলবার নয়।

তাঁর যোগসাধনার ইতিহাসে ১৯২৩ সালটি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে তাঁর অতিমানসের প্রাথমিক উপলব্ধির জন্য। এই বছরে তাঁর জন্মদিনেই তিনি তাঁর উপলব্ধ অতিমানস সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছিলেন বলে জানা যায়। এই সময়ে অতিমানসের সাধনা নিয়েই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। পরবর্তী তিন বৎসর অতিবাহিত হয় অতিমানসের নিরবচ্ছিন্ন সাধনায়। তাঁর সেই অলৌকিক সাধনার সম্পূর্ণ ইতিহাস বাণীবদ্ধ করা সাধারণ লেখকের পক্ষে সুকঠিন।

সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন তিনি সত্য, কিন্তু বাইরের জগতকে ভুলে নয়। ১৯২০ সালের আগস্ট মাসের প্রথম দিনটি লোকমান্যের মৃত্যুসংবাদ বহন করে নিয়ে এলো তাঁর কাছে। তখন তিনি 'আর্য' সম্পাদনা করে চলেছেন। অমনি মনে পড়ে যায় তাঁর একে একে অতীতের কত স্মৃতি, স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই বীরযোদ্ধা সম্পর্কে। মনে পড়ে যায় সেই ১৯০২ সালের কথা যখন আমেদাবাদ কংগ্রেসে তাঁদের উভয়ের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। তাই টিলকের মৃত্যুতে পণ্ডিচেরীর

নিভৃত তপঃক্ষেত্র থেকে ধ্যানের মৌনতা ভঙ্গ করে শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে কিছু না বলে নীরব থাকা অসম্ভব ছিল। লোকমান্য সম্পর্কে সেদিন তিনি যে তর্পণ করেছিলেন, টিলক-চরিত্রের ও টিলক-মানসের মূল্যায়নে সেটি তাঁর একটি সার্থক রচনা। তেমনি ১৯২৫ সালের প্রথম আষাঢ় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু সংবাদ বহন করে নিয়ে এলো তাঁর কাছে। সেই বিলাতের ছাত্রজীবন থেকে রাজদ্বার পর্যন্ত যাঁর অকপট বন্ধুত্ব লাভে তিনি ধন্য হয়েছিলেন, কংগ্রেসের সেই প্রখর ব্যক্তিত্বশালী অপ্রতিরথ নেতার অকাল-মৃত্যুতে শ্রীঅরবিন্দ তাই নীরব থাকতে পারেন নি। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তিনি ইংরেজিতে 'বম্বে ক্রনিকল্' পত্রিকায় যে বাণীটি দিয়েছিলেন তাতে লিখেছিলেন: "চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু বিরাট এক ক্ষতি; রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, ব্যক্তিত্ব, চৌম্বক শক্তি, ইচ্ছা শক্তি, তাৎক্ষণিক কৌশল, মনের এক অসাধারণ নমনীয়তা—তাঁতে বর্তেছিল চরম উৎকর্ষ নিয়ে। টিলকের পরে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভারতবর্ষকে পৌঁছে দিতে পারতেন স্বরাজের লক্ষ্যে।" দেশবন্ধুর রাজনৈতিক প্রতিভা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ যে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন তার একটা বিশেষ কারণ ছিল। তাঁর জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষে যে কাজটা সম্পূর্ণ সুসিদ্ধ হতে পারে নি, একমাত্র চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বেই তা সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তীকালে কংগ্রেস থেকে নরমপন্থীদের তিনিই উৎখাত করতে সক্ষম হন।

অতঃপর "শ্রীমায়ের হাতে সাধনার এবং সাধকদের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে গুটিয়ে নিলেন আরো গভীরের, আরো উর্ধ্বের অভিযানে। ১৯২৬ সালের একেবারে শুরু থেকেই শিষ্যদের তিনি মাতৃমুখী করে তুলতে লাগলেন। স্পষ্টত তিনি একটু-একটু করে নিজেকে ভিতরের দিকে টেনে নিতে লাগলেন।" ১৯২৪ থেকে ১৯২৬—তাঁর প্রখর সাধনার যুগ। ১৯২৪ সালের সূচনা থেকেই দেখা গেল যে, তিনি অতি উচ্চ মার্গে উঠে ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকতেন। যেন একটি অচঞ্চল শিখা। সেই অতিমানসের স্তর থেকে তিনি আর অবতরণ করতে চাইতেন না। আত্মার আলোকিত অভিযান বুঝি এতদিনে তার লক্ষ্যে এসে পৌঁছল। ১৯২৪, ২৬শে মার্চ। প্রকাশ্যভাবে শ্রীঅরবিন্দ বললেন: "এই অতিমানসের দিকে লক্ষ্য রেখে আগে কখনো কেউ সাধনা করেন নি, যদি বা কারো দ্বারা হয়ে থাকে তা নিছক প্রস্তুতি হিসাবে। অতীতকালে কেউ হয়ত বা এরূপ সাধনা করেও থাকতে পারেন কিন্তু তার কোন দৃষ্টান্ত মেলে না। আর যদিও বা কিছু করা হয়েছিল, কালক্রমে তা লোপ পেয়েছে।"

প্রশ্ন করা হলো তাঁকে: "অতিমানসের অবতরণও হয়ত কোন্ কালে ঘটে থাকবে, কিন্তু পরে সেই শক্তি কি আবার তার পূর্বস্থানে ফিরে গেছে?".

উত্তর দিলেন শ্রীঅরবিন্দ: "এমন শক্তিমান অবতারের আবির্ভাব যদি ইতিপূর্বে

হয়েও থাকে, তবু তখন মানবজাতির এই পূর্ণতাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্বন্ধে শুধু আশার কথাই শোনানো হয়ে থাকবে। কিন্তু সেই উপরকার চেতনা নিশ্চয়ই জড়বস্তুর মধ্যে এর আগে কখনো নেমে আসে নি। নামিয়ে আনবার প্রয়াস হয়ত কিছু হয়ে থাকবে। কিন্তু সে শক্তি এখানে—এই পৃথিবীতে—বাস্তবরূপে কার্যকরী হয়ে কখনো নামে নি।"

প্রশ্ন। জড়ের উপরিস্থ স্তরগুলিতে আলো এবং সত্যের অবতরণ ঘটানো কি কঠিন?

উত্তর। না, বিশেষ কঠিন নয়। কিন্তু নিশ্চেতন জড়ের মধ্যে তাকে নামিয়ে আনা অতি দুঃসাধ্য। পরিবর্তন আনতে হবে সমগ্র পরিবেশের মধ্যে। এখানে কেবল জ্ঞান ও শক্তি থাকারই প্রশ্ন নয়, এই জড়ের মধ্যে সেই সত্যকে বাস্তবিকই এনে প্রকট করা চাই।

প্রশ্ন। অতিমানসের অবতরণ সম্ভব হবে কি না?

উত্তর। সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে।

প্রশ্ন। কবে তা ঘটবে?

উত্তর। তা বলতে পারি না। অন্ততপক্ষে এখনো পর্যন্ত তা ঘটে নি ঐটুকুই বলা যায়।

বিজ্ঞানীর গবেষণার যত্ন, ধৈর্য ও একাগ্রতা নিয়ে চলতে থাকে সকলের অগোচরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম-বিজ্ঞানীর অধ্যাত্ম সাধনার দুর্জ্ঞেয় প্রক্রিয়া। এইভাবেই অনন্যমনা হয়ে চলতে থাকে তাঁর সাধনা। অতিমানসের সেই আলোকিত সাধনা যা অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে এক নব দিগন্তের উন্মোচন করে দেবে আব প্রতিষ্ঠিত করবে মানবজাতিকে পূর্ণতায়। এলো ১৯২৬ সাল। শ্রীঅরবিন্দের জীবনব্যাপী সাধনার সিদ্ধি লাভ এই বছরের ঘটনা। এই বছরে তাঁর ৫৪তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আশ্রমে তিনি একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণটির থেকে সবাই জানতে পারেন যে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনাব পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। এর ঠিক তিন মাস পরে, ২৪শে নভেম্বর তিনি তাঁর সিদ্ধিলাভের কথা ঘোষণা করেন।

সেই স্মরণীয় দিনটির, সেই স্পন্দিত মুহূর্তটির প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন: "সেদিন বিকেল পাঁচটায় শ্রীমা সমস্ত সাধকদের কাছে একটা জরুরী তলব পাঠালেন, সকলেই এখানে এসে সমবেত হও। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার মধ্যে সবাই একত্রে এসে সমবেত হলেন। শ্রীঅরবিন্দের জন্য একটা নির্দিষ্ট আসন রাখা হয়েছিল, তার পিছনে সোনার জরিতে তিনটি চীনা ড্রাগনের মূর্তি-আঁকা একটি পর্দা বিলম্বিত। সকলেই শান্ত নিস্তব্ধ হয়ে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, সকলেই অনুভব করতে থাকলেন যে বাতাসে যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহিত

হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ে শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ একত্রেই সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। কেউ কোন সাড়া শব্দ করলেন না। একটা সুগম্ভীর পবিস্থিতির মধ্যে ধ্যানের কাজ শুরু হলো। সেই ধ্যান চললো পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। ধ্যান ভাঙবার পরে শ্রীঅববিন্দ প্রত্যেক সাধককে কাছে ডেকে আশীর্বাদ করলেন। সকলেই তখন অনুভব করছিলেন যে, পৃথিবীতে কোন উচ্চতর শক্তি এবার প্রকৃতই নেমে এসেছে। তাঁদের মধ্যে একজন ঈষৎ অনুচ্চ স্বরে আবেগময় কণ্ঠে বলে উঠলেন—ভগবান স্বয়ং আজ এই পৃথিবীর ধূলিতে পদার্পণ করলেন।"*

ভারতের যুগ যুগান্তের অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসেও এই দিনটি চিহ্নিত হয়ে রইল। অতিমানসের অবতরণকে সুনিশ্চিত করলেন যোগেশ্বর শ্রীঅরবিন্দ। সেই দিন থেকে ভারতেব অন্তরাত্মায় এক স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত হলো তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। সেইদিন থেকে পৃথিবীর মানুষ বুঝলো যে, সে এক যুগ-প্রত্যূষে সমুপস্থিত—বুঝলো যে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রতীক্ষা করছে কল্পনাতীত এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। মানব সভ্যতার ইতিহাসেও তাই স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকলো এক যুগমানবের স্মরণীয় সিদ্ধিলাভের পরমাশ্চর্য কাহিনী।

এই ঘটনার বছর দুই পরে রবীন্দ্রনাথ এলেন পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করতে। স্বদেশী আন্দোলনের সেই বিক্ষুব্ধ পরিবেশে যাঁকে তিনি দেখেছিলেন, আজ তাঁকেই তাঁর নিভৃত তপস্যার আসনে দেখে কবি লিখলেন: "আজ তাঁকে দেখলুম দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়, আজো তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।...আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে—শৃণ্বন্তু বিশ্বে।" প্রাচীন ভারতের ঋষিদের এই উপলব্ধিকেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অলৌকিক সাধনার দ্বারা সত্য করেছেন, সার্থক করেছেন। পণ্ডিচেরী আজ তাই বিশ্বমানবের নবীন তীর্থ হয়ে উঠেছে। এখান থেকেই পৃথিবীর সত্যসন্ধানী মানুষের কাছে আজ অসংশয়িতভাবে পৌঁছেছে দিব্যজীবনের বার্তা। পূর্ণতার বার্তা। মানব-আত্মার লক্ষ্য আজ এই অভিমুখেই নিয়তি-নির্দিষ্ট। শৃণ্বন্তু বিশ্বে—ভারতের এই নিমন্ত্রণই আজ পৃথিবীর চারি প্রান্তে সরবে ও সগৌরবে বাজছে।

* মহাযোগী: দিবাকর।

॥ তেত্রিশ ॥

উনিশশো ছাব্বিশের পর থেকে তাঁর মহাপ্রযাণের দিনটি পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ আত্ম-সৃষ্টিতে নিবিষ্ট ছিলেন। এই পঁচিশ বৎসর কাল পৃথিবীর মানুষ তাঁকে দেখেছে যুগগুরু-যুগাবতার রূপে। তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার আলোকধারায় নিষ্ণাত হয়ে গেছে মানবজাতির সর্বকালের ইতিহাস। ভারতের অরবিন্দ আজ তাই বিশ্ব-মানস সরোবরের প্রস্ফুটিত অরবিন্দরূপে স্বীকৃত ও সম্পূজিত। সত্যচেতনার চরম শৃঙ্গে আরোহণ করে, পূর্ণ জ্ঞানের আলো তিনি প্রবাহিত করে দিয়েছেন এই পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীতে দিব্য-জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে যাঁর আবির্ভাব—যিনি এনে দিয়ে গেলেন মানুষের সর্বসত্তায় এবং তার চেতনায় আমূল এক রূপান্তর, যিনি ঈশ্বর, মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান অবিচ্ছেদ্য যে এক একতা তাকেই বিশ্বমানবের সামনে তুলে ধরে পূর্ণযোগের পন্থার নির্দেশ করলেন—সেই যুগমানব শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কাহিনী আর বেশি না বললেও চলে। এরপর যা বাকী থাকে তা কাহিনী নয়, তত্ত্ব। তত্ত্ব ও দর্শন। সেই বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা করার অধিকার বা যোগ্যতা খুব কম লোকেরই আছে। অন্তত এই লেখক তার দাবী করেন না। তাঁর দর্শন-তত্ত্ব ও পূর্ণযোগের বিষয় আজ না হোক, ভবিষ্যতের মানুষ একদিন নিশ্চয়ই বুঝবার প্রয়াস পাবে। এই সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে একখানি স্বতন্ত্র বই লিখতে হয়।

১৯৪৭, ১৫ই আগষ্ট। ভারতবর্ষের ভাগ্য পরিবর্তন হলো। প্রত্যাশিত স্বাধীনতা লাভ করল এই উপ-মহাদেশ। তাঁরই জীবনকালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বৈকি। কারণ, তাঁর জীবনেতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, "তাঁর সুদীর্ঘ ও নিত্যকর্মরত জীবনকালের মধ্যে তাঁর সকল স্বপ্নই সফল হয়েছে। আর শুধু তাই নয়, তাঁর সেই সাফল্য আনবার দিক থেকে তিনি নিজেও তাতে এক প্রধান নায়কের অংশ গ্রহণ করলেন।" ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দিনটি ছিল শ্রীঅরবিন্দের নিজেরও সপ্ত-সপ্ততিতম জন্মদিন। তাই ভারতের স্বাধীনতার জন্মলগ্নে তিনি বলেছিলেন :

"আমার জন্মদিনেই ভারতের স্বাধীনতার জন্মদিন, এটাকে মনে করি ভগবানের আশীর্বাদ ও যে-কাজ নিয়ে আমি জীবন শুরু করেছি তাতে তাঁর অনুমোদন।…এই দিনটিতে আমি দেখছি, যে সকল বিষয়ে আমি পূর্ণ সাফল্য দেখে যেতে পারব বলে আশা করেছিলাম, তার অনেকগুলিই আমার এই জীবনকালের মধ্যেই সফল হয়ে

:গেল, অন্তত তা নিশ্চিত সাফল্যের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে, যদিও আগে এগুলিকে নিতান্তই অসম্ভব স্বপ্ন বলে মনে হতে পারত।

"এর মধ্যে প্রথম স্বপ্নটি ছিল, এমন এক বিপ্লবের সৃষ্টি যার ফলে ভারতের মধ্যে ঐক্য আসবে আর সমগ্র ভারতের মুক্তি হবে।...দ্বিতীয় স্বপ্ন ছিল, সমগ্র এশিয়ার পুনরভ্যুত্থান ও মুক্তি হবে, আর মানবসভ্যতার ক্রমোন্নতিকল্পে তার যে মহৎ অবদান ছিল তার সেই ব্রত আবার সে গ্রহণ করবে।...তৃতীয় স্বপ্ন ছিল, একটা বিশ্ব-মিলন, যাকে ভিত্তি করে সমগ্র মানবজাতি একটা সুন্দরতর, উজ্জ্বলতর ও মহত্তর জীবন আরম্ভ করবে। এ মিলনের পথ এখন প্রশস্ত হয়ে আসছে; এর প্রথম সূচনা এখনো ত্রুটিবহুল; কিন্তু কঠিন বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ভিতরের বেগে সে আয়োজন এগিয়ে চলেছে। এই কাজের ভিতরকার আসল গতিবেগটি এখন এসে গেছে, সে বেগ আরো বৃদ্ধি পাবে এবং নিশ্চয় তা শেষ পর্যন্ত সার্থক হবে।...সর্বজাতির স্বার্থের জন্যই একটা ঐক্য থাকা দরকার। তবে এই ঐক্যের কেবল একটা বাহ্যিক ভিত্তিস্থাপনই যথেষ্ট নয়; সকলের মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠা চাই।

"আর এক স্বপ্ন, ভারত জগৎকে দেবে তার মহামূল্য অধ্যাত্মজ্ঞান ও জীবনকে আধ্যাত্মিক করে তুলবার সাধনা। এ কাজও শুরু হয়ে গেছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার মধ্যে এখন ভারতের আধ্যাত্মিকতা উত্তরোত্তর অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। এ কাজটি আরো বাড়তে থাকবে।...শেষ স্বপ্নটি ছিল, বিবর্তনের পর্যায়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। এতে মানুষ এক উচ্চতর ও বৃহত্তর চেতনার স্তরে গিয়ে উঠবে। অতঃপর, চিত্তবৃত্তির উন্মেষের সময় থেকেই যেসব সমস্যা নিয়ে এতকাল সে বিমূঢ় ও বিপর্যস্ত হচ্ছিল তার একটা সমুচিত সমাধান করতে শুরু করবে, আর এবার সে ব্যক্তিগত পরমোৎকর্ষের ও সমানগতি সংহতির স্বপ্ন দেখবে।...ভারতের মুক্তি দিবসে এই কথাগুলিই আমি আজ বলতে চাই, আমার এ আশা সম্পূর্ণ সফল হবে কিনা বা কত শীঘ্র তা সফল হবে, সেটা নির্ভর করছে এই সদ্যমুক্ত ও নবজীবন-প্রাপ্ত ভারতেরই উপর।"

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি উপলক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা ও যোদ্ধার এই যে বাণী, এ নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। উনিশশো দশে রাজনীতির কর্মক্ষেত্র থেকে শ্রীঅরবিন্দ যখন নিজেকে আচম্বিতে সরিয়ে নিয়েছিলেন, তখন অনেকের মনে এইরকম একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি বুঝি উচ্চমার্গের চূড়ায় উঠে ভাবরাজ্যের অবাস্তব কল্পনা নিয়েই বিভোর রয়েছেন। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত এবং উত্তরকালে এজন্য অনেক বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা সম্পর্কে। কিন্তু, এই যুগমানবের পণ্ডিচেরী-জীবন শুধুই তপস্যার জীবন ছিল না।

যিনি জীবনের সঙ্গে যোগের সমন্বয় সাধন করেছিলেন, অন্ততঃ তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগত সাধনার গজদন্ত মিনারে নীরবে একান্তে বসে দিনাতিপাত করা তাঁর প্রকৃতি-বহির্ভূত ছিল। বরং একথা বললে প্রকৃত সত্য বলা হবে যে, পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটছে, সে বিষয়ে তিনি নিত্যই সচেতন ও সজাগ ছিলেন।

তাঁর সেই নির্জন তপস্যার আসনে বসে সব কিছুই অন্তরঙ্গভাবে দেখবার ও বুঝবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন আপন অভিজ্ঞতার সন্ধানী আলো দিয়ে। এ পর্যবেক্ষণ ছিল সুসংহত পর্যবেক্ষণ—স্থির নির্লিপ্ত চিত্তে তিনি অনুভব করতেন তাঁর চারদিকের জীবনপ্রবাহ ও কর্মপ্রবাহ। সমগ্র বিশ্বমানবকেই তিনি এনেছিলেন তাঁর দৃষ্টিসীমার মধ্যে। নিঃসঙ্গ নির্জনতার মধ্যে থাকতেন বলেই না আপনচেতনায় অধিকতর সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন তিনি। একদিকে সর্বসমন্বয়ী মনোভাব, অন্যদিকে সর্বদর্শিতা—এরই সাহায্যে তিনি আমাদের সকল সমস্যার চরম বিশ্লেষণ করে তার পরম সমাধান করে দিতে পেরেছেন। এইখানেই শ্রীঅরবিন্দের যুগমানবত্ব।

১৯৫০, ৫ই ডিসেম্বর।

ঐদিন রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে মহাপ্রয়াণ করলেন শ্রীঅরবিন্দ।

"লীন হলেন তিনি মহাসমাধির সুগভীর ঐকান্ত্যে।"

মহাসমাধি লাভ করলেন মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ।

নিজেকে তিনি সরিয়ে নিলেন সকলের দৃষ্টির সামনে থেকে।

এই সরিয়ে নেওয়া ছিল তাঁর স্বেচ্ছাকৃত।

আর ঐ মহাপ্রায়াণের মুহূর্তটিও যেন তাঁরই নির্বাচিত ছিল।

এর আগে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'সাবিত্রী' মহাকাব্য রচনার ব্যাপারে বিশেষভাবে ব্যাপৃত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'সাবিত্রী' কাব্যের রচনাকার্য তাঁর বরোদা-জীবনেই আরম্ভ হয় এবং সেই থেকে দীর্ঘকাল ধরেই তাঁর অলৌকিক কবি-প্রতিভা এর রচনায় নিয়োজিত ছিল। এ কাজ চলছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধীর মন্থর গতিতে। তারপর দেখা গেল যে, মহাপ্রয়াণের কয়েক মাস আগে থেকেই তিনি যেন নিজেকে এক সুগভীর প্রশান্তির মধ্যে, আত্মমগ্নতার মধ্যে এবং স্থির সংকল্পের মধ্যে একেবারে হারিয়ে ফেললেন। তারপর একদিন, ৫ই ডিসেম্বরের ঠিক দুমাস আগে, তিনি যেন তাঁর প্রশান্তি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে, তাঁর মুখের কথা যিনি প্রত্যহ লিপিবদ্ধ করতেন, তাঁকে বিস্মিত করে দিয়ে বললেন—"খুব শীঘ্র 'সাবিত্রী' শেষ করতে হবে!"

চমকে যাবার মতো এই কথা।

হঠাৎ এমন ক্ষিপ্রতার ভাব কেন?

সহকারীটির বিহ্বল দৃষ্টি যেন শ্রীঅরবিন্দের মুখে এর অর্থ খুঁজতে ব্যগ্র হয়। কিন্তু অনুভূতিলেশহীন সেই মুখে সে যেন কোন অর্থই খুঁজে পায় না তাঁর এই আকস্মিক ভাবান্তরের। দ্রুততর চলতে থাকে রচনা সংশোধনের কাজ যা শ্রীঅরবিন্দ ধীরে সুস্থিরেই করে আসছিলেন এতদিন যাবৎ। হঠাৎ সেই সংশোধনের কাজেও যেন ছেদ পড়ল। হঠাৎ বলছি এই কারণে যে, দ্বাদশটি সর্গে তিনি এই মহাকাব্য রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। উপসংহার ও অষ্টম সর্গটি বাদে আর সব সর্গের সংশোধন কাজ তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। বহুকাল আগে এই অষ্টম সর্গটি তিনি অংশত রচনা করে ফেলে রেখেছিলেন, পরে শেষ করবেন এই আশায়। এখন যখন সমগ্র কাব্যটির সংশোধন কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল তখন দেখা গেল যে, অষ্টম সর্গ ও উপসংহারের রচনায় ও সংশোধনে হাত দেওয়াই হয় নি। যখন এই দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো, তখন তিনি শুধু বললেন—"পরে দেখা যাবে।"

এই অষ্টম সর্গটি হলো 'দি বুক অব ডেথ'।

মৃত্যুর বর্ণনা নিয়ে রচিত এই সর্গটির রচনা সম্পূর্ণ করা এবং তার সংশোধনে তিনি হাতই দেন নি এ-পর্যন্ত।

এই উদ্দেশ্যমূলক ত্রুটির কি অর্থ থাকতে পারে?

মৃত্যুর অভিজ্ঞতা অর্জন করে তবে কি তিনি তার কথা লিপিবদ্ধ করবেন ঠিক করেছিলেন?

হয়ত তাই। প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়েই হয়ত তিনি অষ্টম সর্গটির রচনা ও সংশোধন কাজ শেষ করতে চেয়েছিলেন। সেই রহস্যময় লোকে এই মহান দ্রষ্টা কি চাক্ষুষ করলেন হয়ত তাই-ই বলবার ছিল তাঁর। আর উপসংহার ভাগটির প্রথম মুসাবিদা বেশ কয়েক বছর পূর্বেই রচিত হয়েছিল—এটারও সংশোধনের প্রয়োজন ছিল। সগৌরবে স্বর্গলোকের তীর্থ-পরিক্রমা শেষ করে, সাবিত্রী-সত্যবান নতুন জগতে প্রত্যাবর্তন করছেন—এই হলো উপসংহার-ভাগের বর্ণিত বিষয়বস্তু। স্পষ্টতই এটা হলো অষ্টম সর্গেরই পরিশিষ্ট এবং সম্ভবত সেই কারণেই এরও সংশোধন কাজ পরিত্যক্ত হয়ে থাকবে। শেষ পর্যন্ত এ কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি।

১৯৪৯ সালে শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে পণ্ডিচেরী এলেন বিখ্যাত ফরাসী আলোকচিত্র শিল্পী হেনরী কার্টিয়ার ব্রেস। তিনি শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের ছবি তুলতে চাইলেন এবং সেইসঙ্গে দুর্লভ দর্শনের কয়েকখানি ছবিও। বিগত চল্লিশ বছরের মধ্যে এরকম অনুরোধ বহুবার এসেছিল এবং প্রত্যেকবারই তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে এইবারকার দর্শন-দিবস উপলক্ষ্যে এই প্রথমবার ছবি তোলার জন্য অনুমতি মিললো। কিন্তু কেন মিললো? পরবর্তী ঘটনাটির মধ্যে এর উত্তর পাওয়া যাবে।

১৯৫০, ১৫ই আগস্ট। শ্রীঅরবিন্দের ইহজীবনের শেষ বৎসর এবং তাঁর শে
জন্মতিথি। ৭৮তম জন্মতিথি। সূর্যাস্তের অনতিকাল পরেই, ভারতের উত্তর-পূ
সীমান্তে ঘটল এক নিদারুণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়—এই শতাব্দীর বৃহত্তম ভূমিকম্প
অভূতপূর্ব বললেও চলে—পৃথিবীর মানুষ যার প্রকৃত গুরুত্ব আজো সঠিকভাবে
উপলব্ধি করে উঠতে পারে নি। সময়ে জানা যাবে, ভারত ও পৃথিবীর জন্য কী
ইঙ্গিত সেদিন বহন করে এনেছিল এই বিরাট ভূকম্পন। কিন্তু ঐ ১৫ই আগস্ট,
শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনেই এটা ঘটলো কেন? সকলেই জানেন যে, যখনি একটি
উল্লেখযোগ্য নৈসর্গিক ঘটনা ঘটে, তখন বুঝতে হবে, পৃথিবীতে কোথাও না
কোথাও অবতারকল্প কোন মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণ আসন্ন হয়ে এসেছে। ভারত-
বাসীর স্বাধীনতালাভের দিনটির সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য জন্মদিবসের মিলটা কী
নিতান্তই অর্থহীন ছিল?

রোগের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অলৌকিক যোগশক্তি
প্রয়োগ করলেন না কেন তাঁর শরীরের উপর? এর আগেও তো কয়েকবার—
বিশেষ করে ১৯৩৮ সালের দুর্ঘটনার পর যখন তিনি পায়ে গুরুতর আঘাত
পেয়েছিলেন তখন—সংকটজনক আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন ঐভাবে এবং অসংখ্য
ব্যক্তিকেও ঐ উপায়ে কঠিন রোগ থেকে মুক্ত করেছিলেন তিনি। এই প্রশ্নের
উত্তরে তিনি শুধু বলতেন—"ঠিক বোঝাতে পারব না; তোমরা বুঝবে না।"

রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় বার বার সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করা, কখনো
বা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকা—এর থেকে কি মনে হয় না যে, তাঁর
মহাপ্রয়াণের ক্ষণটি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন তিনি। চিকিৎসকদের
সহায় যেমন তিনি গ্রহণ করলেন না আরোগ্যলাভের জন্য, তেমনি তিনি ব্যবহার
করলেন না তাঁর যোগশক্তি। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে যেন অবিচল রইলেন।
তাঁর মহাপ্রয়াণের বিশদ বর্ণনা আছে ডাঃ প্রভাত স্যান্যাল, কে, ডি, শেঠনা,
নলিনীকান্ত গুপ্ত ও নীরদবরণ প্রভৃতির লেখার মধ্যে। কৌতূহলী পাঠক সেগুলি
পড়তে পারেন—এসব বর্ণনাই প্রত্যক্ষদর্শী এবং শুশ্রূষাকারীদের বর্ণনা এবং এঁরা
রোগশয্যায় শ্রীঅরবিন্দের যে চিত্র এঁকেছেন তা অন্তরঙ্গতায় ভাস্বর। শ্রীঅরবিন্দের
মহাপ্রয়াণ অথবা তাঁর মর্ত্যলীলা সম্বরণ—সত্যিই অভিনব। আশ্চর্যের বিষয় এই
যে, দেহের মধ্যে যখন প্রচণ্ড ব্যাধি, সেই অবস্থায় ২৪শে নভেম্বরের দর্শন দিবসে
দর্শনার্থীদের নিরাশ করেন নি তিনি। সেই অবস্থাতেই স্মিত আননে যথারীতি
ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় সমাগত সকলকে শেষবারের মতো
দর্শন দিলেন তিনি—দিলেন তাদের সবাইকে তাঁর সেই উজ্জ্বল ও প্রসন্ন দৃষ্টিতে
উদ্ভাসিত নিঃশব্দ আশীর্বাদ।

১৯৫০, ৫ই ডিসেম্বর, রাত্রি ১টা ২৬ মিনিটে মহাসমাধিলাভ করেন শ্রীঅরবিন্দ। আটাত্তর বছর আগে একদিন এক ব্রাহ্মমূহূর্তে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এই পৃথিবীতে। এর মাঝখানে আটাত্তর বর্ষব্যাপী যে জীবন—সে এক মহিমান্বিত যুগমানবের জীবন।

সেই জীবনের দিব্যজীবন-সঙ্গীত উনিশশো পঞ্চাশের পাঁচই ডিসেম্বর রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে যখন লয়ে এসে থামল তখনি সেই নতুন পৃথিবীর জন্ম ঘোষিত হলো—যার স্বপ্ন তিনি দেখেছেন আজীবন আর যার বন্দনা ঝঙ্কৃত হয়েছে 'লাইফ ডিভাইন'-গ্রন্থে ও 'সাবিত্রী' মহাকাব্যে।

যুগমানব শ্রীঅরবিন্দের জীবন-পরিক্রমা শেষ হলো।

কিন্তু বলা হলো না কিছুই। কেই বা পারে এই মহান পুরুষ সম্বন্ধে বলতে? তাঁর সুদীর্ঘ জীবন যেন সীমাহীন এক সমুদ্র, অন্তহীন এক পরিধি। তাঁকে স্পর্শ করা আর অসীমকে স্পর্শ করা একই কথা। পণ্ডিচেরীর আশ্রম-প্রাঙ্গনে সমাহিত সেই হিরণ্য পুরুষের জীবন-মহিমা আমরা যুগযুগ ধরে স্মরণ করব—স্মরণ করব তাঁকে আলো এবং শক্তির জনকরূপে। জাগতিক দৃষ্টির বাইরে আজ তিনি চলে গিয়েছেন সত্য, কিন্তু তাঁর অন্তর্ধান-পটে চিরকালের মতো অঙ্কিত হয়ে থাকবে তাঁর সেই ভাস্বর মূর্তি। আর যতদিন না তাঁর সিদ্ধি পূর্ণ হচ্ছে, অর্থাৎ যতদিন না অতিমানস চেতনা এই পৃথিবীতে অবতরণ করছে এবং প্রকট হচ্ছে, ততদিন তাঁর উপস্থিতি আমরা নিশ্চয়ই অনুভব করব।

পৃথিবীর মানুষ একদিন বুঝবে যে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দ একটি আশ্চর্য প্রকাশ। মহাকালের স্থূল হস্তাবলেপে সেই দিব্য প্রকাশের মহিমা কোনদিনই মুছে যাবার নয়। মানব-ইতিহাসের নিত্যসম্পদরূপে তিনি গণ্য হবেন। এই প্রকাশ শুধু কলকাতার আট নম্বর থিয়েটার রোডের সেই বাড়িতে ঘটে নি, এই প্রকাশ ঘটেছিল বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারত তথা বিশ্বের বিরাট প্রাঙ্গণে। মানব-ইতিহাসেরই সুগভীর অন্তঃস্থলে। তাঁর জীবন ও সাধনা তাই তাঁর শিষ্য বা ভক্তগণের জীবনের সঙ্গেই সংযুক্ত ছিল না, কিংবা ভারতের রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রেই তা সীমাবদ্ধ ছিল না; সে-সাধনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিল বিশ্বমানবের চিন্তাধারা। তাই শ্রীঅরবিন্দের প্রকাশ বর্তমানকালের পৃথিবীতে একটি মহত্তম ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

শাশ্বত ভারতবর্ষকে বিশ্বচেতনার মানচিত্রে চিরদীপ্যমান করে দিয়ে গেলেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁরই জীবনব্যাপী কর্ম, চিন্তা ও সাধনার দ্বারা। আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ভারতবর্ষের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, যেমন একদিন করেছিলাম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের

সাধনার মধ্যে। তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দকে সন্দর্শন করে রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন—"আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে।"—তা আদৌ অত্যুক্তি নয়। আজ তাঁর মন্ত্র-বাণীতে বিশ্বমানবের আমন্ত্রণলিপি কি আমরা শুনতে পাই না? ভারতবর্ষের চিরন্তন যোগবিজ্ঞান-সাধনা অন্ধকারে হয়ে গিয়েছিল বিলুপ্ত, শ্রীঅরবিন্দ তাকেই দিয়ে গেলেন দিব্যজ্ঞানের মর্যাদা তাঁর অভিনব মানবীয় সাধনার ভিতর দিয়ে। ভারতের ঋষিকণ্ঠে একদিন যে অমৃতত্বের প্রতিশ্রুতি আমরা শুনেছিলাম, আজ শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবনে দেখলাম তারই সার্থকতা।

বিপ্লবী, দার্শনিক, কবি—এই তিনটির সমাবেশেই শ্রীঅরবিন্দের জীবন। একাধারে তিনি দেশাত্মবোধের দিশারী, জাতীয়তার পুরোহিত ও বিপ্লবের রণগুরু। অতিমানসবিজ্ঞানের প্রবক্তা, পূর্ণযোগের প্রবর্তক এবং দিব্যজীবনের ঋষি। মানব ইতিহাসের একটি সুমহৎ অভিপ্রায়কে সিদ্ধ করার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। যুগ থেকে যুগান্তরে কীর্তিত হবে তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির অমৃতময়ী বাণী। জীবনে যেমন, মহাসমাধি লাভের পরেও তেমনি তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের উপর।

নিখিল বিশ্বের জ্যোতির কমল, সমন্বয়ী চেতনার মূর্ত বিগ্রহ, যুগমানব শ্রীঅরবিন্দকে প্রণাম।

———